ময়ূরকণ্ঠী

সৈয়দ মুজতবা আলী

বেঙ্গল পাবলিশার্স : কলিকাতা—১২

এই লেখকের অন্যান্য বই

দেশে বিদেশে (৫ম সং)

পঞ্চতন্ত্র (৪র্থ সং)

চাচা কাহিনী (২য় সং)

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৫৯

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—প্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড্

৫, চিন্তামণি দাস লেন

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা

গোপাল ঘোষ

ব্লক

ফাইন আর্ট টেম্পল

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাড়ে তিন টাকা
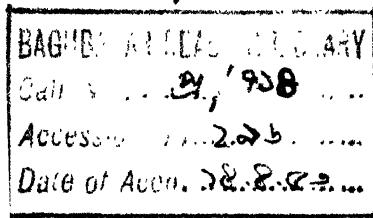
মমাগ্রজ সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তফা আলী সাহেবকে—

নিবেদন

'পঞ্চতন্ত্র' বাঙালী পাঠকের কাছে আশাতীত সমাদর লাভ করাতে আমার জানা-অজানা পাঠকের কেউ কেউ ঐ-জাতীয় আরেকখানি সংকলন প্রকাশ করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। আমার শরীর অসুস্থ থাকায় শিষ্য ও সখা দিল্লীবাসী শ্রীমান বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য আমার পুরনো লেখা থেকে অশেষ পরিশ্রম করে আপন রুচি-অনুযায়ী এই সংকলনটি প্রস্তুত করেছেন। এ পুস্তিকার অধিকাংশ লেখা 'আনন্দবাজার' 'বসুমতী' ও 'দেশে' বেরিয়েছিল ও কোনো কোনো লেখা 'দেশে-বিদেশের' চেয়েও পুরনো।

গজনীর সুলতান মাহমুদের সভাপণ্ডিত অল-বিরূনী একাদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত শিখে আরবী ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বর্ণনা দেবার সময় তিনি বলেন যে, ঐ সব ধর্মের মহাজনগণ আপন আপন ধর্মের যে ধারণা হৃদয়মনে পোষণ করেছেন তিনি সেগুলোর বর্ণনা করেছেন মাত্র—কোনো মতের সমর্থন কিম্বা খণ্ডন তিনি করতে চান নি। নানা ধর্ম বর্ণনার সময় আমি প্রাতঃস্মরণীয় অল-বিরূনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।

'বাঙালী' বলতে আমি উভয় বাঙলার এবং বাঙলার বাইরেরও হিন্দুমুসলমানখৃস্টানবৌদ্ধ বাঙলাভাষীজনকেই বুঝি।

সৈয়দ মুজতবা আলী

সূচীপত্র

গুরুদেব

রবীন্দ্রনাথের শিষ্যদের ভিতর সাহিত্যিক হিসাবে সর্বোচ্চ আসন পান শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী। তিনি যে রকম রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছেন সব চেয়ে বেশী, তেমনি বিধিদত্ত রসবোধ তাঁর আগের থেকেই ছিল। ফলে তিনি সরস, হাল্কা কলমে রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবন, খুশ-গল্প, আড্ডা-মজলিস সম্বন্ধে যা লিখেছেন তারপর আর আমার কিছু লিখবার মত থাকতে পারে না। কারণ বিশীদা যে মজলিসে সব চেয়ে উঁচু আসন পেয়েছেন সে মজলিসে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হিসাবে যদি নিতান্তই আমাকে কোনো স্তোকাসন দেওয়া হয় তবে সেটা হবে সর্বনিম্নে।

কিন্তু বহু শাস্ত্রে বিধান আছে সর্বজ্যেষ্ঠ যদি কোনো কারণে শ্রদ্ধাঞ্জলি না দিতে পারে, তবে দেবে সর্বকনিষ্ঠ। এই ছেলে ধরার বাজারে কিছু বলা যায় না—গুরুদেবকে স্মরণ করার সময় আমরা সবাই এক বয়সী ছেলেমানুষ, রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আজকের শিশুবিভাগের কনিষ্ঠতম আশ্রমিক—কাজেই বিশীদার যদি ভালো-মন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তবে আমার আকন্দাঞ্জলির প্রয়োজন হয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে মা-'বসুমতী'র কাছে এটি গচ্ছিত রাখছি।

ব্যাপকার্থে রবীন্দ্রনাথ তাবৎ বাঙালীর গুরু, কিন্তু তিনি আমাদের গুরু শব্দার্থে। এবং সে গুরুর মহিমা দেখে আমরা সবাই হয়েছি। ব্যক্তিগত কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে কিন্তু এ স্থলে ছাত্রের কর্তব্য সমাধান করার জন্য বলি, শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর বার্লিন, প্যারিস, লণ্ডন, কাইরো বহু জায়গায় বহু গুরুকে আমি বিদ্যাদান করতে দেখেছি কিন্তু এ গুরুর অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে কারোরই তুলনা হয় না। কত বৎসর হয়ে গেল, কিন্তু আজও মনের পটের উপর রবীন্দ্রনাথের আঁকা কীটসের 'অটামের' ছবি তো মুছে গেল না। কীটস হেমন্তের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাকে যে আরও বেশী উজ্জ্বল করা যায়, এ কথা তো কেউ সহজে বিশ্বাস করবেন না। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে "You do not paint a lily"—তাই মনে প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়, রবীন্দ্রনাথ কীটসের হেমন্ত-লিলিকে মধুরতর প্রিয়তর করতেন কোন যাদুমন্ত্রের জোরে?

তুলনা না দিয়ে কথাটা বোঝাবার উপায় নেই। ইংরিজী কবিতা পড়ার সময় আমাদের সব সময় মনে হয়, ইংরিজী কবিতা যেন রূপকথার ঘুমন্ত সুন্দরী। তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি, কিন্তু তার বাক্য-হাস্য-নৃত্য রস থেকে বঞ্চিত থাকি বলে অভাবটি এতই মর্মন্তুদ হয় যে,

শ্যামাঙ্গী স্থূলাঙ্গী জাগ্রতা গৌড়জার সঙ্গসুখ তখন অধিকতর কাম্য বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের বর্ণনশৈলী ভানুমতী মন্ত্র দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি তাঁর সোনার কাঠির পরশ দিয়ে কীটসের হৈমন্তীকে জাগিয়ে দিয়েছিল আমাদের বিদ্যালয়ের নিভৃত কোণে। গুরুদেব কীটসের এক ছত্র কবিতা পড়েন, নিদ্রিতা সুন্দরীকে চোখের সামনে দেখতে পাই। তিনি তাঁর ভাষার সোনার কাঠি ছোঁয়ান, সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তী নয়ন মেলে তাকায়। গুরুদেবের কণ্ঠে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, সুন্দরী চটুল নৃত্য আরম্ভ করে। গুরুদেব তাঁর বীণার তারে করাঙ্গুলি স্পর্শে ঝঙ্কার তোলেন, সুন্দরী গান গেয়ে ওঠে।

কীটস্, শেলি, ব্রাউনিং, ওয়ার্ড্স্‌ওয়ার্থকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এ ইন্দ্রজাল কতবার দেখেছি আর ভেবেছি, হায়, এ বর্ণনা যদি কেউ লিখে রাখত তাহলে বাঙালী তো তার রস পেতই বিলেতের লোকও একদিন ওগুলো অনুবাদ করিয়ে নিয়ে তাদের নিজের কবির কত অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য দেখতে পেত। কিন্তু জানি ভানুমতীর ছবি ফোটোগ্রাফে ওঠে না, গুরুদেবের এ বর্ণনা কারো কলম কালিতে ধরা দেয় না। যেটুকু দিয়েছে সেটুকু আছে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের ভাণ্ডারে।

তারপর একদিন বেলজিয়মে থাকার সময় বিলেত যাবার দরকার হল। ইচ্ছে করেই যাওয়াটা পিছিয়ে দিলুম—তখন বসন্ত ঋতু। কীটসের 'হৈমন্তী'র সঙ্গে দেখা হতে অনেক বাকী। সায়েব-মেমসায়েবরা অসময়ে দেখা করেন না।

বিলিতী হৈমন্তীকে দেখে মুগ্ধ হলুম, অস্বীকার করব না। কীটসের ফিরিস্তি মিলিয়ে 'নখশির' বর্ণনা টায় টায় মিলে গেল, কিন্তু হৈমন্তীর সন্ধান পেলুম না। কীটসের সু বারবার তা দেখি আর মনে হয়, আগের দিনের বেলাভূমিতে কুড়িয়ে পাওয়া ঝিনুক ঘরের ভিতরে এসে ম্লান হয়ে গিয়েছে। গুরুদেবের গীতিশৈলী পূর্বদিনের সূর্যাস্তের সময় যে নীলাম্বুজ নীলাম্বরের সৃষ্টি করেছিল, যার মাঝখানে এই শক্তিই ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত করেছিল, গৃহকোণের দৈনন্দিনতার মাঝখানে সে যেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, 'তুলসীর মূলে' যে 'সুবর্ণ দেউটি' দশদিশ উজ্জ্বল করেছিল সেই দেউটি দেবপদ স্পর্শলাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে ম্লানমুখে আপন দৈন্য প্রকাশ করতে লাগল।

তারপর আরও কয়েক বৎসর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে তার পেলুম, জর্মনির মারবুর্গ শহরে গুরুদেব আমাকে ডেকেছেন—জানতেন আমি কাছাকাছি আছি।

মারবুর্গের সে জনসভার বর্ণনা আমি অন্যত্র দিয়েছি। আজ শুধু বলি, *গুরুদেব সেদিন যখন* 'ঘুম ঘন সাপ খেলাবার বাঁশী' বাজালেন তখন মারবুর্গের পরবে জমায়েৎ তাবৎ জার্মানির 'গুণী-জ্ঞানী মানী তত্ত্ববিদের সেরারা' মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দীর্ঘ এক ঘণ্টা-কাল গুরুদেব বক্তৃতা দিলেন,—একটি বারের মত সামান্যতম একটি শব্দও সেই সম্মিলিত যোগসমাধির ধ্যান-ভঙ্গ করল না। আমার মনে হল গুরুদেব যেন কোন এক অজানা মন্ত্রবলে সভাস্থ নরনারীর শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত স্তম্ভন করে দিয়েছেন—ডাইনে বাঁয়ে তার শব্দটুকুও শুনতে পাই নি।

আমার মনে হয়েছিল, সভাগৃহ থেকে বেরুতে গিয়ে দেখব সেই বিপুল-কলেবর অট্টালিকা বল্মীকস্তূপে নিরুদ্ধ নিরন্ধ্র হয়ে গিয়েছে।

সেই জনতার মাঝখানেই গুরুদেবকে প্রণাম করলুম—জানিনে তো কখন আবার দেখা হবে। এত সব গুণীজ্ঞানীর মাঝখানে আমার জন্য কি আর বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর হবে? কিন্তু ভুলে গিয়েছিলুম গুরুদেবেরই কবিতা :—

> আমার গুরুর পায়ের তলে
> শুধুই কি রে মানিক জ্বলে?
> চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলারে।
> আমার গুরুর আসন কাছে
> সুবোধ ছেলে কজন আছে
> অবোধ জনে কোল দিয়েছেন
> তাই আমি তাঁর চেলারে।

বিশাল জনতার উদ্বেলিত প্রশংসা-প্রশস্তি পাওয়ার পরও, আমি যখন প্রণাম করে দাঁড়ালুম, তিনি মৃদুকণ্ঠে শুধালেন, 'কি রকম হল?'

আমি কোনো উত্তর দিই নি।

শহরের উজির-নাজীর-কোটাল গুরুদেবকে তাঁর হোটেলে পেঁৗছে দিলেন। আমি পরে সেখানে গিয়ে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর কাছ থেকেই বিদায় নিতে চাইলুম। তিনি বললেন, 'সে কি কথা, দেখা করে যান।'

আমি দেখা হবে শুনে খুশী হয়ে বললুম 'তা হলে আপনি গিয়ে বলুন।'

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী বললেন, 'সে তো আর পাঁচজনের জন্য। আপনি সোজা গিয়ে নক্ করুন।'

গুরুদেব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবু হাসিমুখে বসতে বললেন। তারপর ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন?'

আমি মাথা নীচু করে চুপ করে রইলুম।

কিছু কথাবার্তা হল। আমার লেখা পড়া সম্বন্ধে। যখন উঠলুম তখন বললেন, 'অমিয়কে ডেকে দে তো।'

চক্রবর্তী এলেন। গুরুদেব বললেন, 'অমিয়, একে ভালো করে খাইয়ে দাও।'

জানি পাঠকমণ্ডলী এই তামসিক পরিসমাপ্তিতে ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু সোক্রোতেসের চোখে যখন মরণের ছায়া ঘনিয়ে এল আর শিষ্যেরা কানের কাছে চীৎকার করে শুধালেন, 'গুরুদেব, কোনো শেষ আদেশ আছে?'

তখন সোক্রাতেস বললেন, 'হ্যাঁ, মনে পড়ছে। পরশুদিন যে মুর্গীটা খেয়েছিলুম তার দাম দেওয়া হয় নি। দিয়ে দিয়ো।' এই সোক্রাতেসের শেষ কথা।

সর্বদিকে যাঁর দৃষ্টি তিনিই তো প্রকৃত গুরু এবং তাও মৃত্যুর বহু পূর্বে॥

নন্দলালের দেয়াল ছবি

তুর্কী-নাচন নাচেন নন্দবাবু
চতুর্দিকে ছেলেরা সব কাবু।
তুলির গুত্তা ডাইনে মারেন, মারেন কভু বাঁয়ে
ঘাড় বাঁকিয়ে, গোঁফ পাকিয়ে, দাঁড়িয়ে এক পায়ে।
অষ্টপ্রহর চর্কীবাজী কীর্তি-মন্দিরে
ছেলেরা সব নন্দলালকে ঘিরে
মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিকে ফিরে।

হচ্ছে 'নটীর পূজা'
রাণীর সঙ্গে হল নটীর পূজা নিয়ে যুঝা।
বরাঙ্গনা ভিক্ষু নটীর নৃত্যছন্দ ধূপ—
তুলির আগুন পরশ পেয়ে নিল আবার সেই অপরূপ-রূপ
—বহু যুগের পরে—
চৈত্যভবন ভরে।

গানের আসর পারা
—সন্ধ্যাকাশে ফোটে যেন তারার পরে তারা—
হেথায় সেতার কাঁপে ভীরু, হোথায় বীণার মীড়
আধাফোটা গুঞ্জরণের ভিড়
তার পিছনে মৃদু করুণ-বাঁশী
গুমগুমিয়ে থেকে থেকে উঠছে ভেসে খোল-মৃদঙ্গের হাসি।

এ যেন সুন্দরী—
প্রথমেতে নীলাম্বরী পরি,*
সর্ব অঙ্গে জড়ায় যেন অলঙ্কারের জাল;—
তিলোত্তমা গড়েন নন্দলাল।
চিত্রপটে কিন্তু নটী ফেলে অলঙ্কার
শুনি যেন বলে চিত্রকার,—
"তথাগতের দয়ায় যেন তেমনি ঘুচে তোমা সবার সকল অহঙ্কার।"

সাদামাটার রক্তবিহীন ঠোঁটে
লজ্জা সোহাগ ফোটে,
পাংশু দেয়াল আনন্দে লাল নন্দলালের লালে
তুলির চুমো যেই না খেলো গালে॥ *

বড় দিন

বাইবেলে বলা হয়েছে পূব দেশ থেকে তিন জন ঋষি প্যালেস্টাইনের জুডেয়া প্রদেশের রাজা হেরোডের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহুদিদের নবীন রাজা কোথায় জন্ম নিয়েছেন? আমরা পূর্বাকাশে তাঁর তারা দেখতে পেয়ে তাঁকে পুজো করতে এসেছি।'

সেই তারা-ই তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বেৎলেহেম—যেখানে প্রভু যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। মা মেরী আর তাঁর বাগদত্ত যোসেফ পান্থশালায় স্থান পান নি বলে আশ্রয় নিয়েছিলেন পান্থশালার পশ্বালয়ে। তারই মাঝখানে কুমারী মেরী জন্ম দিলেন এ জগতের নব জন্মদাতা প্রভু যীশুকে।

দেবদূতরা মাঠে গিয়ে রাখাল ছেলেদের সুসংবাদ দিলেন—প্রভু যীশু, ইহুদিদের রাজা জন্ম নিয়েছেন। তারাও এসে দেখে, গাধা-খচ্চর, খড়-বিচুলির মাঝখানে মা জননীর কোলে শুয়ে আছেন রাজাধিরাজ।

এই ছবিটি এঁকেছেন যুগ যুগ ধরে বহু শিল্পী, বহু কবি, বহু চিত্রকর। নিরাশ্রয়ের ঘরে এসে আশ্রয় নিলেন বিশ্বজনের আশ্রয়-দাতা।

* শ্রীযুত নন্দলাল বসুর বরদারাজ্যের 'কীর্তি-মন্দিরে' রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'র ফ্রেস্কো ছবি আঁকিবার সময় লেখক কর্তৃক এক বান্ধবীকে আসিয়া দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র।

বাইরের থেকে গম্ভীর গুঞ্জরণ শুনে মনে হল বিদ্যালয়ের ভিতর বুঝি তরুণ সাধকেরা বিদ্যাভ্যাস করছেন। জানা ছিল টোল মাদ্রাসা নয়, তাই ভিতরে ঢুকে ভিরমি যাই নি।

ক'শ পুরুষ মেয়ে ছিলেন আদম-শুমারী করে দেখি নি। পুরুষদের সবাই পরে এসেছেন ইভ্‌নিং ড্রেস। কালো বনাতের চোস্ত পাতলুন—তার দুদিকে সিল্কের চকচকে দু'ফালি পট্টি; কচ্ছপের খোলের মত শক্ত শার্ট, কোণ-ভাঙা কলার—ধবধবে সাদা; বনাতের ওয়েস্‌ট্‌ কোট—কোটের লেপেলে সেই সিল্কের চকচকে ট্যারচা পট্টি; কালো বো ফুটে উঠেছে সাদা শার্ট কলারের উপর—যেন শ্বেত সরোবরে কৃষ্ণা কমলিনী। পায়ে কালো বার্নিশের জুতো—হাতে গেলাস।

কিম্বা শার্ক-স্কিনের ধবধবে সাদা মসৃণ পাতলুন। গায়ে গলাবন্ধ 'প্রিন্‌স্‌ কোর্ট'—সিক্‌স্‌ সিলিণ্ডারী অর্থাৎ ছ বোতামওলা। কারো বোতাম হাইদ্রাবাদী চৌকো, কারো বা বিদরী গোল—সাদার উপরে কালো কাজ। একজনের বোতামগুলো দেখলুম খাস জাহাঙ্গীর-শাহী মোহরের।—হাতে গেলাস।

তারি মধ্যিখানে বসে আছেন এক খাঁটি বাঙালী নটবর। সে কী মোলায়েম মিহি চুনট করা শান্তিপুরে, মেরিনার ঘি রঙের পাঞ্জাবী আর তার উপরে আড়-করা কালো কাশ্মীরী শালে সোনালি জরির কাজ। হীরের আংটি বোতাম ম্যাচ করা, আর মাথায় যা চুল তাকে চুল না বলে কৃষ্ণমুকুট বললেই সে তাজ-মহলের কদর দেখানো হয়। পায়ে পাম্প—হাতে গেলাস।

'দেশসেবক'ও দু একজন ছিলেন। গায়ে খদ্দর—হাতে? না, হাতে কিচ্ছু না। আমি আবার সব সময় ভালো করে দেখতে পাইনে—বয়স হয়েছে।

কিন্তু এ সব নস্যি। দেখতে হয় মেয়েদের। ব্যাটাছেলেরা যখন মনস্থির করে ফেলেছে, সাঁঝের ঝোঁকে সাদা কালো ভিন্ন অন্য রঙ্‌ নিয়ে খেলা দেখাবে না তখন এই দুই স্বর সা আর রে দিয়ে কি ভেল্কিই বা খেলবে?

হোথায় দেখো, আহা-হা-হা। দুধের উপর গোলাপী দিয়ে ময়ূরকণ্ঠী-বাঙ্গালোরী শাড়ী—জরির আঁচল। আর সেই জরির আঁচল দিয়ে ব্লাউজের হাতা। ব্লাউজের বাদ-বাকী দেখা যাচ্ছে না, আছে কি নেই তাই বলতে পারবো না। বোধ হয় নেই—না থাকাতেই সৌন্দর্য বেশী। ফরাসীরা কি এ জিনিসকেই বলে 'দে কোল্‌তে'? বুক-পিঠ কাটা মেম সায়েবদের ইভ্‌নিং ফ্রক এর কাছে লজ্‌জায় জড়সড়।

ডান হাতে কনুই অবধি সোনার চুড়ি—বাঁ হাতে কবজের মত বাঁধা হোমিও-প্যাথিক রিস্টওয়াচ। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিনারের কত বাকি? ক'টা বেজেছে?' বলেই লজ্‌জা পেলেন, কারণ ভুলে গিয়েছিলেন নিজের হাতেই

বাঁধা রয়েছে ঘড়ি। কিন্তু লাল হলেন না, কারণ রুজ আগে-ভাগেই এত্ত ল্যাল করে রেখেছে যে, আর লাল হবার 'পার্কিঙ্-প্লেস' নেই।

হাতে? যান মশাই,—আমার অতশত মনে নেই। হাল্কা সবুজ জর্জেটের সঙ্গে রক্ত-রাঙা ব্লাউজ। কপালে সবুজ টিপ। শাড়ীর সঙ্গে রঙ মিলিয়ে বাঁ হাতে ঝুলছে ব্যাগ, কিন্তু ব্যাগের স্ট্যাপটার রঙ মেলানো রয়েছে রক্ত-রাঙা ব্লাউজের সঙ্গে এবং তাকে ফের মেলানো হয়েছে স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপের সঙ্গে। আর কোথায় কোথায় মিল অমিল আছে দেখবার পূর্বেই তিনি সরে পড়লেন। ডান হাতে কিছু ছিল? কী মুশকিল!

আরে! মারোয়াড়ী ভদ্রলোকরা কি পার্টিতে মহিলাদের আনতে শুরু করেছেন? কবে থেকে জানতুম না তো।

একদম খাঁটী মারোয়াড়ী শাড়ী। টকটকে লাল রঙ—ছোটো ছোটো বোট্টাদার। বেনারসী-ব্যাপার। সেই কাপড় দিয়েই ব্লাউজ—জরির বোট্টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সকাল বেলা হাওড়ায় নামলে ব্রিজ পেরিয়ে হামেশাই এ রকম শাড়ী দেখতে পাই—মহিলারা স্নান সেরে ফিরছেন। সেই শাড়ী এখানে? হাতে আবার লাইফ বেল্ট সাইজের কাঁকণ।

মাথার দিকে তাকিয়ে দেখি, না, ইনি মারোয়াড়ী নন। চুলটি গুছিয়েছেন একদম পাকা পোক্ত গ্রেতা গার্বো স্টাইলে। কাঁধের উপর নেতিয়ে পড়ে ডগার দিকে একটুখানি ঢেউখেলানো। শুধু চুলটি দেখলে তামা-তুলসী স্পর্শ করে বলতুম, জীবনের শেষ স্বপ্ন সফল হ'ল—গ্রেতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে। কিন্তু কেন হেন জঙ্গলী শাড়ীর সঙ্গে মডার্ণ চুল?

নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে ধ্যান করে হৃদয়ঙ্গম করলুম তত্ত্বটা। শাড়ী ব্লাউজের কনট্রাস্ট্ ম্যাচিঙের দিন গেছে। এখন নব নব কনট্রাস্ট্‌এর সন্ধান চলছে। এ হচ্ছে প্রাচীন পন্থা আর আধুনিক ফ্যাশানের দ্বন্দ্ব। গলার নিচে ত্রয়োদশ শতাব্দী—উপরে বিংশ। প্রাণভরে বাঙালী মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করলুম। উচ্চকণ্ঠে করলেও কোনো আপত্তি ছিল না। সে হট্টগোলের ভিতর এটম বমের আওয়াজও শোনা যেত না। কি করে খানার ঘণ্টা শুনতে পেলুম, খোদায় মালুম।

হাওড়া থেকে শেয়ালদা সাইজের খানা-টেবিল। টার্কি পাখীরা রোস্ট হয়ে উর্ধ্বপদী হয়েছেন অন্তত শ জনা, মুর্গী-মুসল্লম অগুনতি, সাদা কেঁচোর মত কিলবিল করছে ইতালির মাক্কারোণি হাইনৎসের লাল টমাটো সসের ভিতর, আণ্ডার রাশান স্যালাড গায়ে কম্বল জড়িয়েছে প্যোর ব্রিটিশ মায়োনেজের ভিতর, চকলেট রঙের শিককাবাবের উপর আঁকা হয়েছে সাদা পেঁয়াজ, মুলোর আল্পনা, গরমমশলার ক্বাথের কাদায় মুখ গুঁজে আছেন রুইমাছের ঝাঁক, ডাঁটার মত আটা আটা এসপেরেগাস টিন থেকে বেরিয়ে শ্যাম্পেনের গন্ধ পেয়ে ফুলে উঠছে, পোলাওয়ের পিরামিডের উপর সসেজের ডজন ডজন কুতুব মিনার।

কনট্রাস্ট্, কনট্রাস্ট্, সবই কনট্রাস্ট্।

প্রভু যীশু জন্ম নিলেন খড় বিচুলির মাঝখানে—আর তার পরব হল শ্যাম্পেনে টার্কিতে!!

পাণ্ডা

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,-

'নামিনু শ্রীধামে। দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।

এর পর পাণ্ডাদের সহৃদয় অত্যাচারের কথা ফলিয়ে বলবার মত সাহস আমাদের মত অর্বাচীন জনের হওয়ার কথা নয়। ওস্তাদরা যখন 'মিয়াকী তোড়ী' অর্থাৎ মিয়া তানসেন রচিত তোড়ী রাগিনী গান তখন গাওয়া আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দু'হাত দিয়ে দু'টি কান ছুঁয়ে নেন। ভাবখানা এই 'হে গুরুদেব, ওস্তাদের ওস্তাদ, যে-গান তুমি গেয়েছ সেটি গাইবার দম্ভ যে আমি প্রকাশ করলুম, তার জন্য আগে-ভাগেই মাপ চাইছি।' সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদেরও তাই করা উচিত—মাইকেলও তাই করেছেন। আদি কবির স্মরণে বলেছেন, 'দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে রাজেন্দ্র সঙ্গমে।' কালিদাসও বলেছেন,—সংস্কৃতটা মনে নেই—'বজ্র মণি ছেদ করার পর সূত্র যেমন অনায়াসে মণির ভিতর দিয়ে চলে যেতে পারে, বাল্মীকির রামায়ণের পর আমার রঘুবংশ ঠিক সেইরূপ।'

শুধু এইটুকু বলে রাখি, পাণ্ডা বলতে ভারতীয় যে মহান জাতের কথা ওঠে তার কোনো জাত নেই। অর্থাৎ শ্রীধামের পাণ্ডা আর আজমীঢ়ের মুসলমান পাণ্ডাতে কোনো পার্থক্য নেই—যাত্রীর প্রাণটা নিমেষে কণ্ঠাগত করবার জন্য এঁদের বজ্রমুষ্টি ভারতের সর্বত্রই এক প্রকার। ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিলনের এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে? কংগ্রেস যদি এঁদের হাতে দেশের ভারটা ছেড়ে দিতেন তবে ভারত ছেদের যে কোনো প্রয়োজন হ'ত না সে বিষয় আমি স্থির-নিশ্চয়। এর জন্য মাত্র একটি প্রমাণ পেশ করছি। উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে সর্বপ্রকারের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ সে কথা সবাই জানেন; কিন্তু এ তথ্যটি কি লক্ষ্য করছেন যে, শিখরা তীর্থ করবার জন্য দিব্য পাকিস্থান যাচ্ছেন, পাকিস্থানের মুসলমানেরা হিন্দুস্থানের আজমীঢ় আসছেন, পূর্ব-পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামে যাচ্ছেন? পাণ্ডার ব্যবসা দুনিয়ার প্রাচীনতম ব্যবসা—ওটাকে নষ্ট করা কংগ্রেস লীগের কর্ম নয়।

সে কথা যাক। আমি বলছিলুম, বিদেশ যাওয়ার পূর্বে আমার বিশ্বাস

ছিল পাণ্ডা-জগতের অশোক-স্তম্ভ এবং কুতুব মিনার ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান পাণ্ডা। জেরুজালেমে গিয়ে সে ভুল ভাঙলো।

আমি তীর্থপ্রাণ। অর্থাৎ তীর্থ দেখলেই ফুল চড়াই, শীরনী বিলাই। ভারতীয় তাবৎ তীর্থ যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল তখন গেলুম জেরুজালেম। ইহুদি, খৃস্টান, মুসলমান এই তিন ধর্মের ত্রিবেণী জেরুজালেমে। বিশ্ব-পাণ্ডার ইউ, এন, ও ঐখানেই। সেখানে থেকে গেলুম বেৎলেহেম—প্রভু যীশুর জন্মস্থল।

বড়দিনের কয়েক দিন পরে গিয়েছিলুম। জেরুজালেম-বেৎলেহেমের বাস-সার্ভিস আমাদের স্টেট বাসের চেয়ে অনেক ভালো (বাসের উপর পলায়মান ব্যাঘ্রের ছবি এঁকে কর্তারা ভালোই করেছেন,—বাঘ পর্যন্ত ভিড় দেখে ভয়ে পালাচ্ছে)। পকেটে গাইড-বুক—পাণ্ডার 'এরজাৎস'—কাঁধে ক্যামেরা, হাতে লাঠি। আধ ঘণ্টার ভিতর বেৎলেহেম গ্রামে নামলুম।

ভেবেছিলুম, দেখতে পাবো, বাইবেল-বর্ণিত ভাঙাচোরা সরাই আর জরা-জীর্ণ আস্তাবল—যেখানে যীশু জন্ম নিয়েছিলেন। সব কর্পূর! সব কিছু ভেঙে-চুরে তার উপর দাঁড়িয়ে এক বিরাট গির্জা।

গির্জাটি প্রিয়দর্শন অস্বীকার করিনে। আর ভিতরে মেঝের উপর যে মোজায়িক বা পাথরে খচা আল্পনা দেখলুম তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত রস-সৃষ্টি সেণ্ট সোফিয়া, সেণ্ট পল কোথাও আমি দেখিনি। সে কথা আরেক দিন হবে।

গাইড বুকে লেখা ছিল, গির্জার নিচে ভূগর্ভে এখনো আছে সেই আস্তাবল—যেখানে প্রভু যীশু জন্মগ্রহণ করেন। সেই গহ্বরে ঢুকতে যেতেই দেখি সামনে এক ছ'ফুটি পাণ্ডা। বাবরী চুল, মান-মনোহর গাল-কম্বল দাড়ি, ইয়া গোঁপ, মিশকালো আলখাল্লা, মাথায় চিমনির চোঙার মত টুপী, হাতে মালা—তার এক একটি দানা বেবি সাইজের ফুটবলের মত। পাদ্রী-পাণ্ডারা অর্ধ-নারীশ্বর।

গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, 'হোয়াট ল্যান্‌গুইজ্? কেল লাঁগ? বেলশে শপ্রাখে? লিসান এ?'—প্রায় বারোটা ভাষায় জিজ্ঞেস করলো আমি কোন্ ভাষা বুঝি।

সবিনয় বললুম, 'হিন্দুস্থানী'।

বললে, 'দস্ পিয়াস্তর'। অর্থাৎ দশ পিয়াস্তর (প্রায় এক টাকা) দর্শনী দাও।'

'দস' ছাড়া অন্য কোনো হিন্দুস্তানী শব্দ সে জানে না বুঝলুম, কিন্তু তাই বা কি কম? আমি অবাক হয়ে ইংরেজিতে বললুম, 'প্রভু যীশুর জন্মভূমি দেখ্‌তে হলে পয়সা দিতে হয়?'

বললে, 'হ্যাঁ।'

অনেক তর্কাতর্কি হল। আমি বুঝিয়ে বললুম, 'আমি ভারতীয়, খৃস্টান নই, তবু সাত-সমুদ্র তেরো-নদী পেরিয়ে এসেছি সেই মহাপুরুষের জন্মভূমি দেখতে যিনি সব চেয়ে বেশী চেষ্টা করেছিলেন গরীব-ধনীর তফাৎ-ফারাক ঘুচিয়ে দেবার জন্য, যিনি বলেছিলেন কেউ কামিজটি চাইলে তাকে জোব্বাটি দিয়ে দেবে—আর তাঁরই জন্মভূমি দেখবার জন্য দিতে হবে পয়সা?'

শুধু যে চোরা-ই ধর্মের কাহিনী শোনে না তা নয়। আমি উল্টো পথ নিলুম—পাণ্ডা ফিরে পর্যন্ত তাকালো না।

গাইড বুকে লেখা ছিল, গহ্বরে যাবার দুটি রাস্তা। একটা গ্রীক অর্থডক্স্ প্রতিষ্ঠানের জিম্মায়, অন্যটি রোমান ক্যাথলিকদের। গেলুম সেটির দিকে—গির্জাটি ঘুরে সেদিকে পৌঁছতে হয়।

এখানে দেখি আরেক পাণ্ডা—যেন পয়লাটার যমজ। বেশ-ভূষায় ঈষৎ পার্থক্য।

পুনরপি সেই সদালাপ। 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল।' আম্মো না-ছোড়-বন্দা।

দিল-দরাজ, খোলা-হাত পাঠক হয়ত অসহিষ্ণু হয়ে বলবেন, 'তুমিও তো আচ্ছা ত্যাঁদোড় বাপু; এত পয়সা খর্চা করে পৌঁছলে মোকামে—এখন দু-পয়সার চাবুক কিনতে চাওনা হাজার টাকার ঘোড়া কেনার পর?' তা নয়, আমি দেখতে চাইছিলুম পাণ্ডাদের দৌড়টা কতদূর অবধি।

এবারে হার মানবার পূর্বে শেষ বাণ হানলুম।

বললুম, 'দেশে গিয়ে কাগজে লিখবো, রোমান ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠান কি রকম প্রভু যীশুর জন্মস্থান ভাঙিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। আমাদের দেশেও কম্যুনিষ্ট আছে।'

বলে লাঠিটা বার তিনেক পাথরে ঠুকে ফিরে চললুম ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে।

পাণ্ডা ডাকলে, 'শোনো।'

আমি বললুম, 'হুঃ।'

'তুমি সত্যি এত টাকা খরচ করে এখানে এসে দশ পিয়াস্তরের জন্য তীর্থ না দেখে চলে যাবে?'

'আলবৎ। প্রভুর জন্মভূমি দেখার জন্য পয়সা দিয়ে প্রভুর স্মৃতির অবমাননা করতে চাইনে।'

খ্যাঁস খ্যাঁস করে দাড়ি চুলকোল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ফিস্ ফিস্ করে কানের কাছে মুখ—বোটকা রসুনের গন্ধ—এনে বললো, 'যদি প্রতিজ্ঞা করো কাউকে বলবে না ফ্রী ঢুকতে দিয়েছি, তবে—'।

আমি বললুম, 'আচ্ছা, এখানে তোমার ব্যবসা মাটি করবো না। কিন্তু দেশে গিয়ে বলতে পারবো তো?'

তখন হার মানলো। আমরা বহু লঙ্কা জয় করেছি!!

গীতা-রহস্য

গীতার মত ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে বিরল। তার প্রধান কারণ, গীতা সর্বযুগের সর্ব মানুষকে সব সময়েই কিছু না কিছু দিতে পারে। অধ্যাত্মলোকে চরমসম্পদ পেতে হলে গীতাই অত্যুত্তম পথ প্রদর্শক, আর ঠিক তেমনি ইহলোকের পরম সম্পদ পেতে হলে গীতা যে রকম প্রয়োজনীয় চরিত্র গড়ে দিতে পারে, অন্য কম গ্রন্থেরই সে শক্তি আছে। ঘোর নাস্তিকও গীতা-পাঠে উপকৃত হয়। অতি সবিনয় নিবেদন করছি, এ কথাগুলো আমি গতানুগতিকভাবে বলছিনে, দেশ-বিদেশে গীতাভক্তদের সাথে এক সঙ্গে বসবার করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করেছে।

তাই গীতার টীকা রচনা করা কঠিনও বটে, সহজও বটে। সর্বধর্ম সর্বমার্গের সমন্বয় যে গ্রন্থে আছে তার টীকা লেখার মত জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অল্পলোকেরই থাকার কথা; আর ঠিক তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিছু না কিছু সমর্থন গীতাতে পায় তখন তার পক্ষে একমাত্র গীতার টীকা লেখাই সম্ভবপর হয়—একমাত্র গীতাই তখন সে-ব্যক্তির সামান্যতম র সম্মুখে রাখবার মত সাহসে করতে পারে।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের 'গীতারহস্য' প্রথম শ্রেণীর টীকা। গীতা রহস্যে লোকমান্যের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত অভিমতও আছে বটে, কিন্তু এ গ্রন্থের প্রধান গুণ, তার তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী। এই তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং এই শতকের প্রথম দিকেই সর্বপ্রথম সম্ভবপর হয়,—কারণ তার পূর্বে সর্বধর্মে জ্ঞান আহরণ করতে হলে সর্বভাষা আয়ত্ত করতে হত, এবং সে কর্ম অসাধারণ পণ্ডিতের পক্ষেও অসম্ভব। ঊনবিংশ শতকে নানা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হল এবং বিংশ শতকে সমস্ত উপাদান এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর সুসজ্জিত হয়ে গেল যে, তখনই প্রথম সম্ভবপর হল তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গীতা বিচার করা।

এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশ-বিদেশে বহুতর সাধক, গুণীজ্ঞানী গীতাকে কেন্দ্র করে নানা ধর্মালোচনা করেছেন। বাংলা ইংরেজী এই দুই ভাষাতেই গীতা সম্বন্ধে এত পুস্তক জমে উঠেছে যে, তাই পড়ে শেষ করা যায় না। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা, ফরাসী এবং বিশেষ করে জর্মনে গীতা সম্বন্ধে আমরা বহু উত্তম উত্তম গ্রন্থ দেখেছি।

তৎসত্ত্বেও বলতে বাধ্য লোকমান্যের গ্রন্থখানি অনন্যসাধারণ। এ পুস্তক লোকমান্য মাণ্ডালে জেলে বসে মারাঠি ভাষায় লেখেন।

"অনুবাদ সাহিত্য" প্রবন্ধ লেখার সময় আমি এই পুস্তকখানার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলুম। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ পুস্তকখানির অনবদ্য অনুবাদ বাংলা ভাষায় করে দিয়ে গিয়ে গৌড়জনের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হয়ে গিয়েছেন। এ অনুবাদের সঙ্গে করুণ রসও মিশ্রিত আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি,—

'লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক তাঁহার প্রণীত গীতা রহস্য বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণ কামনায়, বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে,—অতীব দুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও আমি এই গুরুভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি অনুবাদ শেষ করিয়া উহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায়, এতদিন পরে উহা গ্রন্থাকারেও প্রকাশ করিয়া, আমার এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি।'

তারপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যা বলেছেন, পাঠকের দৃষ্টি আমি সেদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে চাই :—

'কেবল একটি আক্ষেপ রহিয়া গেল—এই অনুবাদ গ্রন্থখানি মহাত্মা টিলকের করকমলে স্বহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্বেই তিনি ভারতবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।'

যতবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদখানা হাতে নিই ততবারই আমার মন গভীর বিস্ময়ে ভরে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদ ৮৭২ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। এই অনুবাদ কর্ম প্রায় ষাট বৎসর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরম্ভ করেন। যৌবনে তিনি বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন মহারাষ্ট্রে ছিলেন তখন মারাঠি শিখেছিলেন এবং ততদিনে নিশ্চয়ই সে ভাষার অনেকখানি ভুলে গিয়েছিলেন—রাঁচীতে বসবাস করে দূর মারাঠা দেশের সঙ্গে সাহিত্যিক কেন, কোনো প্রকারের যোগ রাখাই কঠিন। তাই ধরে নিচ্ছি, সেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি নূতন করে মারাঠি শিখে প্রায় তিন লক্ষ মারাঠি শব্দ বাংলায় অনুবাদ করেছেন, মাসের পর মাস তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তার প্রকাশের তত্ত্বাবধান করেছেন, এবং সর্বশেষে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

'গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে আদি-ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।'

অর্থাৎ প্রুফ দেখার ভারও আসলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপরেই ছিল।

তাই বিস্ময় মানি যে, এই হিমালয় উত্তোলন করার পর যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখলেন লোকমান্য ইহলোকে নেই তখন তিনি সেই শোক প্রকাশ করলেন, 'কেবল একটি আক্ষেপ রহিয়া গেল' বলে। এ শোক, এ আক্ষেপ প্রকাশ করার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাণ্ডারে কি ভাষা, বর্ণনশৈলী, ব্যঞ্জনা-নৈপুণ্য ছিল না?

মৃচ্ছকটিকা, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, নীলপাখী অনুবাদ করার পরও কি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে করুণ রস প্রকাশ করার ক্ষমতা অলব্ধ ছিল?

তাই মনে হয়, যিনি বহু রসের সাধনা আজীবন করেছেন, বৃদ্ধ বয়সে সর্বরস মিলে গিয়ে তাঁর মনে এক অনির্বচনীয় সামঞ্জস্যের অভূতপূর্ব শান্তি এনে দেয়। অথবা কি দীর্ঘ দিনযামিনী গীতার আসঙ্গ লাভ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই বৈরাগ্যবিজয়ী কর্মযোগে দীক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যেখানে মানুষ কর্ম করে অনাসক্ত হয়ে, কেবলমাত্র বিশ্বজনের উপকারার্থে? তাই মনে হয়, সাধনার উচ্চতম স্তরে উত্তীর্ণ হয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্পর্শকাতরতা লোপ পায় নি—লোকমান্যকে সম্পূর্ণ পুস্তক স্বহস্তে নিবেদন করতে পারেননি বলে ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু সে বেদনা প্রকাশ করেছেন শোকে আতুর না হয়ে, গাম্ভীর্য এবং শান্তরসে সমাহত হয়ে।

কিন্তু এ সব কথা বলা আমার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। আমার ইচ্ছা বাঙ্গালী যেন এ অনুবাদখানা পড়ে, কারণ লোকমান্য রচিত 'গীতা-রহস্যে'র ইংরিজী অনুবাদখানা অতি নিকৃষ্ট। যেমন তার ভাষা খারাপ, তেমনি মূলের কিছুমাত্র সৌন্দর্য, কণামাত্র গাম্ভীর্য সে অনুবাদে স্থান পায় নি। অথচ বাংলা অনুবাদে, আবার জোর দিয়ে বলি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদে, মূলের কিছুমাত্র সম্পদ নষ্ট হয় নি, মূল মারাঠি পড়ে মহারাষ্ট্রবাসী যে বিস্ময়ে অভিভূত হয়, অনুবাদ পড়ে বাঙ্গালীও সেই রসে নিমজ্জিত হয়।

কিন্তু অতিশয় শোকের কথা—এ অনুবাদ গত আট বৎসর ধরে বাজারে আর পাওয়া যায় না। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ার পর এ পুস্তকের আর পুনর্মুদ্রণ হয়নি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা কোনো উদ্যোগী বাঙ্গালী প্রকাশক যেন পুণার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করে এ পুস্তক পুনরায় প্রকাশ করেন।

আমার কাছে যে অনুবাদখানি রয়েছে তাতে লেখা আছে :—

All rights reserved by
Messrs. R. B. Tilak and S. B. Tilak,
568 Narayan Peth, Poona City.* ॥

* সম্প্রতি খবর এসেছে, 'বিশ্বভারতী'তে পুস্তকখানি পাওয়া যাচ্ছে।

বন

পশ্চিম-জর্মনীর রাজধানী বনবাসী হতে চললেন শুনে পাঠক যেন বিচলিত না হন। এ 'বনের' উচ্চারণ 'ঘরের' মত। বাংলা উচ্চারণের অলিখিত আইন অনুযায়ী 'ন' অথবা 'ণ' পরে থাকিলে একমাত্রিক শব্দে 'অ' কারটি 'ও' কারে পরিণত হয়। যথা—মন, বন, উচ্চারিত হয় মোন, বোন, ধোন,—ইত্যাদি-রূপে। কিন্তু এই জর্মন Bonn শব্দের উচ্চারণে 'ব'য়ের স্বরবর্ণটি 'ঘরের' অকারের মত উচ্চারিত হয়। তাই পরাধীন জর্মনী আজ বনে রাজধানী পেয়ে যেন ঘর পেয়েছে একথা অনায়াসে বলা যায়।

কাগজে বেরিয়েছে বনের লোকসংখ্যা এক লক্ষ। আমাদের দেশে যেমন বলা হয়, পাঁচ বৎসর লালনা করবে, দশ বৎসর তাড়না করবে এবং ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করলে পুত্রের সঙ্গে মিত্রের ন্যায় আচরণ করবে, জর্মনীতে ঠিক তেমনি আইন, কোনো শহরের লোক সংখ্যা যদি এক লক্ষে পেঁছে যায় তবে তিনি সাবালক হয়ে গেলেন, তাঁকে তখন 'গ্রোস-ষ্টাট্' বা বিরাট নগররূপে আদর-কদর করে বার্লিন মুনিক কলোন হামবুর্গের সঙ্গে একাসনে বসাতে হবে। অর্থাৎ মার্কিন ইংরেজ কর্তাদের মতে বন বিরাট নগর এবং জর্মনীর রাজধানী তাঁরা বিরাট নগরেই স্থাপনা করেছেন।

কিন্তু এই কেঁদে কুকিয়ে টায়ে টায়ে এক লক্ষী শহরেই রাজধানী কেন করতে হল? আমি বন শহরে বহু কর্মক্লান্ত দিবস এবং ততোধিক বিনিদ্র যামিনী যাপন করেছি। বনের হাড়হদ্দ আমি বিলক্ষণ জানি। তার লোক সংখ্যা কি কৌশলে ১৯৩৮ সালে এক লক্ষ করা হয়েছিলি সেও আমার অজানা নয়। এক লক্ষী হয়ে সাবালকত্ব পাবার জন্য বন কায়দা করে পাশের একখানা গ্রামকে আদমশুমারীর সময় আপন কণ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছিল—যদিও সে গ্রামটি বনের উপকণ্ঠে অবস্থিত নয়, দু'য়ের মধ্যখানে বিস্তর যব-গমের তেপান্তরী ক্ষেত।

আসল তত্ত্ব হচ্ছে বন রুশ সীমান্ত থেকে অনেক দূরে। মার্কিন ইংরেজ ধরে নিয়েছে আসছে লড়াইএ জর্মনী রুশের বিরুদ্ধে লড়বে এবং তখন রাজধানী যদি রুশ সীমান্তের কাছে থাকে, তবে তাতে মেলা অসুবিধা—প্যারিস ফ্রান্সের উত্তর সীমান্তে থাকায় তাকে যেমন প্রতিবারেই মার খেতে হয়, বেড়ালের মত রাজধানীর বাচ্চা নিয়ে কখনো লিয়োঁ কখনো ভিশিময় ঘুরে বেড়াতে হয়।

কিন্তু বনে রাজধানী নির্মাণে আরেকটি মারাত্মক তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে গেল। বেলজিয়ম যে রকম প্রতিবার জর্মনীকে ঠেকাতে গিয়ে বেধড়ক মার

খেয়েছে, এবার জর্মনী রুশকে ঠেকাতে গিয়ে সেইরকম ধারাই মার খাবে।
বার্লিন গেছে, ফ্রাঙ্কফুর্ট যাবে, বনও বাঁচবে না।

কিন্তু থাক এসব রসকষহীন রাজনীতি চর্চা। বরঞ্চ এসো সহৃদয় পাঠক, তোমাকে বনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

এপারে বন, ওপারে 'সিবেন গেবির্গে' অর্থাৎ সপ্তকুলাচল। মাঝখানে রাইন নদী। সে নদীর বুকের উপর দিয়ে জাহাজ চড়ার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক তামাম ইউরোপ আমেরিকা থেকে জড়ো হয়। নদীটি এঁকে বেঁকে গিয়েছে, দুদিকে সমতল জমির উপর গম-যবের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ছবির মত ঝকঝকে তকতকে ছোট্ট ছোট্ট ঘরবাড়ী, সমতল জমির পিছনে দু সারি পাহাড় নদীর সঙ্গে সঙ্গে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে—মেঘমাশ্লিষ্ট সানুং।

আর বন শহরের ভিতরটাও বড় মোলায়েম। বার্লিনের মত চওড়া রাস্তা নেই, পাঁচতলা বাড়ীও নেই। মোটরের গাঁক গাঁকও নেই। আছে কাশী আগ্রার মত ছোট ছোট গলিঘুঁচি, ছোট্ট ছোট্ট বাড়ী-ঘর-দোর, ঘুমন্ত কাফে, অর্ধ-জাগ্রত রেস্তোরাঁ। আর বিশাল বিরাট বিপুল কলেবর আধখানা শহর জুড়ে ভুবন-বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই জর্মনীতে প্রথম সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ হয়। হেরমান য়াকোবি এখানেই অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর শিষ্য কির্ফেল এখনো সেখানে সংস্কৃত পড়ান। পুরাণ সম্বন্ধে তাঁর মোটা কেতাবখানার তর্জমা ইংরিজীতে এখনো হয় নি। কির্ফেলের সতীর্থ অধ্যাপক লশ উপনিষদ নিয়ে বছর বিশেক ধরে পড়ে আছেন। তাঁর সুহৃদ রুবেনসের শরীরে ঈষৎ ইহুদি রক্ত ছিল বলে তিনি জর্মনী ছাড়তে বাধ্য হন। উপস্থিত তিনি তুর্কীর আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ান। বহুকাল ধরে রামায়ণখানা কামড়ে ধরে পড়ে আছেন—প্রামাণিক পুস্তক লেখবার বাসনায়।

আর রাইনের ওয়াইনের প্রশংসা করার দায় তো আমার উপর নয়। ফ্রান্সের বর্দো বার্গেণ্ডির সঙ্গে সে কাঁধ মিলিয়ে চলে।

আমি যখন প্রথম দিন আমার অধ্যাপকের সঙ্গে লেখাপড়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলুম, তখন তিনি ভূরি ভূরি খাঁটি তত্ত্বকথা বলার পর বললেন :

'এখানে ফুল প্রচুর পরিমাণে ফোটে, তরুণীরা সহৃদয়া এবং ওয়াইন সস্তা। বুঝতে পারছেন, আজ পর্যন্ত আমার কোনো শিষ্যেরই বদনাম হয় নি যে নিছক পড়াশুনো করে সে স্বাস্থ্যভঙ্গ করেছে। আপনিই বা কেন করতে যাবেন?'

রাজধানী ঠিক মোকামেই থানা গাড়লো॥

নেভার রাধা

অনেক প্রেমের কাহিনী পড়েছি, এমন সব দেশে বহু বৎসর কাটিয়েছি যেখানে প্রেমে না পড়াতেই ব্যত্যয়—তাই চোখের সামনে দেখেছি প্রেমের নিত্য নব প্যাটার্ন—কিন্তু একটা গল্প আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনে। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে গল্পটি বলেছেন ওস্তাদ তুর্গেনিয়েফ। এবং শুধু তাই নয়—ঘটনাটি তাঁর নিজের জীবনে সত্য সত্যই ঘটেছিল।

দস্তয়েফস্কি, তলস্তয়ের সৃজনীশক্তি তুর্গেনিয়েফের চেয়ে অনেক উঁচু দরের, কিন্তু তুর্গেনিয়েফ যে স্বচ্ছ সলীল ভঙ্গীতে গল্প বলতে পারতেন, সে রকম কৃতিত্ব বিশ্ব-সাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন অতি অল্প ওস্তাদই। তুর্গে-নিয়েফের শৈলীর প্রশংসা করতে গিয়ে এক রুশ সমঝদার বলছেন, 'তাঁর শৈলী যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে—ইট্ ফ্লোজ্ লাইক্ অয়েল।'

তুর্গেনিয়েফ ছিলেন খানদানি ঘরের ছেলে—তলস্তয়েরই মত। ওরকম সুপুরুষও নাকি মস্কো, পিটার্সবুর্গে কম জন্মেছেন। কৈশোরে তাঁর একবার শক্ত অসুখ হয়। সেরে ওঠবার পর তাঁকে ডাক্তার হুকুম দেন, নেভা নদীর পারে কোনো জায়গায় গিয়ে কিছুদিন নির্জনে থাকতে। নেভার পারে এক জেলেদের গ্রামে তুর্গেনিয়েফ পরিবারের জমিদারী ছিল। গ্রামের এক প্রান্তে জমিদারদের একখানি ছোট্ট বাঙলো—চাকর-বাকর নিয়ে ছোকরা তুর্গেনিয়েফ সেই বাঙলোয় গিয়ে উঠলেন।

সেই ছবিটি আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। জমিদারের ছেলে, চেহারাটি চমৎকার আর অসুখ থেকে উঠে সে চেহারাটি দেখাচ্ছে করুণ, উদাস-উদাস, বেদনাতুর। তার উপর তুর্গেনিয়েফ ছিলেন মুখচোরা এবং লাজুক, আচরণে অতিশয় ভদ্র এবং নম্র। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, গ্রামে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে—জেলে-মেয়েরা দূর থেকে আড়নয়নে দেখছে তুর্গেনিয়েফ মাথা নিচু করে, দু'হাত পিছনে এক জোড় করে নদীর পারে পাইচারি করছেন। জরাজীর্ণ গ্রামে হঠাৎ যেন দেবদূত নেমে এসেছেন।

মেয়েরা জানে এরকম খানদানি ঘরের ছেলে তাদের কারো দিকে ফিরেও তাকাবে না, কিন্তু তা হলে কি হয়, তরুণ হৃদয় অসম্ভব বলে কোনো জিনিস বিশ্বাস করে না। সে রববারে জেলে তরুণীরা গির্জায় গেল দুরু দুরু বুক নিয়ে—বড়দিনের ফ্রক-ব্লাউজ পরে।

তরুণীদের হৃদয় ভুল বলে নি। অসম্ভব সম্ভব হল। তুর্গেনিয়েফ মেয়েদের দিকে তাকালেন। তাঁর মনও চঞ্চল হল।

তুর্গেনিয়েফ পষ্টাপষ্টি বলেন নি, কিন্তু আমার মনে হয় মস্কো, পিটার্স-

বুর্গের রঙ-মাখানো গয়না-চাপানো লোক-দেখানো সুন্দরীদের নখরা-ফক্কুড়ির তাঁর মন বিতৃষ্ণায় ভরে দিয়েছিল বলে তিনি জেলে গ্রামের অনাড়ম্বর সরল সৌন্দর্যের সামনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার মনে হয়, তুর্গেনিয়েফের কবি হৃদয় অতি সহজেই হীরার ফুল অনাদর করে বুনো ফুল আপন বুকে গুঁজে নিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, গ্রামের সুন্দরীদের পয়লানম্বরী কাউকে তিনি বেছে নিলেন না। এই উল্টোস্বয়ম্বরে যাকে তিনি হৃদয় দিলেন সে স্বপ্নেও আশা করতে পারে নি, এই প্রিয়দর্শন তরুণটি সুন্দরীদের অবহেলা করে তাকেই নেবে বেছে। সত্য বটে, মেয়েটি কুৎসিৎ ছিল না, এবং তার স্বাস্থ্যও ছিল ভালো; কিন্তু তাই দিয়ে তো আর প্রেমের প্রহেলিকার সমাধান হয় না।

মেয়েটির মনে যে কী আনন্দ, কী গর্ব হয়েছিল সেটা কল্পনা করতে আমার বড় ভালো লাগে। তুর্গেনিয়েফ তার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন—নিজের জীবনে ঘটেছিল বলে হয়ত তিনি এই ঘটনাটিকে বিনা অলঙ্কারে বর্ণনা করেছেন। আমার কিন্তু ভারী ইচ্ছে হয়, মেয়েটির লজ্জা মেশানো গর্ব যদি আরো ভালো করে জানতে পারতুম—তুর্গেনিয়েফ যদি আরো একটু-খানি ভালো করে তার হৃদয়ের খবরটি আমাদের দিতেন।

শুধু এইটুকু জানি, মেয়েটি দেমাক করেনি। ইভানকে পেয়ে সে যে-লোকে উঠে গিয়েছিল সেখানে তো দেমাক-দম্ভের কথাই উঠতে পারে না। আর তুর্গেনিয়েফ হিংসা, ঈর্ষা থেকে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অন্য মেয়েদের সঙ্গে অতি ভদ্র মিষ্ট আচরণ দিয়ে—কোনো জমিদারের ছেলে নাকি ওরকমধারা মাথা থেকে হ্যাট তুলে নিচু হয়ে জেলেনিদের কখনো নমস্কার করে নি। কৈশোরের সেই অনাবিল প্রেম কিরূপে আস্তে আস্তে তার বিকাশ পেয়েছিল, তুর্গেনিয়েফ তার সবিস্তর বর্ণনা দেন নি—তাই নিয়ে আমার শোকের অন্ত নেই। দুজনে দেখা হত। হাতে হাত রেখে তারা নদীর ওপারের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকত। চাঁদ উঠতো। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করলে তুর্গেনিয়েফ তাঁর ওভার কোট দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে দিতেন। সে হয়ত মৃদু আপত্তি করতো—কিন্তু নিশ্চয়ই জানি ইভানের কোনো ইচ্ছায় সে বেশীক্ষণ বাধা দিতে পারতো না।

তুর্গেনিয়েফ সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন। বাড়ি থেকে হুকুম এসেছে প্যারিস যেতে।

বিদায়ের শেষ সন্ধ্যা এল। কাজ সেরে মেয়েটি যখন ছুটে এল ইভানের কাছ থেকে বিদায় নিতে, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

অঝোরে নীরবে কেঁদেছিল শুধু মেয়েটি। তুর্গেনিয়েফ বারে বারে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি এরকম ধারা কাঁদছো কেন? আমি তো

আবার ফিরে আসবো—শিগগিরই। তোমার কান্না দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ভাবছো, আমি আর কখনো ফিরে আসবো না।'

কিন্তু হায়, এসব কথায় কি ভাঙা বুক সান্ত্বনা মানে? জানি, তুর্গেনিয়েফের তখনো বিশ্বাস ছিল তিনি ফিরে আসবেন, কিন্তু যে ভালোবেসেছে সমস্ত সত্তা সর্বস্ব অস্তিত্ব দিয়ে তার হৃদয় তো তখন ভবিষ্যৎ দেখতে পায়—বিধাতা পুরুষেরই মত।

তুর্গেনিয়েফ বললেন, 'তোমার জন্য প্যারিস থেকে কি নিয়ে আসবো?'

কোনো উত্তর নেই।

'বলো কি নিয়ে আসবো।'

'কিছু না—শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'কিছু না? সে কি কথা? আর সবাই তো এটা, ওটা, সেটা চেয়েছে। এই দেখো, আমি নোটবুকে সব কিছু টুকে নিয়েছি। কিন্তু তোমার জন্য সব চেয়ে ভালো, সব চেয়ে দামী জিনিস আনতে চাই। বলো কি আনবো?'

'কিছু না।'

তুর্গেনিয়েফকে অনেকক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি করতে হয়েছিল, মেয়েটির কাছ থেকে কোন একটা, কিছু একটার ফরমাইশ বের করতে। শেষটায় সে বললে, 'তবে আমার জন্য সুগন্ধি সাবান নিয়ে এসো।'

তুর্গেনিয়েফ তো অবাক। 'এই সামান্য জিনিস! কিন্তু কেন বলো তো, তোমার আজ সাবানে শখ গেল? কই, তুমি তো কখনো পাউডার সাবানের জন্য এতটুকু মায়া দেখাও নি—তুমি তো সাজগোজ করতে পছন্দ করো না।'

নিরুত্তর।

'বলো।'

'তা হলে আনবার দরকার নেই।' তারপর ইভানের কোলে মাথা রেখে কেঁদে বললো, 'ওগো, শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'আমি নিশ্চয়ই সাবান নিয়ে আসবো। কিন্তু বলো, তুমি কেন সুগন্ধি সাবান চাইলে।'

কোলে মাথা গুঁজে মেয়েটি বললো, 'তুমি আমার হাতে চুমো খেতে ভালোবাসো আমি জানি। আর আমার হাতে লেগে থাকে সব সময় মাছের আঁশটে গন্ধ। কিছুতেই ছাড়াতে পারি নে। প্যারিসের সুগন্ধি সাবানে শুনেছি সব গন্ধ কেটে যায়। তখন চুমো খেতে তোমার গন্ধ লাগবে না।'

অদৃষ্ট তুর্গেনিয়েফকে সে গ্রামে ফেরবার অনুমতি দেন নি।

সে দুঃখ তুর্গেনিয়েফও বুড়ো বয়স পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি॥

বর্বর জর্মন

গর্সের মকদ্দমা এগিয়ে চলেছে, চতুর্দিকে আটঘাট বেঁধে তরিবত করে তামাম দুনিয়ায় ঢাকঢোল বাজিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওঃ, কী বাঁচনটাই না বেঁচে গেছ! এয়সা দুশমনের জাত যদি লড়াই জিতত, তা হলে তোমাদের দমটি পর্যন্ত ফেলতে দিত না। ভাগ্যিস আমরা ছিলাম, বাঁচিয়ে দিলাম।

বিলেতী কাগজগুলো যে দাপাদাপি করে, তাতে আশ্চর্য হবার বিশেষ কিছু নেই। তারা মার খেয়েছে, এখন শুধু মার দিয়েই খুশী হবে না, হরেক রকমে দুশমনকে অপমান করবে, তাতে ডবল সুখ; সে-সব কথা সবাইকে ইনিয়ে বিনিয়ে শোনাবে, তাতে তেহারা সুখ; তারপর দেশটার কলকব্জা অর্থাৎ তার জিগর-কলিজা, নাড়িভুঁড়ি বিনা ক্লোরফর্মে টেনে টেনে বের করে তাকে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেবে, বেলজেন কাকে বলে।

কিন্তু এ দেশের ইংরেজী কাগজগুলো যখন ফেউ লাগে, তখন আর বরদাস্ত হয় না। ছিলি তো বাবা যুদ্ধের বাজারে বেশ, না হয় স্কচ না খেয়ে সোলান খেয়েছিস, না হয় এসপেরেগাস আরটিশোক খেতে পাস নি, না হয় তুলতুলে ফ্ল্যানল আর নানা রকমের হ্যাট ও ক্যাপ পাস নি বলে সর্দি ও গর্মির ভয়ে একটুখানি পা সামলে চলেছিলি, তাই বলে যা বুঝিস নে, মালুম নেই, তা নিয়ে এত চেল্লাচেল্লি করিস কেন? টু পাইস তো করেছিস, সে কথাটা ভুলে যাস কেন, তাই নিয়ে দেশে যা, দুদিন ফুর্তি কর, যে জায়গা নাগাল পাস নে, সেখানে চুলকোতে যাস নি। কিন্তু শোনে কে! সেই জিগির—জর্মন বর্বর, 'বশ', 'হান'।

পরশুদিন জর্মন বর্বরতার প্রমাণ পেলুম, পুরনো বইয়ের দোকানে—একখানা কেতাব, আজকালকার জলের চেয়েও সস্তা দরে কিনলাম। তার নাম·ধাম—

BENGALISCHE ERZAEHLER / DER SIEG DER SEELE / AUS DEM INDISCHEN / INS DEUTSCH UEBERTRAGEN / VON / REINHARDT WAGNER /

অর্থাৎ 'বাঙ্গালী কথক'। (Erzaehlen ধাতুর অর্থ কাহিনী বলা) আত্মার জয়, ভারতীয় ভাষা হইতে জর্মনে রাইনহার্ট ভাগনার কর্তৃক অনুদিত।

চমৎকার লাল মলাটের উপর সোনালি লাইনে একটি অজন্তা ঢঙের সুন্দরী

বাঁশী বাজাচ্ছে। ছবিখানি এঁকেছেন, কেউ-কেটা নয়, স্বয়ং অধ্যাপক এড্‌মুন্‌ড্‌ শেফার।

কেতাবখানা যত্রতত্র বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে না—এস্তেহার রয়েছে। 'ব্যুশারফ্রয়েণ্ডে' সংঘের সভ্যরা কিনতে পাবেন। বর্বর জর্মন বটতলা ছাপিয়ে, পেঙগুইন বেচে পয়সা করতে চায় না, তার বিশ্বাস—দেশে যথেষ্ট সত্যিকারের রসিক পাঠক আছে, তারা সংঘের সদস্য হয়ে বাছা বাছা বই কিনবে। আর যদি তেমনটা নাই হয়, হল না, চুকে গেল—বাংলা কথা।

'বাংলা কথা' ইচ্ছে করেই বললাম, কারণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ভাগনার সাহেব খাসা বাংলা জানেন। প্রথম আলাপে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহাশয় কোন্‌ ভাষার অধ্যাপক?

বাংলার।

বাংলার? বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে?

আজ্ঞে।

ছাত্র কটি?

গেল পাঁচ বছরের হিসেব নিলে গড় পড়তা ৩/৫।

গর্বে আমার বুক ফুলে উঠল। আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, সেখানে ফি ক্লাসে নিদেন পক্ষে দেড়শটা বাঁদর ঝামেলা লাগাত। আদর্শ ছিল—৩০০ আপন ওয়ান প্রফেসারের। বললাম ৩/৫ একটু কম নয়?

ভাগনার বিরক্ত হয়ে বললেন, রবিবাবুর লেখা পড়েন নি—The rose which is single need not envy the thorns which are many?

উঠে গিয়ে ধনধান্যে পুষ্পেভরা রেকর্ডখানা লাগালেন। ভাব হয়ে গেল। কিন্তু মনে মনে বললাম, কুল্লে ৩/৫-এর জন্যে একটা আস্ত প্রফেসার! জর্মনরা বর্বর।

অবতরণিকাটি ভাগনার সাহেব নিজেই লিখেছেন; আগাগোড়া তর্জমা করে দিলুম।

'সঙ্কলনটির আরম্ভ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গদ্য রচনাগুলোকে বাংলায় tschota galpa (ছোট গল্প) বলা হয়। ছোট গল্পগুলোকে একরকমের ছোটখাট উপন্যাস বলা যেতে পারে; শুধু নায়কনায়িকার সংখ্যা কম। গল্পগুলোর কাঠামো পশ্চিম থেকে নেওয়া হয়েছে, ভিতরকার প্রাণবস্তু কিন্তু খাঁটি ভারতীয়। মাঝে মাঝে দেখা যায়, সমস্ত গল্পটার আবহাওয়া একটি মাত্র মূল সুরের চতুর্দিকে গড়া। কতকগুলো আবার গীতিরসে ভেজানো। আবার এও দেখা যায়, ভারতবাসীর ধর্ম আচার ব্যবহারের সঙ্গে এমনই বাঁধা যে গল্পের বিকাশ ও সমস্যাসমাধান এমন সব কারণের উপর নির্ভর করে, যেগুলো পশ্চিমের নভেলে থাকে না। আশা-নিরাশায় দোলা-খাওয়া কাতর হৃদয় এই সব গল্পে কখনও

বা ধর্মের কঠিন কঠোর আচারের সঙ্গে আঘাত খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে, কখনও বা তার ছোট গণ্ডির ভিতর শান্তি খুঁজে পায়; সেই ধুকধুক হৃদয়ের কঠোর দুঃখ, চরম শান্তির বর্ণনা করা হয়েছে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। আন্দ্রেয়াস হয়েসলারের সঙ্গে আমরা সুর মিলিয়ে বলতে পারি, "মানুষের আত্মার ভাঁজে ভাঁজে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি।"

'ভারতীয়দের প্রেম বড় উদার, তাতে গণিকারও স্থান আছে। গণিকাদের কেউ কেউ আবার জন্মেছে বেশ্যার ঘরে, বদ খেয়ালে বেশ্যা হয় নি। গ্যোটের গণিকাকে ভগবান অবহেলা করেন নি, এঁদেরও হয়তো অবহেলা করবেন না।

'সঙ্কলনটি সুখ দুঃখের গল্পেই ভর্তি করা হয়েছে; হাস্যরসের গল্প নিতান্ত কম দেওয়া হয়েছে। তার কারণও আছে; দুঃখ যন্ত্রণা সব দেশের সব মানুষেরই একরকম, কিন্তু হাস্যরস প্রত্যেক জাতিরই কিছু না কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। করুণ রসে মানুষ মানুষকে কাছে টানে, হাস্য রস আলাদা করে। তবু তিনটি হাস্যরসের গল্প দেওয়া হল; হয়তো পশ্চিম দেশবাসীরা সেগুলোতে আনন্দ পাবেন।

'বিশ্বসাহিত্যের সেবা যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে সব চেয়ে ভাল রচনা বাদ দেওয়া অন্যায়। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া চলে না। তাঁর 'লিপিকা' থেকে তাই কয়েকটি সবচেয়ে ভাল লিখন দেওয়া হল; এগুলোকে ছোট ছোট-গল্প বলা ভুল হবে। (১) লেখাগুলো সহজেই দু ভাগে আলাদা করা যায়, কতকগুলো মহাকাব্যের কাঠামোয় গড়া বলে গভীর সত্যের রূপ প্রকাশ করে তোলে, আর কতকগুলো ছবির মত কিসের যেন প্রতীক, কেমন যেন আস্বচ্ছ অর্ধ-অবগুণ্ঠিত অনাদি অনন্তের আস্বাদ দেয়, অথবা যেন নিগূঢ় আত্মার অন্তর্নিহিত কোমল নিশ্বাস আমাদের সর্বাঙ্গে স্পর্শ দিয়ে যায়।

'সর্বশেষে যাঁরা তাঁদের লেখার অনুবাদ করবার অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে যাঁরা এই সঙ্কলনের গোড়াপত্তন ও সম্পূর্ণ করাতে সাহায্য করেছেন। সদুপদেশ দিয়েছেন ও অনুবাদে যাতে ভুলত্রুটি না থাকে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ নিম্নলিখিত মহাশয়দের কাছে;—হের দ· প· রায়চৌধুরী, ডি· ফিল (গ্যোটিঙেন); ইঞ্জিনিয়র বিদ্যার্থী অ· ভাদুড়ী; য· চ· হুই, এম· এস· সি; য· ভ· বসু, ডি· ফিল (বার্লিন) এবং ইঞ্জিনিয়রীঙ ডিপ্লোমাধারী স. চ. ভট্টাচার্য। (২) সুরসিক, বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ল. ভ. রামস্বামী আইয়ার, (৩) এম· এ·, বি· এল বেশির ভাগ মূল লেখাগুলি

১ রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' থাকতে ভাগনার কেন যে সেগুলো কাজে লাগালেন না, তা বোঝা গেল না।

২ D. P. Roy Chowdhury; A. Bhadhuri; J. C. Huii; J. Bose; S. C. Bhattacharya.

৩ ইনি শব্দতাত্ত্বিকদের ভিতর সুপরিচিত।

পাঠিয়েছেন ও সংকলন আরম্ভ করার জন্য উৎসাহিত করে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য গৃহিণীকে ধন্যবাদ।'

অবতরণিকাটি নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা করা যায়, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য পাঠক যেন নিজেই ভাগনার সাহেবের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। আমার শুধু একটি বক্তব্য, যে, অবতরণিকার ভাষাটি সরল, যাঁরা মূল জর্মনে কাণ্ট হেগেল এমন কি টমাস মান্‌ও পড়েছেন তাঁরাই জানেন জর্মনে কি রকম আড়াইগজী সব বাক্য হয়। ভাগনারের জর্মন অনেকটা বাংলা ছন্দের—কিছুটা প্রমথ চৌধুরীর মত। বাক্যগুলো ছোট ছোট; সাদামাটা খাস জর্মন কথার ব্যবহার বেশি, কিন্তু দরকার মত শক্ত লাতিন কথা লাগাতে সায়েব পিছপা হন নি। জর্মন গুরুচণ্ডালীর সম্বন্ধে বাংলার মত ভয়ঙ্কর সচেতন নয়। ভাগনার আবার সাধারণ জর্মনের চেয়েও অবচেতন।

পাঠকের সবচেয়ে জানার কৌতুহল হবে যে, কার কার লেখা ভাগনার সায়েব নিয়েছেন। তার ফিরিস্তি দিচ্ছি :—

১। আমার দেশ (কবিতা) শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়*
(Schridvidschendralal Raj)

২। সন্ন্যাস : শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (বিল্বদল)

৩। অঙ্কিত; গোলাপ; চোর; কুসুম; শিউলি : শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় (সিঁদুর চুপড়ি, মধুপর্ক)

৪। দেবতার ক্রোধ; রত্নপ্রদীপ : শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (আল্পনা ও জলছবি)

৫। পদ্মফুল; জন্ম মৃত্যু শৃঙ্খল (আংশিক অনূদিত) : শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু (মায়াপুরী)

৬। একাকী; প্রেমের প্রথম কলি : শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী (হাসি ও অশ্রু)

৭। বউ চোর, রসময়ির রসিকতা : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ষোড়শী, গল্পাঞ্জলি)

৮। গলি; পরীর পরিচয়; নূতন পুতুল; ছবি; সুয়োরাণীর সাধ; সমাপ্তি; সমাধান; লক্ষ্যের দিকে; সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়; পায়ে চলার পথ; কণ্ঠস্বর; প্রথম শোক; একটি দিবস : শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Schrirabindranath Thakur (লিপিকা)

৯। আঁধারে আলো : শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মেজদিদি)

১০। পাষাণ হৃদয় : শ্রীমতী সুনীতি দেবী (বঙ্গবাণী)।

* জীবিত মৃত সকলের নামের পূর্বেই ভাগনার 'শ্রী' ব্যবহার করেছেন। বাংলা "শ" বুঝাতে হলে জর্মনে sch (ইংরেজীতে Schedule এর sch), 'জ' বুঝাতে হলে 'dsch', 'চ' বুঝাতে 'tsch', 'য়' বুঝাতে হলে 'j' ব্যবহার করা হয়েছে।

এখনই বলে দেওয়া ভাল যে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৬ সালে। তার মানে এই নয় যে, এই কজনই তখন নামজাদা লেখক ছিলেন। বরঞ্চ মনে হয়, ভাগনার ১৯১৮-২০ এর সময় বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন ও সেযুগে এ'দেরই যে খুব প্রতিপত্তি ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় যে কেন বাদ পড়লেন ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্যি মনে রাখতে হবে যে, নির্বাচনটা ঠিক ভাগনারের হাতে ছিল না। এ দেশ থেকে যে সব বই পাঠানো হয়েছিল, তার থেকে ভাল হোক, মন্দ হোক তাঁকে বাছতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাম ভাগনার চলতি জর্মন কায়দায় 'টেগোর' লেখেন নি।

নানা টীকা টিপ্পনী করা যেত, কিন্তু সেটা পাঠকের কাছে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। জর্মন-মন এই গল্পগুলোতেই কেন সাড়া দিল, তার কারণ অনুসন্ধান তাঁরাই করুন।

সাধারণ জর্মনের পক্ষে দুর্বোধ কতকগুলো শব্দ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে; যেমন—অগ্নি (দেবতা), অলকা, অন্নপূর্ণা, আরতি, আষাঢ়, B.A., বেলপাতা, ভৈরবী রাগিনী, ভর্তৃহরি, ফুলশয্যা, চোরা বাগান, দোয়েল, জয়দেব, যোগাসন, হাতের নোয়া, একতারা, হোলি, হুলুধ্বনি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মেদিনীপুর, শালিগ্রাম, সমুদ্রমন্থন, পয়সা, পানি কৌড়ি, রজনীগন্ধা, রাসলীলা, সাহানা, শুভদৃষ্টি, রথযাত্রা, ব্রাহ্ম সমাজ, ইংরেজী উড়িয়া বামুন।

সবগুলোর মানে, সব কটাই অতি সংক্ষেপে ঠিক ঠিক দেওয়া হয়েছে। মাত্র একটি ভুল—মেঘদূতকে Epos বা মহাকাব্য বলা হয়েছে। উড়ে বামুনরা যে গঙ্গা স্নানের সময় ডলাই-মলাই ও ফোঁটা তিলক কেটে দেন সে কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের যে রান্নার নামে কি বিষ খেতে দেন, সেটা বলতে ভাগনার ভুলে গিয়েছেন। B.A. উপাধি ভাগনার জর্মনদের বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং M.A. যে লাতিন Magister Artium সেটা বলতে ভোলেন নি। আশা করতে পারি আমাদের প্রতি জর্মনদের ভক্তি বেড়েছে।

আম-কাঁঠাল, শিউলি-বকুল বহু গল্পে বার বার এসেছে কিন্তু ফুল আর ফলের ছয়লাপে ভাগনার ঘাবড়ে গিয়ে সেগুলো বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। তবে তিনি রজনীগন্ধার প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতদুষ্ট।

অনুবাদ কি রকম হয়েছে? অতি উৎকৃষ্ট, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পদে পদে ছত্রে ছত্রে এই কথাটি বার বার বোঝা যায়, যে দূর বার্লিনে বসে কি গভীর ভালবাসা দিয়ে ভাগনার অনুবাদগুলো করেছেন এবং সেই ভালবাসাই তাঁকে বাংলার ছোটগল্পের অন্তস্তলে নিয়ে গিয়েছে।

ভৈরবী কোন্ সময় গাওয়া হয়, ফুলশয্যাতে কে শোয়, মেদিনীপুর কোন দিকে, হাতের নোয়া আর হুলুধ্বনি কাদের একচেটে, কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস

কে এই সব বিস্তর বায়নাক্কা বরদাস্ত করে জর্মন ১৯২৮ সালে এই বই পড়েছে আর সুদূর বাংলার হৃদিরস আস্বাদন করবার চেষ্টা করেছে।

বর্বর নয় তো কি!!

ফরাসী—জর্মন

গল্প শুনিয়াছি, এক পাগলা মার্কিণ নাকি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 'হস্তী' সম্বন্ধে যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবে তাহাকে এক লক্ষ পৌণ্ড্ পারিতোষিক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিষয়টি যে বৃহৎ সে সম্বন্ধে অবকাশ নাই; তাহা না হইলে মার্কিণ বিশেষ করিয়া ঐ বিষয়টিই করিবেন কেন?

সে যাহাই হউক, খবর শুনিবামাত্র ইংরাজ তৎক্ষণাৎ কুকের আপিসে ছুট দিল। হরেক রকম সাজসরঞ্জাম জোগাড় করিয়া পক্ষাধিককাল যাইতে না যাইতেই সে আসামের বনে উপস্থিত হইল ও বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই কেতাব লিখিল 'আসামের পার্বত্যাঞ্চলে হস্তী শিকার'।

ফরাসী খবর শুনিয়া ধীরে সুস্থে চিড়িয়াখানার দিকে রওয়ানা হইল। হাতীঘর বা পিলখানার সম্মুখে একখানা চৌকী ভাড়া লইয়া আস্তে আস্তে শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে লাগিল। আড়নয়নে হাতীগুলির দিকে তাকায় আর শার্টের কফে নোট টুকে। তিন মাস পরে চটি বই লিখিল 'লামুর পারমি লেজেলেফাঁ' অর্থাৎ 'হস্তীদের প্রেমরহস্য।'

জর্মন খবর পাইয়া না ছুটিল কুকের আপিসে, না গেল চিড়িয়াখানায়। লাইব্রেরীতে ঢুকিয়া বিস্তর পুস্তক একত্র করিয়া সাত বৎসর পর সাত ভলুমে একখানা বিরাট কেতাব প্রকাশ করিল; নাম 'আইনে কুর্ৎসে আইনফ্যুরুঙ ইন ডাস স্টুডিয়ম ডেস এলেফাণ্টেন' অর্থাৎ 'হস্তীবিদ্যার সংক্ষিপ্ত অবতরণিকা'।

গল্পটি প্রাক্-সভিয়েট যুগের। তখনকার দিনে রুশরা কিঞ্চিৎ দার্শনিক ভাবালু গোছের ছিল। রুশ খবর পাইয়া না গেল হিন্দুস্থান, না ছুটিল চিড়িয়াখানায়, না ঢুকিল লাইব্রেরীতে। এক বোতল ভদকা (প্রায় 'ধান্যেশ্বরী' জাতীয়) ও ত্রিশ বাণ্ডিল বিড়ি লইয়া ঘরে খিল দিল। এক সপ্তাহ পরে পুস্তক বাহির হইল, 'ভিয়েদিল লিলি ভি এলেফাণ্ট?' 'তুমি কি কখনও হস্তী দেখিয়াছ?' অর্থাৎ রুশ যুক্তি-তর্কদ্বারা প্রমাণ করিয়া ছাড়িল যে হস্তী সম্বন্ধে যে সব বর্ণনা শোনা যায় তাহা এতই অবিশ্বাস্য যে তাহা হইতে এমন বিরাট পশুর কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। অর্থাৎ হস্তীর অস্তিত্ব প্রমাণাভাবে অস্বীকার করিতে হয়।

আমেরিকান এই সব পন্থার একটিও যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। সে

বাজারে গিয়া অনেকগুলি হাতি কিনিল ও বক্তার্থে নয়, সত্য সত্যই 'হাতি পুষিল'। কুড়ি বৎসর পরে তাহার পুস্তক বাহির হইল 'বিগাড় এ্যাণ্ড বেটাড় এলেফেণ্টস—হাউ টু গ্রো দেম?' অর্থাৎ আরো ভালো ও আরও বৃহৎ হাতি কি করিয়া গজানো যায়।' শুনিয়াছি আরো নানা জাতি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে হস্তীর স্বদেশবাসী এক ভারতবাসীও নাকি ছিলেন। কিন্তু 'নেটিভ' 'কালা আদমী' বলিয়া তাঁহার পুস্তিকা বরখাস্ত-বাতিল-মকুব-নামঞ্জুর-ডিসমিস-অসিদ্ধ করা হয়। অবশ্য কাগজে কলমে বলা হইল যে, যেহেতুক ভারতবাসী হস্তীকে বাল্যাবস্থা হইতে চিনে তাই তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহাকে পক্ষপাতদুষ্ট করিতে পারে!

গল্পটি শুনিয়া হস্তী সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ে না সত্য কিন্তু ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও মার্কিন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ঘোলাটে ধারণা তবুও হয়। সব জাতির বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা সম্ভবপর নহে, করিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ প্রাচ্য জাতিসমূহের কথা ছাড়িয়া দিলে (আর ছাড়িতেই হইবে, কালা-ধলা একাসনে বসিতে পারে শুধু দাবার ছকেই) সত্যই বিদগ্ধ বলিতে বোঝায় জর্মন ও ফরাসীকে। বাদবাকি সকলেই ইহাদের অনুকরণ করে। তবে জর্মনরা নতমস্তকে স্বীকার করে যে, 'কন্‌সানট্রেশন কেম্পের' অনুপ্রেরণা তাহারা ইংরাজের নিকট হইতে পাইয়াছিল। নিতান্ত তাহারা কোনো জিনিস অর্ধ-পক্ক রাখিতে চাহে না বলিয়াই এই প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণ বৈদগ্ধে পৌঁছাইয়াছিল।

জর্মন যদি কোনো ভারতবাসীকে পায় তবে ইতি উতি করিয়া যে কোনো প্রকারে তাহার সঙ্গে আলাপ জুড়িবার চেষ্টা করিবেই। আলাপ হওয়া মাত্রই কাল বিলম্ব না করিয়া আপনাকে এক গেলাস বিয়ার দিবে তারপর আপনার কালো চুলের প্রশংসা করিবে ও আপনার বাদামী (তা আপনি যত ফর্সাই হউন না কেন) অথবা কালো রঙের প্রশস্তি গাইবে। তারপর আপনাকে প্রশ্নবাণের শরশয্যায় শোয়াইয়া ছাড়িবে, 'আপনারা দেশে কি খান, কি পরেন, সাপের বিষে মানুষ কতক্ষণে মরে, সাধুরা শূন্যে উড়িতে পারেন কি না, কাণ্ট বড় না শঙ্কর, তাজমহল নির্মাণ করিতে কত খরচ হইয়াছিল, অজন্তার কলা মারা গেল কেন, কামশাস্ত্রের প্রামাণিক সংস্করণ কোথায় পাওয়া যায়, সর্পপূজা এখনও ভারতবর্ষে চলে কিনা, সাধারণ ভারতবাসীর গড়পড়তা কয়টি স্ত্রী থাকে, হিন্দু মুসলমান ঝগড়া করে কেন?'

'কিন্তু হাঁ,' বার তিনেক মাথা নাড়াইয়া বলিবে 'হাঁ, গান্ধী একটা লোক বটে। ওরকম লোক যীশুখৃস্টের পরে আর হয় নাই। ইংরাজকে কী ব্যতিব্যস্তই না করিল। গোলটেবিল বৈঠকের পর তাঁহার কথা ছিল বাইমার শহরে আসিবার। কিন্তু আসিলেন না; আমরা বড়ই হতাশ হইয়াছিলাম। সত্যই কি গান্ধী গ্যোটেকে এত ভক্তি করেন যে তামাম ইউরোপে ঐ একমাত্র বাইমারই তাঁহার মন কাড়িল?'

ভারতবাসীর প্রতি সাধারণ জর্মনের ভক্তি অসীম ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের অন্ত নাই॥

'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়—'

সংবাদপত্রের পাঁজে যাঁরা পোড় খেয়ে ঝামা হয়ে গিয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত আত্মজনের মৃত্যুতেও বিচলিত হন না। হবার উপায়ও নেই। কারণ, যদি সে আত্মজন প্রখ্যাতনামা পুরুষ হন, তবে সংবাদিককে অশ্রু সংবরণ করে সে মহা-পুরুষ সম্বন্ধে রচনা লিখতে বসতে হয়। এ অধম পাঁজাতে ঢুকেছে বটে, পোড়ও খেয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঝামা হয়ে যায় নি বলে তার চোখের জল মুছতে অনেকখানি সময় কেটে গিয়েছে।

বহু সাহিত্যিক, বহু কবি, বহু ঔপন্যাসিকের সঙ্গে দেশ বিদেশে আমার আলাপ হয়েছে কিন্তু সরোজিনী নাইডুর মত কলহাস্যমুখরিত, রঙ্গরসে পরিপূর্ণ অথচ জীবনের তথা দেশের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য সম্বন্ধে সচেতন দ্বিতীয় পুরুষ বা রমণী আমি দেখি নি। কতবার দেখেছি দেশের গভীরতম দৈন্য-দুর্দশা নিয়ে গম্ভীরভাবে, তেজীয়ান্ ভাষায় কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে তিনি রঙ্গরসে চলে গিয়েছেন। লক্ষ্য করে তখন দেখেছি যে, রসিকতার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু তখনও চোখের জল ছল ছল করছে। আমার মনে হয়েছে, দুঃখ বেদনার কথা বলতে বলতে পাছে তিনি সকলের সামনে হঠাৎ কেঁদে ফেলেন, সেই ভয়ে কথার বাঁক ফিরিয়ে হাসি তামাসায় নেমে পড়েছেন।

চটুল রসিকতাই হোক আর গুরুগম্ভীর রাজনীতি নিয়েই কথা হোক, সরোজিনী যে-ভাষা যে-শৈলী ব্যবহার করতেন তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, এমন কোন সাহিত্যিক বা কবির নাম মনে পড়ছে না। রবীন্দ্রনাথ গল্প বলতে অদ্বিতীয় ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সরোজিনীর মত কখনও শতধা উচ্ছ্বসিত হতেন না। সরোজিনী আপন-ভোলা হয়ে দেশকালপাত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে যে গল্পগুজব করে যেতেন, তাতে মজলিস জমতো ঢের বেশী। রবীন্দ্রনাথ যেন কখনও কাউকে খুব কাছে আসতে দিতেন না। সরোজিনীর মজলিসে কারো পক্ষে দূরে বসা ছিল অসম্ভব।

এরকম প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন অল্প লোক। অথচ সরোজিনীর চেয়ে অল্প প্রতিভা নিয়ে অনেকেই সরোজিনীর চেয়ে সফলতর সৃষ্টিকার্য করতে সক্ষম হয়েছেন। সরোজিনীর ভাব গম্ভীর ছিল, ভাষা মিষ্ট ছিল। তৎসত্ত্বেও তাঁর কাব্য-সৃষ্টি তাঁর ক্ষমতার পিছনে পড়ে রইলো কেন?

আমার মনে হয়, সরোজিনীকে যাঁরা বক্তৃতা দিতে শুনেছেন, তাঁর মজলিসে

আসন্ন পাবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরাই স্বীকার করবেন বিদেশী মায়া-মৃগের সন্ধানে বেরিয়ে সরোজিনী স্থায়ী যশের সতী সীতাকে হারালেন। এতে অবশ্য সরোজিনীর দোষ নেই। অল্প বয়সে তিনি যে ভাষা শিখেছিলেন, পরিণত বয়সে সেই ভাষাতেই তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন। কিন্তু মাতৃস্তন্য না খেয়ে তিনি হরলিক্‌স্ খেয়েছিলেন বলে তাঁর কবিতা কখনও মাতৃরসের স্নিগ্ধতা পেল না। আমি জানি, পৃথিবীতে আজ ইংরেজ ছাড়া কোনো বিদেশী সরোজিনীর মত ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখতে পারবেন না। এ বড় কম কথা নয়, কিন্তু এ কৃতিত্বও আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। কারণ নিশ্চয় জানি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী দ্বন্দ্বের বাতাবরণে যদি সরোজিনী বাল্যকাল না কাটাতেন, বাংলা মায়ের কোলে বসে যদি তিনি শুধু বাংলাই শুনতেন, তা হলে কৈশোরে বিদেশী ভাষা তাঁর কবিত্ব-প্রতিভাকে ভস্মাচ্ছাদিত করতে পারতো না,—মাইকেলের প্রতিভা যে রকম বিদেশী ভস্মকে অনায়াসে সরিয়ে ফেলতে পেরেছিল।

তাই সরোজিনী আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন। সরোজিনী প্রমাণ করে দিলেন, বিদেশী ভাষায় কখনও স্থায়ী সৃষ্টি-কর্ম সম্ভবপর হয় না। আর কোনো ভারতবাসী ভবিষ্যতে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাতে কবিতা লিখবে না। পূর্ব-পাকিস্তান উর্দু গ্রহণ না করে বিচক্ষণের কার্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গ যেন হিন্দী-মৃগের সন্ধানে না বেরোয়।

পাঠক যেন না ভাবেন, আমি সরোজিনীর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হই নি। আমি শুধু বলতে চাই, চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব বহুগুণে বৃহত্তর ছিল। তিনি আর পাঁচজন কবির মত অবসর সময়ে কবিতা লিখে বাদবাকী সময় সাধারণ লোকের মতন কাটাতেন না। তাঁর কথা, তাঁর হাসি, তাঁর গালগল্প, তাঁর রাগ, তাঁর অসহিষ্ণুতা, তাঁর ধৈর্যচ্যুতি, তাঁর আহার বিহার ভ্রমণ বিলাস সব কিছুই ছিল কবিজনোচিত। কবিরমণীর—রাজনৈতিক সরোজিনী, জনপদকল্যাণী সরোজিনী বাক্‌নিপুণা সরোজিনী—এই তিন এবং অন্য বহুরূপে যখন তিনি দেখা দিতেন, তখন সেসব রূপই তাঁর কবিরূপের নীচে চাপা পড়ে যেত। কবিতা রচয়িত্রী সরোজিনীর চেয়েও কবি সরোজিনী বহু বহু গুণে মহত্তর।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাংলার এক কবি গিয়েছিলেন, বাংলার কুঁড়ে ঘরে রবির উদয় হল, এ বিস্ময় আমাদের কখনও যাবে না। ঠিক তেমনি ভারত এমন কি পুণ্য করেছিল যে তার বুকে ফুটে উঠলো সরোজিনী?

ট্রামে বাসে মেয়েদের জন্য আসন ত্যাগ করা ভদ্রতা অথবা অপ্রয়োজনীয়, এ সম্বন্ধে সর্বত্র আলোচনা শোনা যায় এবং আলোচনা অনেক সময় অত্যধিক উষ্মাবশতঃ মন কষাকষির সৃষ্টি করে। একদল বলেন, মা-জননীরা দুর্বল, তাহাদিগকে স্থান ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য; অন্য দল বলেন, মা-জননীরা যখন নিতান্তই বাহির হইয়াছেন, তখন বাহিরের কষ্টটা যত শীঘ্র সহ্য করিতে শেখেন ততই মঙ্গল।

মেয়েরা যদি শব্দার্থেই ট্রামে-বাসে বাহির হইতেন, তাহা হইলে বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না, কিন্তু তাঁহারা যে শীঘ্রই ব্যাপকার্থে অর্থাৎ নানা প্রকার চাকরী ব্যবসায় ছড়াইয়া পড়িবেন সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ অন্যান্য দেশে যাহা পঁচিশ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল এদেশে তাহার পূর্বাভাস দেখা যাইতেছে। সব কিছু ঘটিবে, এমন কথাও বলিতেছি না।

১৯১৪-এর পূর্বে জর্মন পরিবার কর্তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেন, পুত্রকে শিক্ষাদানের গ্যারাণ্টি দিতে আমি প্রস্তুত, কন্যাকে বর দানের। দেশের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল; যুবকেরা অনায়াসে অর্থোপার্জন করিতে পারিত বলিয়াই যৌবনেই কিশোরীকে বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিবার পূর্বেই কিশোরীদের বিবাহ হইয়া যাইত; তাহারা বড় জোর আবিটুর বা ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়িবার সুযোগ পাইত।

১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধে দেশের প্রায় সকল যুবককেই রণাঙ্গনে প্রবেশ করিতে হইল। মেয়েদের উপর ভার পড়িল খেত-খামার করিবার, কারখানা দোকান আপিস চালাইবার, ইস্কুলে পড়াইবার, ট্রাম ট্রেন চালু রাখিবার। জর্মনীর মত প্রগতিশীল দেশেও মেয়েরা স্বেচ্ছায় হেঁসেল ছাড়ে নাই, নাচিতে কুদিতে বাহির হয় নাই। সামরিক ও অর্থনৈতিক বন্যা তাহাদের গৃহবহ্নি নির্বাপিত করিয়াছিল, হোটেলের আগুন শত গুণ আভায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

যুদ্ধের পর যুবকেরা ফিরিয়া দেখে, মেয়েরা তাহাদের আসনে বসিয়া আছে। বেশীর ভাগ মেয়েরা আসন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল, যদি উপার্জনক্ষম বর পাইয়া ঘর সংসার পাতিবার ভরসা তাহাদিগকে কেউ দিতে পারিত। কিন্তু সে ভরসা কোথায়? জর্মনীতে তখন পুরুষের অভাব। তদুপরি ইংরাজ-ফরাসী স্থির কাঁচা মাল দেওয়া বন্ধ করিয়া তাহার কারবার রুদ্ধশ্বাস করিবে; জর্মনীর পুঁজীর অভাব ছিল তো বটেই।

তখন এক অদ্ভুত অচ্ছেদ্য চক্রের সৃষ্টি হইল। মেয়েরা চাকরী ছাড়ে না, বর পাইবার আশা দুরাশা বলিয়া চাকরী ছাড়িলে খাইবে কি, পিতা হৃত-সর্বস্ব, ভ্রাতা যুদ্ধে নিহত অথবা বেকার। বহু যুবক বেকার, কারণ মেয়েরা তাহাদের আসন গ্রহণ করিয়া তাহাদের উপার্জনক্ষমতা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বিবাহ করিতে অক্ষম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে সমস্যাটি জটিল নয়। যুবকেরা পত্নীর উপার্জনে সন্তুষ্ট হইলেই তো পারে। কিন্তু সেখানে পুরুষের দম্ভ যুবকের আত্মসম্মানকে জাগ্রত করে। পত্নীর উপার্জনের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষ জীবন যাপন করাকে কাপুরুষতা মনে করে। মেনী-মুখো, ঘরজামাই হইতে সহজে কেহ রাজী হয় না; বিদেশে না, এ দেশেও না। ইংলণ্ডে তো আরো বিপদ। বিবাহ করা মাত্র যুবতীকে পদত্যাগ করিতে হইত—স্বামী উপার্জনক্ষম হউন আর নাই হউন। (রেমার্কের 'ডের বেক ৎসুর‍্যুক্' দ্রষ্টব্য)।

যত দিন যাইতে লাগিল গৃহকর্তারা ততই দেখিতে পাইলেন যে, 'মেয়েকে বর দিব'—ভালোই হউক আর মন্দই হউক—এ গ্যারাণ্টি আর জোর করিয়া দেওয়া যায় না। কাজেই প্রশ্ন উঠিল, পিতার মৃত্যুর পর কন্যা করিবে কি? সে তো ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া অলস মস্তিষ্ককে শয়তানের কারখানা করিয়া বসিল। এদিকে ওদিকে তাকাইতেও আরম্ভ করিয়াছে। না হয় তাহাকে কলেজেই পাঠাও; একটা কিছু লইয়া থাকিবে ও শেষ পর্যন্ত যদি সেখানে কোনো ছোকরাকে পাকড়াও নাও করিতে পারে তবু তো লেখা-পড়া শিখিবে, তাহারি জোরে চাকরী জুটাইয়া লইবে।

আমি জোর করিয়া বলিতে পারি ১৯২৪-৩২ তে যে সব মেয়েরা কলেজ যাইত তাহাদের অল্পসংখ্যকই উচ্চশিক্ষাভিলাষিণী হইয়া। কারণ, বারে বারে দেখিয়াছি ইহারা উপার্জনক্ষম বর পাওয়ামাত্রই 'উচ্চশিক্ষাকে' ভালো করিয়া নমস্কার না করিয়াই অর্থাৎ কলেজ-আপিসে রক্ষিত সার্টিফিকেট মেডেল না লইয়াই—ছুটিত গির্জার দিকে। আরেকটি বস্তু লক্ষ্য করিবার মত ছিল—তাহা সভয় নিবেদন করিতেছি। ইহাদের অধিকাংশই দেখিতে উর্বশী মেনকার ন্যায় ছিলেন না। সুন্দরীদের বিবাহ ম্যাট্রিকের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যাইত—তাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আসিবে কোন্ দুঃখে? কলেজে যে কয়েটি সুন্দরী দেখা যাইত, তাহাদের অধিকাংশ অধ্যাপক-কন্যা।

অচ্ছেদ্য চক্র ঘুরিতে লাগিল আরও দ্রুত বেগে। কলেজের পাশ করা মেয়ে আস্কারা পাইয়াছে বেশী। যে চাকুরী বাজারে সাধারণ মেয়ে প্রবেশ করিতে ভয় পাইত তাহারা সেই সব চাকরীর বাজারও ছাইয়া ফেলিল—চক্রের গতি দ্রুততর হইল। পার্থের সন্ধান নাই—তিনি তখনো অজ্ঞাতবাসে—স্বয়ংবর চক্র ছিন্ন করিবে কে?

কিন্তু ইতোমধ্যে সেই নিয়ত ঘূর্ণ্যমান স্বয়ংবর চক্রের একটি স্ফুলিঙ্গ নৈতিক জগতে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিল। সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

মেয়েরা অর্থোপার্জন করিতেছে। পিতা মৃত। পরিবার পোষণ করিতে হয় না। বিবাহের আশা নাই। অর্থ সঞ্চয় করিবে কাহার জন্য? নিরানন্দ, উত্তেজনাহীন শুষ্ক জীবন কেনইবা সে যাপন করিতে যাইবে? অভিভাবকহীন যুবতী ও প্রৌঢ়ারা তখন বিলাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দোষ দিয়া কি হইবে? পিতা বা ভ্রাতা না থাকিলে অরক্ষণীয়ার কি অবস্থা হয় তাহা বেদেই বর্ণিত হইয়াছে—যতদূর মনে পড়িতেছে কোনো এক বরুণ মন্ত্রেই—ঋষি সেখানে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছেন।

উপার্জনক্ষম যুবতীরা বিলাসের প্রশ্রয় দেওয়া মাত্রই চক্র দ্রুততর হইল। যে সব যুবকেরা অন্যথা বিবাহ করিত, তাহারা এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল। মুক্ত হট্টে দুগ্ধ যখন অপর্যাপ্ত তখন বহু যুবক গাভী ক্রয় করা অবিমৃষ্যকারিতার লক্ষণ বলিয়া স্থির করিল। বিবাহ সংখ্যা আরো কমিয়া গেল—গির্জার বিবাহ-পুরোহিতদের দীর্ঘতর অবকাশ মিলিল। নাইট ক্লাবের সৃষ্টি তখনই ব্যাপকভাবে হইল, 'গণিক' জাতির জন্ম হইল—ইহাদেরই নাম ইউরোপীয় সর্বভাষায় জিগোলো। যে পুরুষ স্ত্রীর উপার্জনে জীবন ধারণ করিতে ঘৃণা বোধ করিত, সে-ই গোপনে, কখনো প্রকাশ্যে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইল। (মাউরার, 'জর্মনী পুটস দ ক্লক ব্যোক' দ্রষ্টব্য)।

তখন পুরুষ বলিল, 'স্ত্রীপুরুষে যখন আর কোনো পার্থক্যই রহিল না, তখন পুরুষ ট্রামে বাসে স্ত্রীলোকদিগের জন্য আসন ত্যাগ করিবে কেন?' উঠিয়া দাঁড়াইলেও তখন বহু মেয়ে পরিত্যক্ত আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইত না। সব কিছু তখন ৫০।৫০। আমার দৃঢ় অন্ধবিশ্বাস কলিকাতা কখনও ১৯৩২-এর বার্লিনের আচরণ গ্রহণ করিবে না। বাঙ্গালী দুর্ভিক্ষের সময় না খাইতে পাইয়া মরিয়াছে; কুকুর বিড়াল খায় নাই। তবুও সমাজপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম—অর্থনৈতিক কারণে মানুষ কি করিয়া নৈতিক জগতে ধাপের পর ধাপ নামিতে বাধ্য হয়।

অনুসন্ধিৎসু প্রশ্ন করিবেন, জর্মনীর স্বয়ংবর চক্র কি কেহই ছিন্ন করিতে সক্ষম হন নাই? হইয়াছিলেন। সে বীর হিটলার। পার্থের ন্যায় তাঁহারও নানা দোষ ছিল কিন্তু অজ্ঞাতবাসের পর তিনিই চক্রভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে ড্রেসডেন শহরে এক নির্দিষ্ট দিনে চারিশত যুবক-যুবতীকে সগর্বে শোভাযাত্রা করিয়া দল বাঁধিয়া বিবাহ করিতে যাইতে দেখিলাম। অন্য শহরগুলিও পশ্চাৎপদ রহিল না; সর্বত্র সপ্তপদী সচল হইয়া উঠিল। ১৯৩৮ সালে গিয়া দেখি কলেজগুলি বৌদ্ধ মঠের ন্যায় নারী বর্জিত। হিটলার কি কৌশলে চক্রভেদ করিয়াছিলেন সে কথা আরেক দিন হইবে॥

ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন

দেশে বিদেশে বহুবার দেখিয়াছি যে, ইংরাজ বা ফরাসীর প্রশ্নে ভারতীয় সদুত্তর দিতে পারিতেছেন না। তাহার প্রধান কারণ (১) ভারতীয়রা স্বীয় ঐতিহ্য ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সুপরিচিত নহেন—ইহার জন্য প্রধানতঃ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিই দায়ী। (২) বিদেশী রীতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা—সে জ্ঞান থাকিলে ভারতীয় তৎক্ষণাৎ বিদেশীকে চক্ষে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দেখাইয়া দিতে পারে যে, সে যাহা করিতেছে তাহা অন্যরূপে বা অল্প কিয়দ্দিন পূর্বে বিদেশীরাও করিত। নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে ও আশা করি কোনো কোনো ভারতীয়ের উপকারও হইবে।

বিদেশী : তোমাকে সেদিন ফির্পোতে দাওয়াত করিয়াছিলাম। তুমি টালবাহানা দিয়ে পালাইলে। শুনিলাম শেষটায় নাকি আমজদীয়া হোটেলে খাইতে গিয়াছিলে। ফির্পোর খানা রাঁধে ত্রিভুবন বিখ্যাত ফরাসীস শেফ্ দ্য কুইজিন। সেই শেফকে উপেক্ষা করিয়া তুমি কোন্ জঙ্গলীর রান্না খাইতে গেলে!

ভারতীয় : তোমাদের রান্নার অন্য গুণাগুণ বিচারের পূর্বে একটি অত্যন্ত সাধারণ বস্তুর দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লক্ষ্য করিয়াছ কি না জানি না যে, তোমাদের রান্নায় তিক্ত, টক ও ঝাল এই তিন রসের অভাব। অর্থাৎ ছয় রসের অর্ধেক নাই—ঝাল কিছু কিছু দাও বটে কিন্তু তাও বোতলে পুরিয়া টেবিলে রাখো, কারণ ঐ রসটির প্রতি তোমাদের সন্দেহ ও ভয় এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। কাজেই তোমাদের খানা না খাইয়াই বলা যায় যে, আর যে গুণই থাকুক, বৈচিত্র্য তোমাদের রান্নায় থাকিবে না। শুধু লবণ আর মিষ্ট এই সা, রে লইয়া তোমরা আর কি সুর ভাঁজিবে? দুই-তারা লইয়া বীণার সঙ্গে টক্কর দিতে চাও? আমজদীয়ার 'জঙ্গলী'ও তাই তোমার শেফকে অনায়াসে হারাইয়া দিবে। দ্বিতীয়তঃ, তোমাদের ডাইনিং টেবিল ও রান্নাঘরে কোনো তফাৎ নাই। তোমরা ক্রুয়েট নামক ভাঙ্গা-বোতল শিশিওয়ালার একটা ঝুড়ি টেবিলের উপর রাখো। নিতান্ত রসকসহীন সিদ্ধ অথবা অগ্নিপক্ক বস্তু যদি কেহ গলাধঃকরণ না করিতে পারে তবে তাহাকে ডাইনিং টেবিলে পাকা রাঁধুনি সাজিতে হয়। স্নেহ জাতীয় পদার্থ সংযোগ করিতে গিয়া অলিভ ওয়েল ঢালো, উগ্রতা উৎপাদনের জন্য রাই সরিষার (মাস্টার্ড) প্রলেপ দাও; কটু করিবার জন্য গোলমরিচর ছিটাও,—বোতলটার আবার ছিদ্র রুদ্ধ বলিয়া তাহাকে লইয়া ধস্তাধস্তি করিতে করিতে স্কন্ধদেশস্থ অস্থিচ্যুতি ও ধৈর্যচ্যুতি যুগপৎ অতি অবশ্য ঘটে—; ভীতু পাচক বড় সাহেবের ভয়ে

লবণও দিয়াছে কম,—লক্ষ্য করিয়াছ কি শতকরা আশীজন সুপ মুখে দিবার পূর্বেই নুন ছিটাইয়া লয়?—অতএব লবণ ঢালো। তৎসত্ত্বেও যখন দেখিলে যে ভোজ্যদ্রব্য পূর্ববৎ বিস্বাদই রহিয়া গিয়াছে তখন তাহাতে সস্ নামক কিম্ভূতকিমাকার তরল দ্রব্য সিঞ্চন করো। তোমার গাত্রে যদি পাচক রক্ত থাকে তবে অবশ্য তুমি তাবৎ প্রলেপসিঞ্চন অনুপান-সম্মত বা মেকদার-মাফীক করিতে পারো, কিন্তু আমি বাপু 'ভদ্রলোকের' ছেলে বাড়ীতে মা মাসীরা ঐ কর্মটি রান্নাঘরে রন্ধন করিবার সময় করিয়া থাকেন। খানার ঘর আর রান্না-ঘরে কি তফাৎ নেই?

সায়েব : রুচিভেদ আছে বলিয়াই তো এত বায়নাক্কা।

ভারতীয় : ঐ সব জ্যেষ্ঠতাতত্ত্ব আমার সঙ্গে করিও না। তাই যদি হইবে তবে খানাঘরেই আগুন জ্বালাইয়া লইয়া মাংস সিদ্ধ করো না কেন, গ্রিল-কবাব ঝলসাও না কেন? কেহ অর্ধপক্ক মাংস পছন্দ করে, কেহ পূর্ণপক্ক। সেখানেও তো রুচিভেদ; তবে পাচকের হাতে ঐ কর্মটি ছাড়িয়া দাও কেন? আসল কথা, এই রুচিভেদ স্বীকার করিয়াও পাচক বহুজনসম্মত একটি মধ্য-পন্থা বাহির করিয়া লহে ও গুণীরা সেটি স্বীকার করিয়া অমৃতলোকে পৌঁছেন। রুচিভেদ থাকা সত্ত্বেও গুণীরা সেক্সপিয়র কালিদাস পছন্দ করেন। কবি কখনো যমক, অনুপ্রাস, উপমা, আখ্যান বস্তুর পৃথক পৃথক নির্ঘণ্ট পৃথক পৃথক পুস্তকে দিয়া বলেন না রুচিমাফিক মেকদার-অনুপানযোগে কাব্যসৃষ্টি করিয়া রসাস্বাদন করো।

সায়েব : সে কথা থাকুক। কিন্তু আমজদীয়ার খানা খাইলে তো হাত দিয়া; সেখানে তো ছুরি-কাঁটার বন্দোবস্ত নাই।

ভারতীয় : না, আছে। ভারতবর্ষ তোমাদের পাল্লায় পড়িয়া দিন দিন এমনি অসভ্য হইয়া পড়িতেছে যে, ভারতীয়রাও ছুরি কাঁটা ধরিতে শিখিবার চেষ্টা করিতেছে। এ নোংরামি করিবার কি প্রয়োজন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

সায়েব : নোংরামি? সে কি কথা?

ভারতীয় : নিশ্চয়ই। ঐ তো রহিয়াছে তোমার ছুরি, কাঁটা, চামচ; ঐ তো ন্যাপকিন। ঘসো আর দেখো, কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যেটুকু বাহির হইবে না, তাহা খাদ্যরস সংযোগে অগোচরে পেটে যাইবে। আর আমি আমার আঙুল ঘষি, দেখো কতটা ময়লা বাহির হয়। আর যদি আমার আঙুল ময়লা হয়ই, তবে আমি এখনই টয়লেট ঘরে গিয়া আচ্ছা করিয়া হাত ধুইয়া লইব। তুমি যদি ছুরি কাঁটা লইয়া ঐ দিকে ধাওয়া করো তবে ম্যানেজার পুলিস ডাকিবে, ভাবিবে চৌর্যবৃত্তিতে তোমার হাতে খড়ি হইয়াছে মাত্র। আর শেষ কথাটিও শুনিয়া লও, আমারি আঙুল আমি আমারি মুখে দিতেছি; তুমি যে কাঁটা চামচ মুখে দিতেছ সেগুলি যে কত লক্ষ পায়োরিয়াগ্রস্তের

অধরোষ্ঠে এবং আস্য গহ্বরেও নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে তাহার সন্দেশ চাখো কি? চীনারা তোমাদের তুলনায় পরিষ্কার। খাইবার কাঠি সঙ্গে লইয়া হোটেলে প্রবেশ করে।

সায়েব : সে কথা থাকুক (ধুয়া)।

ভারতীয় : হ্যাঁ আলোচনাটি আমার পক্ষেও মর্মঘাতী। আমারি এক বাঙালী ক্রীস্টান বন্ধু কাঁটা দিয়া ইলিশ মাছ খাইতে যান—বেজায় সায়েব কিনা—ফলে ইলিশাস্থি তাঁহার গলাস্থ হয় এমনি বেকায়দা বেদুরস্তভাবে যে, তাঁহার শরীরের অস্থিগুলি এখন গোরস্তানে চিরতরে বস্তি গাড়িয়াছে (অশ্রু বর্ষণ)।

সায়েব : আহা! তবে ইলিশ না খাইলেই হয়।

ভারতীয় : ইংরাজ হইয়া বেকন-আণ্ডা না খাইলেই হয়; ফরাসী হইয়া শ্যাম্পেন না খাইলেই হয়; জর্মন হইয়া সসিজ না খাইলেই হয়; বাঙালী হইয়া ইলিশ না খাইলেই হয়, অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেও হয়; আত্মহত্যা করিলেও হয়। লজ্জা করে না বলিতে? বাংলার বুকের উপর বসিয়া হোম্ হইতে টিনস্থ বেকন না পাইলে 'ব্রিটিশ ট্রেডিশন ইন্ ডেঞ্জার' বলিয়া কমিশন বসাইতে চাহো, আর আমি গঙ্গার পারে বসিয়া গঙ্গার ইলিশ খাইব না? তাজ্জব কথা!

সায়েব : সে কথা থাকুক (ধুয়া)। কিন্তু ঐ যে বলিলে তোমাদের মেয়েরা রান্না করেন, তাঁহারা কি শুধুই রান্না করেন? তাঁহারা এই নির্মম পর্দাপ্রথা মানেন কেন?

ভারতীয় : সে তাঁহারা মানেন; তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।

সায়েব : তাঁহাদিগের সঙ্গে তো দেখাই হয় না।

ভারতীয় : সে আমাদের পরম সৌভাগ্য।

সায়েব : (চিন্তিত মনে) কথাটা কি একটু কড়া হইল না? আমরা কি এতই খারাপ?

ভারতীয় : খারাপ ভালোর কথা জানি না সায়েব। তবে ১৭৫৭ সালে তোমাদের সাথে পীরিতি সায়রে সিনান করিতে গিয়া শুধু যে আমাদের সকলি গরল ভেল তাহা নয় স্বরাজগামছাখানা হারাইয়া ফেলিয়া দুইশত শীত বৎসর ধরিয়া আকণ্ঠ দৈন্য দুর্দশা পঙ্কে নিমগ্ন—ডাঙ্গায় উঠিবার উপায় নাই। পুরুষদের তো এই অবস্থা; তাই মেয়েরা অন্দর মহলে তোমাদিগকে quit করিয়া বসিয়া আছেন।

সায়েব : এ সব তো বাইরের কথা; তোমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য—

ভারতীয় : আরেকদিন হইবে। উপস্থিত আমাকে Quit India গাহিতে রাস্তায় যাইতে হইবে॥

ডিসেম্বর, ১৯৪৫।

শিক্ষা-সংস্কার

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করা হইবে এই রকম একটি খবর শুনিতে পাইলাম।

পণ্ডিতেরা একত্র হইয়া এই বিষয় নানা তর্ক নানা আলোচনা করিবেন; সেই সব পণ্ডিতের নামাবলীতে দেশবিদেশের নানা ডিগ্রী নানা উপাধির লাঞ্ছন অঙ্কিত থাকিবে; নানা ভাষায় নানা কণ্ঠে তাঁহারা জ্ঞানগর্ভ মতামত প্রকাশ করিবেন। সেখানে আমাদের ক্ষীণ নেটিভ কণ্ঠ পেঁৗছিবে এমন দুরাশা আমরা করি না। আমাদের প্রধান দোষ অবশ্য যে আমরা 'ওল্ড ফুলজ' 'ধর্মপ্রাণ'; আমাদের যুক্তিতর্ক ধর্মশাস্ত্র হইতে সঞ্চয় করি, সেগুলি এযুগে বরবাদ রদ্দি জঞ্জাল। কিন্তু আমরা নাচার। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, যে মুলা খাইয়াছে তাহার ঢেকুরে মুলার গন্ধ থাকিবেই, আমরা 'মুলো' না খাইয়া থাকিলেও জানি যে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইলে 'মুলের' অনুসন্ধান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শুনিতে পাই সায়েবরাও নাকি তাই করেন—নদীর মুল অনুসন্ধান করিতে গিয়া নাকি তাঁহারা বিস্তর পাহাড় পর্বত অতিক্রম করেন।

দেশে যখন ধনদৌলত পর্যাপ্ত ছিল তখন বহু লোক তীর্থ করিতে যাইতেন এবং বহু পণ্ডিতের এই ধারণা যে, তাবৎ উত্তর ভারতে রেলগাড়ী প্রচলিত হইবার পূর্বেও যে ভাঙা ভাঙা হিন্দী দিয়া কাজ চালানো যাইত তাহার কারণ যাত্রীদের তীর্থ-পরিক্রমা। দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পীঠ বেলুচিস্থানের হিংগুলা হইতে বামজঙ্ঘা পীঠ শ্রীহট্ট পর্যন্ত বহু বহু যাত্রী বহু যুগ ধরিয়া গমনাগমন করিয়াছেন, বহু ভাষার বহু শব্দের আদান-প্রদান সংমিশ্রণের ফলে পণ্ডিতজনানন্দিত একটি 'চলতি' ভাষা যুগ যুগ ধরিয়া রূপ পরিবর্তন করিয়া অধুনা হিন্দুস্থানী নামে পরিচিত। সে যাহাই হউক, এই অবদানের স্মরণে তীর্থযাত্রীদের প্রশংসা করিবার সদুদ্দেশ্য লইয়া বক্ষ্যমান আলোচনা নিবেদন করিতেছি না।

তীর্থে পুণ্য সঞ্চয় হইত কিনা সে তর্ক অধুনা নিষ্ফল, কিন্তু এ বিষয়ে তো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, জ্ঞান সঞ্চয় হইত, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইত, সঙ্কীর্ণতা হ্রাস পাইত এবং নানা বর্ণ, নানা জাতি, নানা আচার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়াও যাত্রী হৃদয়ঙ্গম করিত ভারতবর্ষের অখণ্ড রূপ। আবার বলি, নানা পার্থক্য নানা বৈষম্যের গন্ধধূপধূম্রের পশ্চাতে ভারত মাতার সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি প্রস্ফুটিত হইত। গ্রামের বৈচিত্র্যহীন সমাজে ফিরিয়া আসিয়াও তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত সেই সুস্পষ্ট আলেখ্য।

শিক্ষার এক মূল অঙ্গ ছিল তীর্থ ভ্রমণ, দেশ ভ্রমণ বলিলে একই কথা বলা হয়।

প্রশ্ন এই, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তো অজস্র ডিগ্রী প্রতি বৎসর অকৃপণভাবে বর্ষণ করেন, কিন্তু কখনো তো বিদ্যার্থীকে বার্ষিক পরিক্রমার সময় জিজ্ঞাসা করেন না, 'তুমি দেশ ভ্রমণ করিয়াছ, ভারতবর্ষের অখণ্ডরূপ হৃদয়ে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছ?'

বোধ হয় করা হয় না, তাই যখন সাধারণ বাঙালী গ্রাজুয়েট লিলুয়ার টিকিট কাটে তখন বলিয়া বেড়ায়, 'ভাই, কি আর করি, হাওয়া বদলাইতেই হয়, পশ্চিম চলিলাম।'

অসহিষ্ণু পাঠক বলিবেন, 'কী বিপদ! বিশ্ববিদ্যালয় কি বুকিং আপিস যে তুমি বাতায়নস্থ হইলেই তোমাকে সস্তায় বিদেশ যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন?'

নাই বা দিলেন, কিন্তু এমন বন্দোবস্ত কি সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, বাঙালী ছেলে ছয়মাস এলাহাবাদে পড়িল, আরো ছয়মাস লাহোরে এবং সর্বশেষ তিন বৎসর কলিকাতায়? নিন্দুকে বলে যে, কলেজের ছেলেরা নাকি প্রায় দুই বৎসর গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ায়, শেষের চারি মাস, তিন মাস অবস্থা ভেদে দুই মাস নোট মুখস্থ করিয়া পাশ দেয়। তবেই জিজ্ঞাস্য, চারি বৎসরের এক বৎসর অথবা এম.এ. পাশের জন্য ছয় অথবা সাত বৎসরের দুই অথবা তিন বৎসর যদি কোনো ছেলে প্রদেশে প্রদেশে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয়ার্থে (সে শতকরা এক শত নাই হউক) তীর্থভ্রমণ অর্থাৎ এই কলেজ সেই কলেজ করে, তবে কি পাপ হয়?

এমন কি একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও নাই যেখানে তাবৎ ভারতের ছেলে অধ্যয়ন করিতে সমবেত হয়, একে অন্যকে চিনিতে পারে? (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আলীগড়ে ঈষৎ হয়, কিন্তু নানা কারণে এ স্থলে তাহার আলোচনা আজ আর করিব না) অথচ সংস্কৃত পড়িবার জন্য ভারতবর্ষের সর্ব-প্রদেশের ছাত্র কাশীর চতুষ্পাঠীতে সমবেত হয়, মুসলমান ছাত্র দেওবন্দ যায়। (বিশ্বভারতীর কথা তুলিলাম না, কারণ সরকারী ছাপ লইতে হইলে সেখানকার ছাত্রকে এখনো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খিড়কি দরজা দিয়া ঢুকিতে হয়)।

অবিশ্বাসী পাঠক বলিবেন, "কথাটা মন্দ শুনাইতেছে না, তবে ঠিক সাহস পাইতেছি না। অন্য কোনো দেশে কি এ ব্যবস্থা আছে?" 'হোমের' অর্থাৎ সদাশয় সরকারের দেশের কথা বলিতে পারি না এবং তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, কারণ শুনিয়াছি, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি স্থিতি নাকি ইটন্ হ্যারোর ক্রীড়াভূমিতে। তাই যদি হয়, তবে দেব পতঞ্জলির ভাষায় বলি, "হেয়ং দুঃখমনাগতম্"। স্বরাজ পাইয়া বিদেশে অপ্রতিহতভাবে দোর্দণ্ডপ্রতাপে

রাজত্ব করিবার কুমতি ভারতের যেন কদাচ না হয়; তাহাতে পরিণামে যে দুঃখ পাইতে হইবে তাহা পূর্ব হইতেই বর্জনীয়।

কিন্তু ফ্রান্সে আছে, জর্মনীতে আছে, সুইটজারল্যাণ্ডে আছে অস্ট্রিয়ায় আছে, তাবৎ বলকানে আছে, অথবা ১৯৩৯ পর্যন্ত ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল্কান রাজ্য হইতে প্রতি বৎসর শত শত ছাত্র বার্লিন, ভিয়েনা, প্যারিস, জিনীভা যাইত, বৎসর, দুই বৎসর নানা কলেজ নানা দেশ ঘুরিয়া পুনরায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া গিয়া বাড়ীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস দিত, বিদেশের 'টার্ম' স্বদেশে গোণা হইত, আর দেশের অভ্যন্তরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তো কথাই নাই। এমন জর্মন ছেলে কস্মিন-কালেও খুঁজিয়া পাইবেন না যে ঝাড়া পাঁচ বৎসর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্জন করিয়া পদবী লইয়াছে। হয়ত উত্তরায়ণ কাটাইয়াছে রাইনল্যাণ্ডে, কলোনে অথবা হাইডেলবের্গে— দক্ষিনায়ণ কীল অথবা হমবুর্গে, তারপরের বৎসর ম্যুনিকে ও সর্বশেষ দুই বৎসর স্বপুরী ক্যোনিগসবের্গে। শুধু তাহাই নহে। দেশের এক প্রান্তের ছাত্র যাহাতে অন্য প্রান্তে যায় তাহার জন্য রেল কোম্পানী তাহাকে সিকি ভাড়ায় লইয়া যাইতে বাধ্য। ছুটির সময় যখন বাড়ী যাইবে, ফিরিয়া আসিবে তাহার জন্যও সিকি ভাড়া।

কিন্তু আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি। কারণ, স্মরণ আছে, শান্তি-নিকেতনের নন্‌কলেজেট হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করা একটি গুজরাতি ছেলের বাসনা হয় এম. এ. বোম্বাই হইতে দিবে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন নামঞ্জুর করিলেন, কারণ সে কলিকাতার নন্-কলেজেট! কর্তাদের বুঝাইবার বিস্তর প্রয়াস করিলাম যে কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যা-পীঠের নন্-কলেজেট বহু কলেজেটের অপেক্ষা শ্রেয়, অন্ততঃ বিশ্বভারতীর কলেজ অনেক মার্কা মারা সফরীপ্রোষ্ঠী কলেজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অধ্যাপক মণ্ডলী ধারণ করে, কিন্তু অরণ্যে রোদন।

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কি অপূর্ব বিশ্বপ্রেম, সহযোগিতা !!

কোন গুণ নাই তার—

বেহারী ভাইয়ারা (সদর্থে) বাংলা ভাষা এবং বাঙ্গালীর উপর খড়্গহস্ত হয়েছেন শুনে বহু বাঙ্গালী বিচলিত হয়েছেন। বাঙ্গালীর প্রতি অন্যান্য প্রদেশের মনোভাব যদি বাঙ্গালীরা সবিস্তর জানতে পান তবে আরো বিচলিত হবেন—কিন্তু সৌভাগ্য বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন, বাংলা দেশের লোক মারাঠী-গুজরাতী ভাষা নিয়ে অত্যধিক ঘাঁটাঘাঁটি করে না বলেই ও সব ভাষায় আমাদের সম্বন্ধে কি বলা হয় না হয়, সে সম্বন্ধে কোনো খবর পায় না। তাবৎ

মারাঠী-হিন্দী-গুজরাতী আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করেন এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু উত্তর-ভারতবর্ষের সর্বত্রই যে ঈষৎ বাঙ্গালী-বিদ্বেষ বর্তমান আছে সে কথা অস্বীকার করবার যো নেই।

কিন্তু বিচলিত হওয়ারও কোনো কারণ নেই। তবে বাংলা ভাষা তথা বাঙ্গালী বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশ কেন যে ঈর্ষাপরায়ণ, সে তত্ত্বের অনুসন্ধান করলে আমরা তাদের অনেকখানি ক্ষমা করতে পারবো। ক্ষমা মহতের লক্ষণ তো বটেই, তদুপরি আমরা যখন সর্বপ্রদেশের মধ্যে প্রীতি এবং সৌহার্দ্য কামনা করি, তখন এ বিষয়ে আমাদেরই সকলের চেয়ে বেশী সচেতন হওয়া উচিত। আপন প্রদেশ সম্বন্ধে আমরাই যেমন সর্বপ্রথম গর্ব অনুভব করে 'সপ্তকোটি কণ্ঠে' উল্লাসধ্বনি করে উঠেছিলুম, ঠিক তেমনি আমরাই সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা বর্জন করে পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গের ভিতর দিয়ে ভারতভাগ্যবিধাতার রূপ দেখতে চেয়েছিলুম। আজ না হয় বাংলাদেশ সর্বজনমান্য নেতার অভাবে অনাদৃত, আজ না হয় কেন্দ্রে আমরা চক্রবর্তী নই, তাই বলে বাংলা দেশ আরো বহুকাল যে এরকম ধারা সর্বযজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে অনাদৃত থাকবে এ কথা বিশ্বাস করার চেয়ে আত্মহত্যা বহুগুণে শ্লাঘনীয়। তাই প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা দূর করার কর্তব্য আমাদেরই স্কন্ধে।

অবাঙ্গালীরা যে বাঙালীর দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকান তার প্রধান কারণ এই নয় যে বাঙালী যেখানে যায় সেখানকার হনুমানজী, রণছোড়জী (আসলে ঋণ-ছোড়জী অর্থাৎ যিনি মানুষকে সর্বপ্রকার ঋণমুক্ত করতে সাহায্য করেন) বা অম্বামাতার সেবা না করে কালীবাড়ী স্থাপনা করে কিংবা বিদ্যার্জন করবার জন্য গণপতিকে পুজো না করে সরস্বতীকে আবাহন করে—কারণ সকলেই জানেন এ বাবদে তাবৎ ভারতবাসী একই গড্ডালিকার তাঁবেতে পড়েন। খুলে বলি।

বেদের ইন্দ্র, বরুণ, যম, প্রজাপতিকে দৈনন্দিন ধর্মজীবন থেকে বাদ দিয়ে শুধু বাঙালীই যে ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে তা নয়, ভারতবর্ষের কোনোখানেই এদের জন্য আজ আর কোনো মন্দির নির্মিত হয় না। শিব আর বিষ্ণু কি করে যে এঁদের জায়গা দখল করে নিলেন সে আলোচনা উপস্থিত নিষ্প্রয়োজন—অথচ বেদে এঁদের অনুসন্ধান করতে হয় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে—এমন কি বাঙালী যেমন সামাজিক ধর্মচর্চায় মা কালীকে ডাকাডাকি করে, উত্তর-ভারতে তেমনি হনুমানজী, গুজরাতে রণছোড়জী, মহারাষ্ট্রে অম্বামাতা।

বেদনাটা সেখানে নয়। বাঙালীর পয়লা নম্বরের 'দোষ' সে মাছ-মাংস খায়। কি উত্তর, কি দক্ষিণ—সর্বত্রই ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা মাছ-মাংস খান না এবং উভয় বস্তুর খাদককে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। মহারাষ্ট্রের সারস্বত ব্রাহ্মণগণ মাছ খান (এঁদের এক শাখার নাম গৌড়ীয় সারস্বত ও

কিম্বদন্তী এই যে, তাঁরা আসলে বাঙালী), তাই সেখানকার চিৎপাবন, দেশস্থ এবং করাড় ব্রাহ্মণগণ সারস্বতদের অবজ্ঞার চোখে দেখেন—যেন মাছ খেয়ে সারস্বত ব্রাহ্মণরা হিন্দু সমাজ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছেন। এই মাছ খাওয়াটা দোষ না গুণ সে আলোচনা পণ্ডিত এবং বৈদ্যরাজ করবেন; উপস্থিত আমার বক্তব্য এই যে, মাছ-মাংস খায় বলেই বাঙালী সনাতন হিন্দুধর্মের কাছাকাছি থাকতে পেরেছে। নিরামিষে আসক্তি জৈন ধর্মের লক্ষণ—কারণ বৌদ্ধ গৃহীরা পর্যন্ত মাছ-মাংস খান এবং নিমন্ত্রিত শ্রমণও উভয় বস্তু প্রত্যাখ্যান করেন না। জৈনদের প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই ও 'হস্তীনাং তাড্যমানপি ন গচ্ছেজ্জ জৈন মন্দিরম্' উপদেশটি অবাঙালীই দিয়েছেন। রাজপুতরা মাছ-মাংস খান, তাই বোধ করি মীরাবাঈ গেয়েছেন—

ফলমূল খেলে হরি যদি মেলে
তবে হরি হরিণের।

কাজেই মাছ-মাংস খাওয়ার জন্য যদি বাঙালী অন্যান্য প্রদেশের বিরাগ-ভাজন হয় তাতে শোক করবার কিছুই নেই। তার অর্থ শুধু এই যে বাঙালী ভারতব্যাপী জৈন প্রভাবের ফলে সনাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় নি।

আমাদের দুই নম্বরের দোষ আমরা পরীক্ষা, আত্মা ইত্যাদি শব্দ সংস্কৃত কায়দায় পরীকষা, আত্মা উচ্চারণ করি না। সংস্কৃত ভাষা পড়বার সময় এ সব শব্দ কি ভাবে উচ্চারণ করতে হবে সে আলোচনা পরে হবে, উপস্থিত দ্রষ্টব্য আমরা কেন বাঙলায় এ সব শব্দ বাঙলা কায়দায় উচ্চারণ করি।

এর উত্তরে প্রথমেই বলতে হয়, হিন্দী-গুজরাতী মারাঠীরাও করেন। সাধারণ হিন্দী বলার সময় সবাই ক্ষত্রিয়কে শত্রিয় বলেন, লক্ষ্মণঝোলাকে লছমনঝোলাই বলে থাকেন। অর্থাৎ যে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে বাঙলা দেশ থেকে সংস্কৃত উচ্চারণ লোপ পায়, সেই ধ্বনি পরিবর্তন অন্যান্য প্রদেশেও ঘটেছিল—যার ফলে লক্ষ্মণ লছমন হয়ে যান। পরবর্তী যুগে দেশজ হিন্দী, বাঙলা, গুজরাতীর উপর যখন সংস্কৃত তার আধিপত্য চালাতে গেল তখন আর সব প্রদেশ সে আধিপত্য মেনে নিল, কিন্তু বাঙলা স্বীকার করল না। বাঙালী তখন সেই ধ্বনি পরিবর্তনের আইন মেনে নিয়ে সংস্কৃত শব্দও বাঙলা কায়দায় উচ্চারণ করতে লাগল। এ স্থলে বাঙালী পৃথিবীর আর সব জাত যা করেছে, তাই করল—ইংরেজ, ফরাসী অথবা জর্মন যখন তার ভাষাতে গ্রীক বা লাতিন শব্দ উচ্চারণ করে তখন সেগুলো আপন আপন ভাষার ধ্বনি-পরিবর্তন দিয়েই করে, এমন কি গোটা বাক্যও আপন কায়দায় উচ্চারণ করে (ইংরেজ এবং ভারতীয় আইনজ্ঞেরা nisi শব্দকে লাতিন নিসি উচ্চারণ না করে নাইসাই করেন, a priori কে আ প্রিয়োরি না বলে এ প্রায়োরাই বলেন)। হিন্দী গুজরাতী মারাঠী ইত্যাদি ভাষা সাধারণ শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন মেনে

নিয়েছে (এমন কি মারাঠীরা জ্ঞানেশ্বরকে দ্নানেশ্বর বলেন!) কিন্তু অপেক্ষাকৃত অচলিত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণ করে।

অর্থাৎ আমরা consistent এবং অন্যান্য প্রদেশ এ নীতিটা মানেন না।

অবাঙালীরা তাই ভাবেন আমরা সংস্কৃত উচ্চারণ 'বিকৃত' করে তার উপর 'অত্যাচার' করেছি।

কিন্তু ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, বাঙালা খুব তাড়াতাড়ি স্বাধীন হতে পেরেছে। আজ যে বাঙলা সাহিত্য হিন্দী, মারাঠী বা গুজরাতীকে ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পেরেছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি। একবার ভেবে দেখলেই হয় আমরা যদি আজও বিদ্যাসাগরী বাঙলা লিখতুম তাহলে 'মেজদিদি', 'বিন্দু', 'জ্যাঠাইমা' চরিত্র আঁকা সম্ভবপর হত কি-না? ইংরেজের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজকে প্রশ্ন করলেন, 'এই ভূতের খাজনা দেবো কিসে? উত্তরে বললেন, 'শ্মশান থেকে মশান থেকে, ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে, আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।' এ উত্তর কি বিদ্যাসাগরী বাঙলায় কখনো রূপ পেত?

ভাষা এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে আমাদের স্বাধীন হবার প্রচেষ্টা দম্ভপ্রসূত নয়, সংস্কৃতের প্রতি অবজ্ঞাজনিত নয়। ধর্ম জানেন, ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ তথা বাঙলা দেশে সংস্কৃত চর্চা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়, কিন্তু বাঙলা বাঙলা এবং সংস্কৃত সংস্কৃত। বাঙলা ভাষা যখন আপন নিজস্বতা খুঁজছিল তখন সে জানত না যে ইংরিজী ফরাসী জর্মন একদা লাতিনের দাস্যবৃত্তি থেকে মুক্তিলাভ করেই যশস্বিনী হয়েছে। বাঙলার এই প্রচেষ্টা ভগবানের দান এবং এই প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ জন্মেছিলেন বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এখনও বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন নি। প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন মহত্তর রবীন্দ্রনাথ, বিরাটতর বঙ্কিম পান; কিন্তু ততদিন যদি আমরা এঁদের নিয়ে গর্ব না করি তবে আমাদের নিমক-হারামীর অন্ত থাকবে না।

অবাঙালীরা যখন বাঙালীর প্রতি বিরক্ত হন তখন তাঁদের মুখে অনেক সময়ই শুনতে পাওয়া যায়, তোমরা বাঙালীরা আর কিছু পারো না পারো, একটা জিনিসে তোমরা যে ওস্তাদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই;—তোমাদের কেউ যদি সামান্য একটুখানি কিছু করতে পারে, তবে তাই নিয়ে তোমরা এত লাফালাফি মাতামাতি, সোজা ইংরিজীতে তাকে এত 'বুসট' করো যে অবাঙালী পর্যন্ত সেই প্রোপাগান্ডার ঠ্যালায় শেষটায় মেনে নেয় যে, যাকে

নিয়ে কথা হচ্ছে সে লোকটা সত্যি জব্বর কিছু একটা করেছে বটে। এই যেমন তোমাদের রবীন্দ্রনাথ।

বাঙালী মাত্রেই এরকম ধারা কথা শুনলে পঞ্চাশ গোনবার উপদেশটা যে নিতান্ত অর্বাচীনের ফতোয়া সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে অবাঙালীকে বেশ দু কথা শুনিয়ে দেয় এবং আমিও স্বীকার করি যে শোনবার হক তার তখন আলবৎ আছে।

আমি শোনাই না, কারণ আমি জানি অবাঙালী বেচারী পড়েছে মাত্র গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার এবং চিত্রাঙ্গদার অনুবাদ। হয়ত আরও দু একখানা পড়েছে কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি যে, ইংরিজী যার মাতৃভাষা নয় তার পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন যে এগুলোর মধ্যে এমন কি কবিত্ব, এমন কি তত্ত্ব আছে, যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি খেতাব দিয়ে উন্বাহু হয়ে নৃত্য করা যায়। ইয়েট্‌স্ সাহেব যখন গীতাঞ্জলিকে প্রশংসা করে সপ্তম স্বর্গে তোলেন তখন তার একটা অর্থ করা যায় :—রবীন্দ্রনাথের ইংরিজীতে হয়তো এমন কোনো অদ্ভুত গীতিরস লুকোনো আছে যার স্বাদ পেয়ে ইংরিজীভাষী ইয়েট্‌স্ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন কিন্তু আমার মত বাঙালী অতটা উচ্চাঙ্গ ইংরিজী জানে না এবং আর পাঁচ জন অবাঙালী যদি আমারই মত হয় তাতে আমার রাগ করার কি আছে?

সাধারণ বাঙালী যখন অবাঙালীর এই 'নীচ আক্রমণে' মার মার করে তেড়ে যায় তখন সে ধরে নিয়েছে যে অবাঙালী রবীন্দ্রনাথের উত্তম উত্তম কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েও নিছক ঢিটেমি করে বাঙালীর নিন্দে করছে। কাজেই ঝগড়াটা শুরু হয় ভুল-বোঝা নিয়ে। কিন্তু একবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেলে কাদামাটি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু চারটে পাথরও ছোঁড়া হয়, তখন মানুষ জানা অজানাতে অন্যায় কথাও বলে ফেলে। তর্কের ঝোঁকে তখন অবাঙালী আমাদের অন্যান্য মহাপুরুষও যে কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের জোরেই খ্যাতনামা হয়েছেন সে কথা বলতেও কসুর করে না।

আমি বাঙালী, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তাই কি করে বুক ঠুকে বলি বলুন যে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষের বিজ্ঞাপন দেবার প্রয়োজন আমরা কখনো অনুভব করি নি। এঁরা বাঙালীর ধর্ম জগতে গুরুর আসন গ্রহণ করে বাঙালী জাতটাকে গড়ে তুলেছেন। এ সত্যটা জানি এবং হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী, উর্দু নিয়ে চর্চা করেছি বলে এ তথ্যটাও জানি যে ভগবান বোধ হয় বাঙালীকে নিতান্ত নিষ্কর্মা জেনেই দয়া করে একমাত্র তাকেই অকৃপণ হস্তে এতগুলি ধর্মগুরু দিয়ে ফেলার পর হুঁশিয়ার হয়ে অন্য প্রদেশগুলোর উপর কঞ্জুসি চালিয়েছেন।

আজকাল অবশ্যি ধর্ম রায় বাহাদুর খেতাব নিয়ে কি বাঙলা, কি বোম্বাই, কি দিল্লী সর্বত্রই পেনসন টানছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য

বিবেকানন্দ এবং দুর শিষ্য সুভাষচন্দ্র এবং দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য রবীন্দ্রনাথ এই বাঙালীর জাতীয়তাবোধ কতখানি জাগ্রত করে দিয়ে গেছেন, সে কথা আমরাই এখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারি নি—বিজ্ঞাপন দেবে কে, বুস্‌ট্ আপ করবার গরজ কার? হা ধর্ম!

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন আমাদের অচলায়তনের অন্ধ প্রাচীরে অনেকগুলো জানলা তৈরী করে দিয়েছেন—তারি ভিতর দিয়ে আমরা পশ্চিমের জ্ঞান বিজ্ঞানের সন্ধান পেলুম। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও জনগণের সঙ্গে সে ঐতিহ্যের যোগসূত্র সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়ে গেলেন। তাই এক দিক দিয়ে আমরা যেমন বাইরের জিনিস নিতে শিখলুম অন্য দিক দিয়ে ঠিক তেমনি আপন জিনিসকে অবহেলা না করে আপন সংস্কৃতি-সভ্যতা গড়ে তুললুম।

সবচেয়ে স্বপ্রকাশ হয়েছে এই তত্ত্বটি আমাদের সাহিত্যে। মাইকেল খৃস্টান, নজরুল মুসলমান এবং প্রমথ চৌধুরীকে ফরাসী বললে কিছুমাত্র ভুল বলা হয় না। অথচ তিনজনই বাঙালী এবং তারা যে সাহিত্য গড়ে তুলেছেন সেটি বাঙলা সাহিত্য। কিন্তু এঁরাই শুধু নন, আর যে পাঁচজন বাঙালী সাহিত্য গড়ে তুলেছেন তাঁদের সকলেই জানা অজানাতে আমাদের ধর্মগুরুদের উপদেশ সাহিত্য ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের দরদী ঘরোয়া সাহিত্যের পশ্চাতে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের সরলতা, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পিছনে রয়েছে রামমোহনের বিদগ্ধ মনোবৃত্তি।

বহু আকস্মিক ঘটনা, বহু যোগাযোগের ফলে বাঙলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে। ইংরিজী তথা ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য কলার চর্চা প্রধানত হয়েছিল কলকাতা এবং মাদ্রাজে। কিন্তু তামিল ভাষাভাষীদের মধ্যে যাঁরা এসব দিকে আকৃষ্ট হলেন তাঁরা মাতৃভাষার সেবা করলেন না। ফলে তাঁরা বাঙালীর চেয়ে ভালো ইংরিজী শিখলেন বটে—যদিও সে ইংরিজী সাহিত্যে স্থান পাবার উপযুক্ত হল না—কিন্তু তামিল ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারল না। মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে লোকমান্য টিলক (কথাটা তিলক নয়) এবং স্বামী দয়ানন্দ জন্মালেন বটে কিন্তু সে সব প্রদেশে ইউরোপীয় সাহিত্য প্রচেষ্টার যথেষ্ট প্রসার হল না বলে মারাঠি, গুজরাতী সাহিত্য আজও বাঙলার অনেক পিছনে।

অজ্ঞতাপ্রসূত প্রাদেশিক বিদ্বেষ তাহলে ঘুচবে কবে? যেদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অন্য প্রদেশের ভাষা শেখবার ব্যাপক ব্যবস্থা হবে সেদিন থেকে। ইংরেজ এ ব্যবস্থা করবার কোনো প্রয়োজন বোধ করে নি—তার কারণটাও অনায়াসে বোঝা যায়—কিন্তু আমাদের বেশ ভালো করে মেনে নেওয়া উচিত, সর্বপ্রদেশের সর্বপ্রচেষ্টার সঙ্গে যদি আমাদের বহু ছাত্রছাত্রী বহু প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে সংযুক্ত না হয়, তবে অজ্ঞতাপ্রসূত এ সব বিদ্বেষ

কস্মিনকালেও যাবে না, এবং কেবল মাত্র রাষ্ট্রভাষা শিখলেই সর্ব সমস্যার সমাধান হবে না।

প্রত্যেক ছাত্রই যে বারোটা প্রাদেশিক ভাষা শিখবে এ প্রস্তাব কেউ করবে না, মানবেও না। ব্যবস্থাটা হবে এই যে, বহু ছাত্র মারাঠী, বহু ছাত্র গুজরাতী, অন্যেরা তামিল অথবা কানাড়া অথবা অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষা শিখবে, তারা ঐসব ভাষা থেকে উত্তম উত্তম পুস্তক বাঙলায় অনুবাদ করবে, ঠিক সেইরকম বাঙলা বইও নানা ভাষায় অনূদিত হবে। ফলে এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের সাহিত্য চিনতে শিখবে এবং তারপরেও যদি বিদ্বেষ থেকে যায় তবে তার জন্য অন্ততঃ আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিকে দোষ দেওয়া যাবে না॥

কালো মেয়ে

কত করুণ দৃশ্য, কত হৃদয় বিদারক ঘটনা দেখি প্রতিদিন—সত্য বলতে কি, তাই রাস্তায় বেরতে ইচ্ছে করে না—কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন, সবচেয়ে মর্মন্তুদ আমার কাছে কি লেগেছে, তবে বলবো, আমাদের পাড়ার কালো মেয়েটি।

সকালবেলা কখন বেরিয়ে যায় জানিনে। সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফেরে—আমি তখন রকে বসে চা খাচ্ছি। মাথা নিচু করে, ক্লান্ত শ্লথগতিতে আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে যায়। আজ পর্যন্ত আমাদের রকের দিকে একবারও ঘাড় তুলে তাকায় নি—আমার মনে হয়, এ জীবনে কোনোদিনই সে কোনো দিকে তাকিয়ে দেখে নি।

দেবতা ওকে দয়া করেন নি। রঙ্ কালো এবং সে কালোতে কোনো জৌলুস নেই—কেমন যেন ছাতা-ধরা-মসনে-পড়া ছাবড়া ছাবড়া। গলার হাড় দুটি বেরিয়ে গিয়ে গভীর দুটো গর্ত করেছে, গায়ের কোথাও যেন একরত্তি মাংস নেই, গাল ভাঙ্গা, হাত দুখানা শরের কাঠি, পায়ে ছেঁড়া চপ্পল, চুলে কতদিন হল তেল পড়ে নি কে জানে। আর সমস্ত মুখে যে কী বিষাদ আর ক্লান্তি তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা আমার নেই। শুধু জানি—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—দিনের পর দিন তার মুখের বিষাদ আর ক্লান্তি বেড়েই চলেছে। আরো জানি, একদিন তাকে আর দেখতে পাবো না। শুনবো, যক্ষ্মা কিম্বা অন্য কোনো শক্ত ব্যামোয় পড়েছে, কিম্বা মরে গিয়েছে।

শুনলুম, মাস্টারণীগিরি করে বিধবা মা আর ছোট ভাইকে পোষে। তার নাকি পয়সাওলা এক দাদাও আছে—সে থাকে অন্যত্র বউ নিয়ে, এদের দিকে তাকায় না।

বাপ দাদা করেছিলেন তাই আমিও ভগবানে বিশ্বাস করি গতানুগতিক-

ভাবে, কিন্তু যদি এ মেয়ের কোনদিন বর জোটে তবেই ভগবানে আমার সত্যকার বিশ্বাস হবে।

জানি, জানি, জানি, এর চেয়েও অনেক বেশী নিদারুণ জিনিস সংসারে আছে। কলকাতাতেই আছে কিন্তু আমি পাড়াগেঁয়ে ছেলে; মেয়েছেলে নিষ্ঠুর সংসারে লড়াই করে অপমান-আঘাত সহ্য করে টাকা রোজগার করে, এ জিনিস দেখে আমার অভ্যাস নেই, কখনো হবে না। গাঁয়ের মেয়েও খাটে—আমার মাও কম খাটতেন না—কিন্তু তাঁর খাটুনী তো বাড়ির ভিতরে। সেখানেও মান-অপমান দুঃখ-কষ্ট আছে স্বীকার করি,—কিন্তু এই যে পাড়ার কালো মেয়েটি সকাল হতে না হতেই নাকে-মুখে দুটি গুঁজে, এর কনুই, ওর হাঁটুর ধাক্কা খেয়ে ট্রামে-বাসে উঠবে, দুপুর বেলা কিছু খাবার জুটবে না, জুটবে হয়ত হেড মিসট্রেসের নির্মম ব্যবহার, ছাত্রীদের অবজ্ঞা অবহেলা—হয়তো তার শ্রীহীনতা নিয়ে দুএকটা হৃদয়হীন মন্তব্যও তাকে শুনতে হয়। ক্লাস শেষ হলে সে খাতা দেখতে আরম্ভ করবে, সন্ধ্যার আবছায়ায় যখন ক্ষুদে লেখা পড়বার চেষ্টায় গর্তে-ঢোকা চোখ দুটো ফেটে পড়বার উপক্রম করবে তখন উঠবে বাড়ী ফেরার জন্য। আজ হয়ত বাসের পয়সা নেই, বাড়ী ফিরতে হবে হেঁটে হেঁটে। ক মাইলের ধাক্কা আমি জানি নে।

কিন্তু জানি, আমি যে গ্রামে জন্মেছি, সেখানে এককালে সব মেয়েরই বর জুটতো। ভালো হোক, মন্দ হোক, জুটতো এবং ছোট হোক, বড় হোক, কোনো না কোনো সংসারে গিয়ে সে আশ্রয় পেত।

আজ আর সেদিন নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারের কটি ছেলে আজ পয়সা কামাতে পারে যে বিয়ে করবে? এককালে গ্রামে সকলেরই দুমুঠো অন্ন জুটতো—তা সে গতর খাটিয়ে, চাকরী করেই হোক, আর না করেই হোক—তাই শেষ পর্যন্ত শ্রীহীনা মেয়েরও বর জুটতো। আজ যে দু চারটি ছেলে পয়সা কামাবার সুযোগ পায়, তারা কনের বাজারে ঢুকে বেছে নেয় ডানাকাটা পরীদের। সাধারণ মেয়েরাও হয়ত বর পায়, শুধু শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকে আমাদের পাড়ার মাস্টারণী আর তারই মত মলিনারা।

এ সমস্যা যে শুধু আমাদের দেশেই দেখা দিয়েছে তা নয়। বেকার-সমস্যা যেখানে থাকবে সেখানেই ছেলেরা বিয়ে করতে নারাজ। মেয়েরাও বুঝতে পারে, বর পাবার সম্ভাবনা তাদের জীবনে কম, তাই তারাও কাজের জন্য তৈরী হয়—বাপ মা তো একদিন মারা যাবেন, দাদারা তকে পুষতে যাবে কেন? এই একান্ন পরিবারের দেশেই দাদারা ক্রমশ সরে পড়ছে, যে দেশে কখনো একান্ন পরিবার ছিল না সেখানে অরক্ষণীয়াকে পুষবে কে? কিন্তু আর আর দেশ আমাদের মত মারাত্মক গরীব নয় বলে টাইপিস্ট মেয়েটির পেট-ভরা অন্ন জোটে, মাস্টারণী যখন বাড়ী ফেরে তখন তার মুখে ক্লান্তি থাকলেও মাঝে মাঝে সিনেমা-থিয়েটার যাবার মত পয়সা সে কামায়ও বটে। বর জুটবে না, মা হতে পারবে

না, সে দুঃখ তার আছে; কিন্তু ইয়োরোপের মেয়ের অনেকখানি স্বাধীনতা আছে বলে প্রেমের স্বাদ সে কিছুটা পায়। নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয়; এ দেশের মেয়েরা পরিণয়বন্ধনের বাইরে প্রেমের সন্ধানে ফিরুক, এ কথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাই, পশ্চিমের অরক্ষণীয়া তবু কোনো গতিকে বেঁচে থাকার আনন্দের কিছুটা অংশ পায়—আমাদের পাড়ার মেয়েটি যে এ জীবনে কোনো প্রকার আনন্দের সন্ধান পাবে সে দুরাশা আমি স্বপ্নেও করতে পারি নে।

এ মেয়ের দুরবস্থার জন্য দায়ী কে?

আমি সোজাসুজি বলবো, আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক কর্তারা। পাঠক জানেন, এ অধম সপ্তাহের পর সপ্তাহ লিখে যাচ্ছে, কিন্তু কারো নিন্দে সে কখনো করতে যায় নি। সে চেষ্টা করেছে আপনাদের আনন্দ দিতে—তারই ফাঁকে ফাঁকে যে সপ্তাহে সে তত্ত্ব বা তথ্য পরিবেশন করবার সুযোগ পেয়েছে, সেদিন তার আনন্দের অবধি থাকে নি; এর গলদ, ওর ত্রুটি নিয়ে সে আলোচনা বা গালাগালি করে কোনো সস্তা রুচিকে সে টক ঝাল দিয়ে খুশী করতে চায় নি। কিন্তু এখন যদি না বলি যে, আমাদের কর্তারা আজ পর্যন্ত দেশের অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুই করতে পারেন নি, কোনো পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রস্তুত করতে পারেন নি, তা হলে অধর্মাচার হবে।

বেকার সমস্যা ঘোচাতে পারুন আর নাই পারুন মধ্যবিত্তকে অন্ন দিতে পারুন আর নাই পারুন, অন্তত তাঁরা যেন তরুণ-তরুণীদের মনে একটুখানি আশার সঞ্চার করে দিতে পারেন। ভালো করে ভাত না জুটলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, যদি তার মনে আশা উদ্দীপ্ত করে দেওয়া যায়।

আমাদের কালো মেয়ের কোনো ভবিষ্যৎ নেই—এ কথা ভাবতে গেলে মন বিকল হয়ে যায়—কিন্তু এদের সংখ্যা বেড়েই চলবে, এ কথা ভাবলে কর্তাদের বিরুদ্ধে সর্বদেহমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

আশাটুকুরও সঞ্চার যদি কর্তারা না করতে পারেন, তবে তাঁরা আসন ত্যাগ করে সরে পড়েন না কেন? হায়, অরক্ষণীয়ার অভিসম্পাতকেও এঁরা আর ভয় করেন না!!

ঋতালী

ইসমাইলি খোজা সম্প্রদায়ের গুরুপুত্র প্রিন্স আলী খানের সঙ্গে শ্রীমতী ঋতা (স্পেনিশ ভাষায় যখন t অক্ষরের উচ্চারণ বাংলা 'ত'য়ের মত হয় তখন r টাকে 'ঋ' বানাতে কারো বড্ড বেশী আপত্তি করা উচিত নয়) হেওয়ার্থের শাদী হয়েছে আর বিয়ের দাওয়াতে নাকি হাজার দেড়েক বোতল শ্যাম্পেন খাওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সের যে অঞ্চলে শাদীটা হয়েছে সেখানে শ্যাম্পেন মাগ্‌গী নয়। তবু যে বেশ কিছু পয়সা খরচা হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ জর্মনরা নাকি ফ্রান্স ত্যাগ করার পূর্বে প্রাণ ভরে শ্যাম্পেন খেয়ে ফ্রান্সের তাবৎ শ্যাম্পেনের গুদোম উজাড় করে দিয়ে যায়। বছর সাতেক না যাওয়া পর্যন্ত ১৯৪৫এর শ্যাম্পেন খাওয়ার মত 'পরিপক্ক' হবে না।—কাজেই আলী খান নিশ্চয়ই ৪৫এর আগেকার লুকোনো মাল গৌরীসেনী পয়সা দিয়ে কিনেছেন। তা কিনুন, তাঁর পয়সার অভাব নেই। কিন্তু প্রশ্ন, মুসলমান ধর্মে যখন মদ বারণ তখন ধর্মগুরুর বড় ব্যাটা (পরে ইনিই গুরু হবেন) এ খবরটা ছাপতে দিলেন কোন্ সাহসে?

বোম্বায়ে যখন বাস করতুম তখন আলীখানের খোজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। তখন কিছুদিন তাঁদের ইতিহাস, শাস্ত্র, আচার-ব্যবহার নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলুম। সেগুলি সত্যই বহু রহস্যে ভরা।

খোজাদের বিশ্বাস, আদমকে সৃষ্টি করার সময় আল্লা তাঁর জ্যোতির খানিকটা তাঁর শরীরে ঢেলে দেন। সে জ্যোতি আদম থেকে বংশানুক্রমে মহাপুরুষ মোসেজ (মুসা), নোয়া (নুহ), এব্রাহাম (ইব্রাহিম), সলমন (সুলেমান), ডেভিড (দায়ুদ) হয়ে হয়ে শেষটায় মহাপুরুষ মুহম্মদের পিতামহে পৌঁছোয়। তারই এক অংশ তখন বর্তে মুহম্মদে, অন্য অংশ তাঁর খুড়োর ছেলে আলীতে। আলী মুহম্মদের মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর ছেলে হুসেনের শরীরে আবার সেই দ্বিখণ্ডিত জ্যোতি সংযুক্ত হয়। তারপর সেই জ্যোতি বংশানুক্রমে চলে এসেছে প্রিন্স আলী খানের পিতা আগা খানের শরীরে। তিনি মারা গেলে আলী খান সেই জ্যোতি পাবেন।

কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে ভারতবর্ষের খোজারা আরেকটা বিশ্বাস জুড়ে দিয়েছেন। সে মত অনুসারে খোজারা বিশ্বাস করেন, বিষ্ণু নয়বার মৎস্য, কূর্ম ইত্যাদি রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন এবং দশমবারে কল্কিরূপে যে অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে, সেও খাঁটি; কিন্তু হিন্দুরা জানে না যে, কল্কি বহুদিন হল অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছেন আলীরূপে মক্কা শহরে। এবং শুধু

তাই নয়, সেই কল্কি অবতারের জ্যোতি তাঁর ছেলে হুসেনে বর্তে ক্রমে ক্রমে বংশ পরম্পরায় নেমে এসে উপস্থিত বিরাজ করছে আলীখানের পিতা আগা খানের শরীরে।

তাই হজরত আলী হলেন কল্কি অবতার এবং সেই কল্কির জ্যোতি আগা খানের শরীরে আছে বলে তিনিও কল্কি অবতার। তাই খোজা ধর্মগ্রন্থে আগা খানের সম্পূর্ণ নাম লেখা হয় 'দশবাঁ নকলঙ্কী অবতার আগা সুলতান মুহম্মদ্ শাহ্।'

কিন্তু প্রশ্ন, খোজারা এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ করল কি প্রকারে? অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, দশম একাদশ শতাব্দীতে ইরানের ইসমাইলি সম্প্রদায় আপন দল বাড়াবার জন্য চতুর্দিকে মিশনারি পাঠান। (আরো নানা সম্প্রদায় তখনকার দিনে ইরানের বন্দর-আব্বাস থেকে জাহাজে করে সমুদ্রতীরবর্তী সিন্ধু প্রদেশ আর কাঠিয়াওয়াড়ে এসে আপন আপন মতবাদ প্রচার করতেন।) এই মিশনারীদের উপর কড়া হুকুম ছিল, দল বাড়াবার জন্য কারো ধর্মমত যদি খানিকটা গ্রহণ করতে হয় তাতে কোনো আপত্তি নেই—মোদ্দা কথা হচ্ছে, সংখ্যা-বৃদ্ধি যে করেই হোক করতে হবে।

এই মিশনারিদের একজন এসে কাজ আরম্ভ করেন কাঠিয়াওয়াড় এবং কচ্ছের লোহানা রাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এঁরা ছিলেন বৈষ্ণব—কিন্তু পাঞ্চরাত্র মতবাদের। এঁরা ইসমাইলি মতবাদের দিকে কেন আকৃষ্ট হলেন তার খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু এঁরা যে এই নূতন ধর্ম গ্রহণ করার সময় বিষ্ণুর অবতারবাদটা সঙ্গে এনেছিলেন, সে কথাটা আজও খোজাদের 'জমাতখানা'তে (খোজারা অন্যান্য মুসলমানদের মসজিদে যান না, তাঁদের আপন মসজিদের নাম 'জমাতখানা' বা সম্মেলনালয়) প্রকাশ পায় তাঁদের উপাসনার সময়। সর্বপ্রথম বিষ্ণুর নয় অবতারের নাম স্মরণ করা হয় বসে বসে এবং দশম অবতার আলী এবং হিজ হাইনেস দি আগা খানের নাম আরম্ভ হতেই সবাই উঠে দাঁড়ান।

গোঁড়া খোজারা বিশ্বাস করেন, স্বর্গে ঈশ্বর নেই। তিনি শরীর ধারণ করে আছেন আগা খানরূপে।

চন্দ্র, সূর্য তাঁর আদেশে চলে, তিনিই ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে সর্ব সৃষ্টি ধ্বংস করতে পারেন, নূতন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সৃষ্টি করতে পারেন।

এরকম বিশ্বাস যে বিংশ শতাব্দী—বা অন্য যে কোনো শতাব্দীতে—কেউ করতে পারে সেটা আমার ধারণার বাইরে ছিল, কিন্তু যখন স্বকর্ণে শুনলুম, তখন আর অবিশ্বাস করি কি প্রকারে?

ভারতবর্ষের সুন্নি সম্প্রদায় খোজাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু ইরানের সুন্নিরা অনেক কিছু জানেন বলে খোজা এবং তাঁদের জনক সম্প্রদায় ইসমাইলি মতবাদকে বিধর্মী বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কোরানে যখন বিষ্ণু এবং নয় অবতারের উল্লেখ নেই, এবং যেহেতু কোরান অবতারবাদের বিরুদ্ধে

আপন বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে তখন সুন্নি মতবাদ যে খোজা সম্প্রদায়কে বিধর্মী বলবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? খোজারা অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামান না, কারণ খোজারা যদিও কোরানকে 'ভালো কেতাব' রূপে স্বীকার করেন, তবু কর্মক্ষেত্রে তাঁরা মানেন কচ্ছী এবং গুজরাতী ভাষায় লিখিত নিজস্ব 'গিনান' গ্রন্থাবলীকে। 'গিনান' শব্দ সংস্কৃত 'জ্ঞান' শব্দ থেকে বেরিয়েছে এবং এ সব গিনান লিখেছেন খোজা ধর্মগুরুরা।

খোজারা তিনবার নমাজ পড়েন, এবং রোজার মাসে মাত্র একদিন উপোস করেন। তাও বেলা বারোটা পর্যন্ত।

কিন্তু সবচেয়ে বড় তত্ত্বকথা, আগা খান এত টাকা পেলেন কোথায়? তাঁর ঠাকুর্দা তো ইরান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন গত শতকের মাঝামাঝি। এইখানেই খোজা ধর্মের গুহ্যতত্ত্ব লুক্কায়িত।

প্রতি জমাতখানাতে একটা করে প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক থাকে। প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমায় প্রত্যেক খোজা এই সিন্দুকে আপন মুনাফা (কোনো কোনো স্থলে আমদানীর) থেকে অষ্টমাংশ ফেলে দেয় এবং এই সব টাকা যায় আগা খানের তহবিলে। তা ছাড়া পালা পরবে দান বলতে যা কিছু বোঝায় সবই ফেলা হয় এই সিন্দুকে এবং বহু খোজা মরার আগে তার তাবৎ ধন সম্পত্তি গুরু আগা খানের নামে উইল করে দিয়ে যায়। খোজা সম্প্রদায়ের কারবার-ব্যবসা জগৎজোড়া—শাঙ্গাই থেকে জিব্রালটর পর্যন্ত। কাজেই আগা খানের মাসিক আয় কত তার হিসেব নাকি স্বয়ং আগা খান ছাড়া কেউ জানে না।

তা জেনে আমাদের দরকারও নেই। এবং আমি জানি, এত সব তত্ত্বকথা শোনার পরও পাঠক শুধাবেন, কিন্তু যে শ্যাম্পেন নিয়ে আরম্ভ করেছিলে তার তো কোনো হিল্যে হল না। মদ যখন বারণ তখন আলী খান শ্যাম্পেন খান কি প্রকারে? তবে কি শ্যাম্পেন মদ নয়?

বিলক্ষণ! শ্যাম্পেনে আছে শতকরা প্রায় পনরো অংশ মাদকদ্রব্য বা এলকহল। এবং যেহেতুক শ্যাম্পেন খুললেই সোডার মত বুজ বুজ করে, তাই তাতে আছে ছোট ছোট বুদ্বুদ। সেগুলো পেটে গিয়ে খোঁচা দেয় বলে নেশা হয় চট করে এবং স্টিল ওয়াইন বা শান্ত মদের তুলনায় অনেক বেশী। তবে?

খোজারা বলেন, 'আলী খান একদিন স্বয়ং কল্কি অবতারের জ্যোতিঃ পাবেন বলে তিনি এখন থেকেই পূত পবিত্র। কোনো বস্তু তাঁকে অপবিত্র করতে পারে না। তাই অপবিত্র মদ তাঁর হস্তস্পর্শ লাভ করা মাত্রই পবিত্র হয়ে যায়।'

এতক্ষণ যা নিবেদন করলুম, সেগুলো দলিল দস্তাবেজ অর্থাৎ খোজাদের শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রমাণ করা যায়, কিন্তু এবারে যেটি বলব সেটি আমার শোনা গল্প—এক নাস্তিক খোজার কাছ থেকে।

একদিন নাকি খানা খেতে খেতে পঞ্চম জর্জ আগা খানকে জিজ্ঞেস করেন, 'এ কথা কি সত্যি, ইয়োর হাইনেস, যে, আপনার চেলারা আপনাকে পুজো করে?'

আগা খান নাকি উত্তরে বলেছিলেন, 'তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে, ইয়োর ম্যাজেস্টি? মানুষ কি গোরুকেও পুজো করে না?'

উত্তরটার দর আমি আর যাচাই করলুম না॥

রবীন্দ্র-সংগীত ও ইয়োরোপীয় সুরধারা

প্রায়ই প্রশ্ন শুনতে পাওয়া যায়, ইয়োরোপ রবীন্দ্রনাথকে কতখানি চিনতে পেরেছিল, আর আজ যে ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের নাম কেউ বড় একটা করে না তার কারণ কি?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সে প্রশ্ন স্বগতঃ—আমরা, অর্থাৎ বাঙালীরাই, রবীন্দ্রনাথকে কতখানি চিনি? রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা, নাট্যনির্মাণক্ষমতা, দার্শনিক চিন্তাশক্তি, সার্বভৌমিক ধর্মানুভূতি, ঔপন্যাসিক অন্তদৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, ঐতিহ্যগত শিক্ষাদান প্রচেষ্টা, বৈয়াকারণিক অনুসন্ধিৎসা—সব কিছু মিলিয়ে তাঁর অখণ্ডরূপ হৃদয় মনে আঁকার কথা দূরে থাক, যেখানে তিনি ভারতের তথা পৃথিবীর সব কবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন তারই সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়েছেন ক'জন বাঙালী?

কবিতার কথাই ধরা যাক। সেখানে দেখি কেউ কেউ 'কল্পনা' ছাড়িয়ে কবির সঙ্গে কল্পলোকে হংস 'বলাকার' পাখা মেলতে নারাজ, কেউবা 'মহুয়া'তে পৌঁছে বঁধুকে 'মহুয়া' নাম ধরে ডেকেই সন্তুষ্ট, আর 'রোগশয্যায়' কবিকে সঙ্গ দিতে রাজী অতি অল্প দুঃসাহসী রসজ্ঞ। কাউকে দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; আমি নিজে গুরুদেবের গদ্য কবিতার রস পাই না। কাজেই আমরা সকলেই পরমানন্দে অন্ধের হস্তীদর্শন করছি—কিন্তু আমাদের চরম সান্ত্বনা, এ সংসারের অধিকাংশ অন্ধ আপন আপন যষ্টি ত্যাগ করে বৃহত্তর লোকের ক্ষীণতম আভাস পাওয়ার জন্য অঙ্গুষ্ঠে পরিমাণ উদগ্রীব নয়।

এ-কথাও বলা বৃথা যে রবীন্দ্র-কাব্যের সম্পূর্ণ রস পাই আর না-ই পাই, তার কাব্যজগতের মূল সুরটি আমরা ধরতে পেরেছি। মনে পড়ছে বিশ্বভারতীর সাহিত্যসভায় এক তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসের কাব্যে প্রধান দুটি মিল দেখিয়ে একখানা সরেস প্রবন্ধ পড়েছিলেন—বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস উভয়েই বর্ষার ও প্রেমের কবি। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হলে সভাপতি রূপে কবিগুরু লেখাটির প্রচুর প্রশংসা করে বলেন যে, 'যদিও মিল দুটি স্বীকার্য তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন, এই দুই বস্তু বাদ দিয়ে ভারতীয় কোন কবি

কি লিখতে পারতেন?' রবীন্দ্রনাথ সালঙ্কার আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন,—এতদিন পরে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে তার প্রতিবেদন দেওয়া আমার পক্ষে 'সাহিত্যিক সাধুতার' পরিচায়ক হবে না, তবে ভাবখানা অনেকটা এই ছিল যে রাফায়েল মাদোন্না এঁকেছেন, অজন্তাকারও মাতাপুত্র এঁকেছেন কিন্তু দুজনের ভিতর সত্যিকার মিল কতদূর?

অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যের মূলসুর যদি এই শ্রেণীরই হয় তবে তার কোনো মূল্য নেই।

(এস্থলে অবান্তর হলেও একটি কথা না বললে হয়ত প্রবন্ধ লেখকের প্রতি অন্যায় করা হবে। যদিও রবীন্দ্রনাথের মতে প্রবন্ধটি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু সপ্রমাণ করে ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছিল তবু সভাস্থ আর পাঁচজন সে মত পোষণ করেন নি, এবং বিশ্বভারতীর যে কোনো ছাত্র এ রকম প্রবন্ধ লিখতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন)।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার মহত্তম এবং মধুরতম বিকাশ তাঁর গানে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলতেন যে তিনি তাঁর গানে প্রকৃতিকেও হারাতে পেরেছেন এবং সে গর্বটুকু একটি গানে অতি অল্প কথায় প্রকাশ করেছেন :

আজ এনে দিলে, হয়ত দিবেনা কাল—
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।
এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী
বহি তব সম্মান॥

শুধু কদম ফুল! প্রকৃতির কত নগণ্য সৌন্দর্য বস্তু, মানুষের কত উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুদ্র দুঃখ-দৈন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত স্পর্শমণির স্পর্শে হেমকান্ত সফল পরিপূর্ণতায় অজরামর হয়ে গিয়েছে, এবং ভবিষ্যতে,—ক্যাথলিকদের ভাষায় বলি,—ক্যাননাইজড হয়ে যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালীর স্পর্শকাতর হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি আকর্ষণ করবে।

অথচ আজকের দিনে এ-কথাও সত্য যে অল্প বাঙ্গালীই রবীন্দ্রনাথের আড়াই হাজার গানের আড়াইশ গান শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

তবে কি আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বে প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাইনি? সেকথাও সত্য নয়। আমরা এতক্ষণ বাঙ্গালী যুধিষ্ঠিরকে শুধু তাঁর নরক দর্শন করাচ্ছিলুম এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলুম যে বাঙ্গালীর পক্ষেও যদি রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণরূপে চেনা এত কঠিন হয় তবে অবাঙ্গালীর পক্ষে, বিশেষতঃ সাহেবের পক্ষে—তা তিনি ইংরেজই হোন আর জর্মনই হোন—সম্পূর্ণ অসম্ভব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়োরোপ যান তখন তিনি বিশেষ করে জর্মনিতে রাজাধিরাজের সম্মান পান। সে সম্মানের কাহিনী বিশ্বভারতী লাইব্রেরীতে নানা ভাষায় সযত্নে রক্ষিত আছে।

তারপর রবীন্দ্রনাথ আবার জর্মনি যান ১৯৩০ সালে। মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ততম গৃহে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কি এক জয়ন্তী উপলক্ষে সমস্ত জর্মনির বিদ্বজ্জন তখন মারবুর্গে সমবেত; তাঁরা সকলেই সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরিজিতে ধর্ম সম্বন্ধে একটি রচনা পাঠ করেন। অধ্যাপক অটো সে বক্তৃতার জর্মন অনুবাদ করেন।

শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রচনা পাঠ শুনেছিল এবং পাঠ শেষ হলে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধ্বনি উঠেছিল, তার তুলনা দেবার মত ভাষা আমার নেই।

সেদিন বিকালবেলা মারবুর্গের পুস্তকবিক্রেতাদের দোকানে গিয়ে অনুসন্ধান করলুম, রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ পুস্তকের জর্মন অনুবাদ পাওয়া যায়। নির্ঘণ্ট শুনে আশ্চর্য হলুম—গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার, চিত্রা, ডাকঘর, সাধনা এবং নেশনালিজম! মাত্র এই কখানি বই নিয়ে আর ইংরিজি ভাষায় একটি বক্তৃতা শুনে জর্মনরা এত মুগ্ধ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং এখনো আছে যে, ইংরিজি বা জর্মনে এই কখানা বই পড়ে রবীন্দ্রনাথের আসল মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

তখনই আমার বিশ্বাস হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে জর্মনির এই উচ্ছ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হবে না। গীতাঞ্জলীর ধর্মসঙ্গীত জর্মন মনকে চমক লাগাতে পারে, গার্ডেনারের প্রেমের কবিতাও যাদু বানাতে পারে, সাধনার রচনাও বিদ্যুৎ-শিখার মত ঝলকাতে পারে কিন্তু এসব দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতর এবং শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির অনুবাদ অপরিহার্য।

কিন্তু কোনো ব্যাপক অনুবাদ কার্য কেউ হাতে তুলে নেন নি। তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে অনেক গবেষণার প্রয়োজন। উপস্থিত শুধু সবচেয়ে বড় দুঃখটা নিবেদন করি।

রবীন্দ্রনাথের গানের মত হুবহু গান জর্মনে আছে এবং সেগুলি জর্মনদের বড় প্রিয়। এগুলোকে 'লীডার' বলা হয় এবং শুধু লীডার গাইবার জন্য বহু জর্মন গায়ক প্রতি বৎসর প্যারিস, লণ্ডন যান। এসব লীডারের কোনো কোনো গানের কথা দিয়েছেন গ্যোটের মত কবি, আর সুর দিয়েছেন বেটোফেনের মত সঙ্গীতকার।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের গানে গ্যোটে বেটোফেনের সমন্বয়। একাধারে এই দুই সৃজন পন্থার সম্মেলন হয়েছিল বলে রবীন্দ্র-সঙ্গীত জর্মন লীডারের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অনুভূতির সূক্ষ্মতা, কল্পনার প্রসার, এবং বিশেষ করে সুর ও কথার অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত অর্ধনারীশ্বর পৃথিবীর কোনো

গান বা 'লীডার' জাতীয় সৃষ্টিতে আজ পর্যন্ত অবতীর্ণ হন নি—রবীন্দ্র সংগীতের যে রকম হয়েছে।

বাঙালীকে বাদ দিলে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রকৃত মূল্য একমাত্র জর্মনিই ঠিক বুঝতে পারবে।

কোনো ব্যাপক অনুবাদ তো হলই না, এমন কি রবীন্দ্রনাথের গানও জর্মন কণ্ঠে গীত হল না।

কাজেই 'সাত দিনের ভানুমতী' আট দিনের দিন কেটে গেল। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে দিন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মত অনুবাদক কবি ইয়োরোপে জন্মাবেন সে দিন ইয়োরোপ,

'চিনে নেবে চিনে নেবে তারে।'॥

শ্রমণ রিয়োকোয়ান

বাস্তুবাড়ী আমূল ভস্মীভূত হওয়ার পরমুহূর্তেই ক্ষতির পরিমাণটা ঠিক কতদূর হয়েছে অনুমান করা যায় না। যেমন যেমন দিন যায়, এটা ওটা সেটার প্রয়োজন হয় তখন গৃহস্থ আস্তে আস্তে বুঝতে পারে তার ক্ষতিটা কত দিক্ দিয়ে তাকে পঙ্গু করে দিয়ে গিয়েছে।

ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে। আগুন নিবেছে বলে উপস্থিত আমরা সকলেই ভারী খুশী কিন্তু ক্ষতির খতিয়ান নেবার সময়ও আসন্ন। যত শীঘ্র আমরা এ-কাজটা আরম্ভ করি ততই মঙ্গল।

ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অহরহ সচেতন হচ্ছি কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যলোকে আমাদের যে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন এখনো আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি। অথচ নূতন করে সব কিছু গড়তে হলে যে আত্মবিশ্বাস, আত্মাভিমানের প্রয়োজন হয় তার মূল উৎস সংস্কৃতি এবং বৈদগ্ধ্যলোকে। হটেন্‌টট্‌দের মত রাষ্ট্রস্থাপনা করাই যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে আমাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির কোনো প্রকার অনুসন্ধান করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি আর পাঁচটা সর্বাঙ্গসুন্দর রাষ্ট্রের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবার বাসনা আমাদের মনে থাকে তবে সে প্রচেষ্টা 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।'

আত্মাভিমান জাগ্রত করার অন্যতম প্রধান পন্থা, জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে সে-ও এক দিন উত্তমর্ণ ছিল, ব্যাপক অর্থে সে-ও মহাজনরূপে বহু দেশে সুপরিচিত ছিল।

কোন্ দেশ কার কাছে কতটা ঋণী, সে তথ্যানুসন্ধান বড় বড় জাল পেতে আরম্ভ হয় গত শতাব্দীতে। ভৌগোলিক অন্তরায় যেমন যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে লঙ্ঘন করা সহজ হতে লাগল, একের অন্যের ইতিহাস পড়বার সুযোগও তেমনি বাড়তে লাগল। কিন্তু সে-সময়ে আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, ইংরেজের সম্মোহনমন্ত্রের অচৈতন্য অবস্থায় তখন সে যা বলেছে আমরা তাই বলেছি, সে যা করতে বলেছে তাই করেছি।

আমাদের কাছে কে কে ঋণী সে-কথা বলার প্রয়োজন ইংরেজ অনুভব করেনি, আমরা যে তার কাছে কত দিক দিয়ে ঋণী সে কথাটাই সে আমাদের কানের কাছে অহরহ ঢ্যাঁটরা পিটিয়ে শুনিয়েছে। কিন্তু ইংরেজ ছাড়া আরো দু'-চারটে জাত পৃথিবীতে আছে, এবং ইংরেজই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভুবনবরেণ্য মহাজন জাতি এ-কথা স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত নয়, এমন কি ইংরেজ যার উপর রাজত্ব করেছে সে যে এক দিন বহু দিক দিয়ে ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশী সভ্য ছিল সে-কথাটা প্রচার করতেও তাদের বাধে না। বিশেষ করে ফরাসী এবং জর্মন এই কর্মটি পরমানন্দে করে থাকে। কোনো নিরপেক্ষ ইংরেজ পণ্ডিত কখনো জন্মাননি, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অনুভূতির সঙ্গে দরদ দিয়ে ভারতবাসীকে 'তোমরা ছোট জাত নও' এ-কথাটি বলতে ইংরেজের চিরকালই বেধেছে।

তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে যদিও আমরা খবর পেলুম যে চীন ও জাপানের বহু লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধধর্ম চীন ও জাপানের আত্মবিকাশে বহু দিক দিয়ে যুগ-যুগ ধরে সাহায্য করেছে, তবু সেই জ্ঞানের ভিতর দিয়ে আমরা এঁদের সঙ্গে নূতন কোনো যোগসূত্র স্থাপনা করতে পারলুম না। এখন সময় এসেছে, চীন ও জাপান যে-রকম এ-দেশে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে অধিকতর সংখ্যায় আসবে ঠিক তেমনি আমাদেরও খবর নিতে হবে চীন এবং জাপানের উর্বর ভূমিতে আমাদের বোধিবৃক্ষ পাপী-তাপীকে কি পরিমাণ ছায়া দান করেছে।

এবং এ-কথাও ভুললে চলবে না যে প্রাচ্যলোকে যে তিনটি ভূখণ্ড কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে যশ অর্জন করেছে তারা চীন, ভারতবর্ষ ও আরবভূমি। এবং শুধু যে ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষ আরব ও চীন ভূখণ্ডের ঠিক মাঝখানে তা নয়, সংস্কৃতি সভ্যতার দিক্ থেকেও আমরা এই দুই ভূখণ্ডের সঙ্গমস্থলে আছি। এক দিকে মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতা এ-দেশে এসে আমাদের শিল্প-কলাকে সমৃদ্ধ করেছে, আবার আমাদের বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে আমরা চীন-জাপানের সঙ্গে সংযুক্ত। কাজেই ভারতবাসীর পক্ষে আর্য হয়েও এক দিক যেমন সেমিতি (আরব) জগতের সঙ্গে তার ভাবের আদানপ্রদান চলে, তেমনি চীন-জাপানের (মঙ্গোল) শিল্পকলা চিন্তাধারার সঙ্গেও সে যুক্ত হতে পারে। অথচ চীন আরব একে অন্যকে চেনে না।

তাই পূর্ব-ভূখণ্ডে যে নবজীবন সঞ্চারের সূচনা দেখা যাচ্ছে, তার কেন্দ্রস্থল গ্রহণ করবে ভারতবর্ষ। (ব্যবসা-বাণিজ্যের দৃষ্টিবিন্দু থেকে আমাদের লক্ষ-পতিরা এ তথ্যটি বেশ কিছু দিন হল হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছেন—জাপান হাট থেকে সরে যেতেই অহমদাবাদ ডাইনে পারস্য-আরব বাঁয়ে জাভা-সুমাত্রাতে কাপড় পাঠাতে আরম্ভ করেছে)। ভৌগোলিক ও কৃষ্টিজাত উভয় সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ যদি আপন আসন গ্রহণ না করে তবে দোষ ভগবানের নয়।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মৌলভী-মৌলানারা আরবী-ফারসী জানেন। এঁরা এত দিন সুযোগ পাননি—এখন আশা করতে পারি, আমাদের ইতিহাস লিখনের সময় তাঁরা 'আরবকে ভারতের দান' অধ্যায়টি লিখে দেবেন ও যে-স্থপতিকলা মোগল নামে পরিচিত তার মধ্যে ভারতীয় ও ইরান-তুর্কী কিরূপে মিশ্রিত হয়েছে সে বিবরণও লিপিবদ্ধ করবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা চীন এবং জাপানের ভাষা জানি নে। [বিশ্বভারতীর 'চীনা-ভবনের' দ্বার ভালো করে খুলতে হবে, এবং এই চীনা-ভবনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে চীনা সভ্যতার অধ্যয়ন আলোচনা আরম্ভ করতে হবে।]

জাপান সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল এতই কম যে জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। [তাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বীরভদ্র রাও চিত্র যখন তাঁর 'শিল্পী' কাগজে জাপানে সংগৃহীত ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন প্রকাশ করেন তখন অল্প পাঠকই সেগুলো পড়েন। বিশ্বভারতীর আরেক প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ হরিহরণ সাত বৎসর জাপানে থেকে অতি উত্তম জাপানী ভাষা শিখে এসেছেন। সে-ভাষা শেখাবার জন্য তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই—তাঁর স্ত্রীও জাপানী মহিলা—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বিদ্যার্থী তাঁর কাছে উপস্থিত হয়নি।]

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ-লেখক জাপানী ভাষা জানে না। কিন্তু তার বিশ্বাস, জাপান সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কৌতূহল জাগাবার জন্য ইংরিজি এবং অন্যান্য ভাষায় লেখা বই দিয়ে যতটা সম্ভবপর ততটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া উচিত। জাপানী ছাড়া অন্য ভাষা থেকে সংগৃহীত প্রবন্ধে ভুল থাকার সম্ভাবনা প্রচুর, তাই প্রবন্ধ-লেখক গোড়ার থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে।

ভারতবর্ষীয় যে-সংস্কৃতি চীন এবং জাপানে প্রসার লাভ করেছে সে-সংস্কৃতি প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষীয় তথা চৈনিক বৌদ্ধধর্ম ও জাপানী বৌদ্ধধর্ম এক জিনিস নয়—তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের এক প্রধান নীতি এই যে, প্রত্যেক ধর্মই প্রসার এবং বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বাতাবরণের ভিতর নূতন নূতন রূপ ধারণ করে। জেরুজালেমের খৃস্টধর্ম ও প্যারিসের খৃস্টধর্ম এক জিনিস নয়, মিশরী মুসলিম ও বাঙ্গালী মুসলিমে প্রচুর পার্থক্য।

জাপানে যে-বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছে সে-ধর্মও দুই দিক থেকে চর্চা করতে হবে। প্রথমতঃ, জাপানীতে অনূদিত ও লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ,— এ কর্ম করবেন পণ্ডিতেরা, এবং এঁদের কাজ প্রধানতঃ গবেষণামূলক হবে বলে এর ভিতর সাহিত্য-রস থাকার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়তঃ, জাপানী শ্রমণ-সাধু-সন্তদের জীবনী-পাঠ। আমার বিশ্বাস, উপযুক্ত লেখকের হাতে পড়লে সে-সব জীবনী নিয়ে বাঙলায় উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে।

অধ্যাপক য়াকব ফিশারের লেখা বৌদ্ধ শ্রমণ রিয়োকোয়ানের জীবনী পড়ে আমার এ-বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। অধ্যাপক ফিশার জাতে জর্মন, রিয়োকোয়ান জাপানী ছিলেন,—কিন্তু শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বইখানি লেখা হয়েছে বলে সার্থক সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে। পুস্তকখানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার সামান্য কিছু কাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে এ-দেশে প্রচার এবং প্রসার লাভ করতে পারেনি। বইখানি ইংরিজিতে লেখা, নাম Dew-drops on a Lotus Leaf. আর কিছু না হোক নামটি আমাদের কাছে অচেনা নয়, 'নলিনীদলগতজলমতিতরলং' বাক্যটি আমাদের মোহাবস্থায়ও আমরা ভুলতে পারিনি। শঙ্করাচার্য যখন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' আখ্যায় নিন্দিত হয়েছেন তখন হয়ত জীবনকে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় দেখার উপমাটাও তিনি বৌদ্ধধর্ম থেকে নিয়েছেন।

বহু মানবের হিয়ার পরশ পেয়ে
বহু মানবের মাঝখানে বেঁধে ঘর
—খাটে, খেলে যারা মধুর স্বপ্ন দেখে—
থাকিতে আমার নেই তো অরুচি কোনো।
তবুও এ-কথা স্বীকার করিব আমি,
উপত্যকার নির্জনতার মাঝে
—শীতল শান্তি অসীম ছন্দে ভরা—
সেইখানে মম জীবন আনন্দঘন॥

শ্রমণ রিয়োকোয়ানের এই ক্ষুদ্র কবিতাটি দিয়ে অধ্যাপক ফিশার তাঁর রিয়োকোয়ান-চরিতের অবতরণিকা আরম্ভ করেছেন।

ফিশার বলেন : রিয়োকোয়ানের আমলের বড় জাগীরদার মাকিনো তাঁর চরিত্রের খ্যাতি শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে শ্রমণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। তাঁর বাসনা হয়েছিল, শ্রমণের কাছ থেকে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করবেন।

মাকিনোর দূত রিয়োকোয়ানের কুঁড়ে-ঘরে পৌঁছবার পূর্বেই গ্রামের লোক খবর পেয়ে গিয়েছিল যে স্বয়ং মাকিনো রিয়োকোয়ানের কাছে দূত পাঠাচ্ছেন। খবর শুনে সবাই অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর কুটীরের চার দিকের জমি বাগান সব কিছু পরিষ্কার করে দিল।

রিয়োকোয়ান ভিনগাঁয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন কুটিরের চতুর্দিক সম্পূর্ণ সাফ। মাকিনোর দূত তখনো এসে পৌঁছয়নি। রিয়োকোয়ানের দুই চোখ জলে ভরে গেল, বললেন, "হায়, হায়, এরা সব কি কাণ্ডটাই না করেছে। আমার সব চেয়ে আত্মীয় বন্ধু ছিল ঝিঁঝিঁ পোকার দল। এই নির্জনতায় তারাই আমাকে গান শোনাত। তাদের বাসা ভেঙে ফেলা হয়েছে, হায়, তাদের মিষ্টি গান আমি আবার শুনব কবে, কে জানে?"

রিয়োকোয়ান বিলাপ করছেন, এমন সময় দূত এসে নিমন্ত্রণপত্র নিবেদন করল।

শোকাতুর শ্রমণ উত্তর না দিয়ে একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখে দূতকে দিলেন,

আমার ক্ষুদ্র কুটীরের চারি পাশে,
বেঁধেছিল বাসা ঝরা পাতা দলে দলে—
নৃত্যচটুল, নিত্য দিনের আমার নর্ম-সখা
কোথা গেল সব? আমার আতুর হিয়া
সান্ত্বনা নাহি মানে।
হায় বলো মোর কি হবে উপায় এবে
জ্বলে গিয়ে তারা করিত যে মোর সেবা,
এখন করিবে কেবা?

ফিশার বলেন, দূত বুঝতে পারল নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

আমরা বলি, তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? আমাদের কবি, জাপানের কবি এবং ঝরা পাতার স্থান তো জাগীরদারের প্রাসাদকাননে হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন :

'ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে।' *

ফিশার বলেন, এই জাপানী শ্রমণ, কবি, দার্শনিক এবং খুশখৎকে† তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান।

রিয়োকোয়ান বহু বৎসর ধরে জাপানের কাব্যরসিক এবং তত্ত্বান্বেষিগণের মধ্যে সুপরিচিত, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়ায় মাত্র বৎসর ত্রিশ পূর্বে। যে-প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রব্রজ্যাভূমিতে তিনি কিংবদন্তীর ভিতর দিয়ে এখনো জীবিত আছেন। ফিশারের গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখতে গিয়ে রাজবৈদ্য তাৎসুকিচি ইরিসওয়া বলেন, "আমার পিতামহী

---

* শেলির 'What if my leaves are falling' ভিন্ন অনুভূতিজাত, ঈষৎ দম্ভ প্রসূত।

† Calligrapher=সুদর্শন লিপিকর।

মারা যান ১৮৮৭ সনে। তিনি যৌবনে রিয়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আমাকে বলেছেন।”

রিয়োকোয়ানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮১১ সনে প্রকাশিত এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায়। স্বয়ং হকুওসাই সে পুস্তকের জন্য ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। তার প্রায় পঁচিশ বৎসর পর রিয়োকোয়ানের প্রিয়া শিষ্যা ভিক্ষুণী তাইশিন রিয়োকোয়ানের কবিতা থেকে ‘পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু’ নাম দিয়ে একটি চয়নিকা প্রকাশ করেন। রিয়োকোয়ানকে কবি হিসাবে বিখ্যাত করার জন্য ভিক্ষুণী তাইশিন এ চয়নিকা প্রকাশ করেননি। তিনিই তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চেনবার সুযোগ পেয়েছিলেন সব চেয়ে বেশী—আর যে পাঁচ জন তাঁকে চিনতেন, তাঁদের ধারণা ছিল তিনি কেমন যেন একটু বেখাপ্পা, খামখেয়ালি ধরণের লোক, যদিও শ্রমণ হিসাবে তিনি অনিন্দ্যনীয়। এমন কি রিয়োকোয়ানের বিশিষ্ট ভক্তেরাও তাঁকে ঠিক চিনতে পারেননি। তাঁদের কাছেও তিনি অজ্ঞেয়, অমর্ত্য সাধক হয়ে চিরকাল প্রহেলিকা রূপ নিয়ে দেখা দিতেন। একমাত্র ভিক্ষুণী তাইশিনই রিয়োকোয়ানের হৃদয়ের সত্য পরিচয় পেয়েছিলেন; চয়নিকা প্রকাশ করার সময় তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সর্বসাধারণ যেন তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর মহানুভব হৃদয়ের পরিচয় পায়।

এ-মানুষটিকে চেনা কারো পক্ষেই খুব সহজ ছিল না। তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়েছিলেন কবিতা লিখে, ফুল কুড়িয়ে আর ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের রাস্তার উপর খেলাধুলো করে। তাতেই নাকি পেতেন তিনি সব চেয়ে বেশী আনন্দ। খেলার সাথী না পেলে তিনি মাঠে, বনের ভিতর আপন মনে খেলে যেতেন। ছোট-ছোট পাখী তখন তাঁর শরীরের উপর এসে বসলে তিনি ভারী খুশী হয়ে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন। যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তেন, মদ পেলে খেতে কসুর করতেন না, আর নাচের দলের সঙ্গে দেখা হলে সমস্ত বিকেল-সন্ধ্যা তাদেরি সঙ্গে ফুর্তি করে কাটিয়ে দিতেন।

বসন্ত-প্রাতে বাহিরিনু ঘর হতে
ভিক্ষার লাগি চলেছি ভাণ্ড ধরে—
হেরি মাঠ-ভরা নাচে ফুলদল
নাচে পথ-ঘাট ভরে।
দাঁড়াইনু আমি এক লহমার তরে
কথা কিছু ক’ব বলে
ও মা, এ কি দেখি! সমস্ত দিন
কি করে যে গেছে চলে!

এই আপন-ভোলা লোকটির সঙ্গে যখন আর আর সংসার-বিমুখ শ্রমণদের তুলনা করা যায় তখনই ধরা পড়ে শ্রমণ-নিন্দিত প্রকৃতির সঙ্গে এঁর কবিজন-

সুলভ গভীর আত্মীয়তা-বোধ। এই 'সর্বং শূন্যং সর্বং ক্ষণিকং' জগতের প্রবাহমান ঘটনাবলীকে তিনি আর পাঁচ জন শ্রমণের মত বৈরাগ্য ও বিরক্তির সঙ্গে অবহেলা করছেন না, আবার সৌন্দর্য-বিলাসী কবিদের মত চাঁদের আলো আর মেঘের মায়াকেও আঁকড়ে ধরতে অযথা শোকাতুর হচ্ছেন না। বেদনা-বোধ যে রিয়োকোয়ানের ছিল না তা নয়—তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে ধরা পড়ে তাঁর স্পর্শকাতর হৃদয় কত অল্পতেই সাড়া দিচ্ছে—কিন্তু সমস্ত কবিতার ভিতর দিয়ে তাঁর এমন একটি সংহত ধ্যানদৃষ্টি দেখতে পাই যার মূল নিশ্চয়ই বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের অন্তস্তল থেকে আপন প্রাণশক্তি সঞ্চয় করছে।

অথচ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বলে গিয়েছেন, তিনি কখনো কাউকে আপন ধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য চেষ্টা করেননি, অন্যান্য শ্রমণের মত বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেননি।

তাই এই লোকটিকে বুঝতে জাপানেরও সময় লেগেছে। ফিশার বলেন, ১৯১৮ সনে শ্রীযুত সোমা গায়োফু কর্তৃক 'তাইগু রিয়োকোয়ান' পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র জাপানে এই শ্রমণের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

আজ তাঁর খ্যাতি শুধু আপন প্রদেশে, আপন প্রব্রজ্যাভূমিতে সীমাবদ্ধ নয়। জাপানের সর্বত্রই তাঁর জীবন, ধর্মমত, কাব্য এবং চিন্তাধারা জানবার জন্য বিপুল আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

সেই উত্তেজনা, সেই আগ্রহ বিদেশী শিক্ষক য়াকব ফিশারকেও স্পর্শ করেছে। দীর্ঘ আড়াই বৎসর একাগ্র তপস্যার ফলে তিনি যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার কল্যাণে আমরাও রিয়োকোয়ানের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। উপরে উল্লিখিত রিয়োকোয়ানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত সোমা গায়োফু ফিশারের গ্রন্থকে সপ্রেম আশীর্বাদ করেছেন, এবং এ-কথাও বলেছেন যে ফিশারই একমাত্র ইয়োরোপীয় যিনি শ্রমণ রিয়োকোয়ানের মর্মস্থলে পৌঁছতে পেরেছেন।

জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রপারের এক গ্রামে ১৭৫৮ সালে রিয়োকোয়ানের জন্ম হয়। রিয়োকোয়ান-বংশ সে অঞ্চলে আভিজাত্য ও প্রতিপত্তির জন্য সুপরিচিত ছিল। রিয়োকোয়ানের পিতা গ্রামের প্রধান বা অগ্রণীরূপে প্রচুর সম্মান পেতেন।

রিয়োকোয়ানকে বুঝতে হলে তাঁর পিতার জীবনের কিছুটা জানতে হয়। তিনিও কবি ছিলেন এবং তাঁর কবিতাতেও এমন একটি দ্বন্দ্ব সব সময়ই প্রকাশ পায় যে দ্বন্দ্বের অবসান কোন কবিই এ জীবনে পাননি। সাধারণ কবি এ-রকম অবস্থায় কাব্য-জীবন ও ব্যবহারিক জীবনকে পৃথক্ করে নিয়ে পাঁচ জনের সঙ্গে যত দূর সম্ভব মিলে-মিশে চলবার চেষ্টা করেন, কিন্তু রিয়োকোয়ানের

পিতার দ্বন্দ্ব-মুক্তি প্রয়াস এতই নিরঙ্কুশ ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল যে তিনি শেষ পর্যন্ত কোনো সমাধান না পেয়ে আত্মহত্যা করেন।

রিয়োকোয়ানের অন্যান্য ভাই-বোনরাও কবিতা রচনা করে জাপানে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের জীবনও সমাজের আর পাঁচ জনের জীবনের মত গতানুগতিক ধারায় চলতে পারেনি। রিয়োকোয়ানের ছোট দুই ভাইও এক বোন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

ধন-সম্পত্তি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সব কিছুই ছিল, রাজধানীতে রিয়োকোয়ানের পিতা সুপরিচিত ছিলেন, বসত-গ্রামের অধিবাসীরা রিয়োকোয়ান-পরিবারকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত, তৎসত্ত্বেও কেন পরিবারের পিতা আত্মহত্যা করলেন, তিন পুত্র এক কন্যা চীরবস্ত্র গ্রহণ করলেন এ রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা রিয়োকোয়ান-জীবনীকার অধ্যাপক য়াকব ফিশার করেননি। তবে কি জাপানের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সে-যুগে এমন কোন দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে স্পর্শকাতর পরিবার মাত্রকেই হয় মৃত্যু অথবা প্রব্রজ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে সর্ব সমস্যার সমাধান করতে হত? ফিশার সে-রকম কোন ইঙ্গিতও করেননি।

ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ান শিশু বয়স থেকেই অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির পরিচয় দেন। আর সব ছেলেমেয়েরা যখন খেলাধুলায় মত্ত থাকত তখন বালক রিয়োকোয়ান তন্ময় হয়ে কন-ফুৎসিয়ের তত্ত্ব-গম্ভীর রচনায় প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দিতেন। তাঁর এই আচরণে যে তাঁর পিতা-মাতা ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তার ইঙ্গিত ফিশার দিয়াছেন।

রিয়োকোয়ানের সব জীবনী-লেখকই দু'টি কথা বার-বার জোর দিয়ে বলেছেন। রিয়োকোয়ান বালক বয়সেও কখন মিথ্যা কথা বলেননি এবং যে যা বলত তিনি সরল চিত্তে তাই বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে ফিশার রিয়ো-কোয়ানের বাল্য-জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

রিয়োকোয়ানের বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁর পিতা তাঁরি সামনে একটি দাসীকে অত্যন্ত কঠিন বাক্য বলেন। দাসীর দুঃখে রিয়োকোয়ান বড়ই ব্যথিত হন ও ক্রুদ্ধ-নয়নে পিতার দিকে তাকান। পিতা তাঁর আচরণ লক্ষ্য করে বললেন, "এ রকম চোখ করে বাপ-মায়ের দিকে তাকালে তুমি আর মানুষ থাকবে না, ঐ চোখ নিয়ে মাছ হয়ে যাবে।" তাই শুনে বালক রিয়ো-কোয়ান বাড়ী ছেড়ে অন্তর্ধান করলেন। সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। উদ্বিগ্ন পিতা-মাতা চতুর্দিকে সংবাদ পাঠালেন। অবশেষে এক জেলে খবর পাঠাল, সে রিয়োকোয়ানকে

সমুদ্রপারের পাষাণ-স্তূপের কাছে দেখতে পেয়েছে। পিতা-মাতা ছুটে গিয়ে দেখেন, তিনি পাষাণ-স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, আর সমুদ্রের ঢেউ তাঁর গায়ে এসে লাগছে। কোলে করে বাড়ী এনে বাপ-মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ওখানে নির্জনে সমস্ত দিন কি করছিলে?" রিয়োকোয়ান বড়-বড় চোখ মেলে বললেন, "তবে কি আমি এখনো মাছ হয়ে যাইনি, আমি না দুষ্টু ছেলের মত তোমাদের অবাধ্য হয়েছিলুম?"

রিয়োকোয়ান কেন যে সমস্ত দিন সমুদ্রপারে জলের কাছে কাটিয়েছিলেন তখন বোঝা গেল। মাছই যখন হয়ে যাবেন তখন জলের কাছে গিয়ে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকাই তো প্রশস্ততম পন্থা।

সংসার ত্যাগ করেও রিয়োকোয়ান পিতা-মাতা সম্বন্ধে কখনো উদাসীন হতে পারেননি। মায়ের স্মরণে বৃদ্ধ শ্রমণ রিয়োকোয়ান যে কবিতাটি রচনা করেন সেটি মায়েরই ভালোবাসার মত এমনি সরল সহজ যে অনুবাদে তার সব মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায় :—

সকাল বেলায় কখনো গভীর রাতে
আঁখি মোর ধায় দূর 'সাদো' * দ্বীপ পানে
শান্ত-মধুর কত না স্নেহের বাণী
মা আমার যেন পাঠায় আমার কানে।

প্রব্রজ্যা

রিয়োকোয়ানের বয়স যখন সতেরো তখন তাঁর পিতা রাজধানীতে চলে যাওয়ায় তিনি গ্রামের প্রধান নির্বাচিত হলেন। তার দুই বৎসর পরে রিয়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করে সঙ্ঘে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ধনজন সুখ-সমৃদ্ধি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে যৌবনের প্রারম্ভেই কেন যে রিয়োকোয়ান সংসার ত্যাগ করলেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফিশার প্রচলিত কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করেছেন। কারো মতে রিয়োকোয়ানের কবিজন-সুলভ অথচ তত্ত্বান্বেষী মন জনপদপ্রমুখের দৈনন্দিন কূটনৈতিক কার্যকলাপে এতই ব্যথিত হত যে তিনি তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে সঙ্ঘের শরণ নেন; কারো মতে ভোগ-বিলাসের ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

রিয়োকোয়ান নাকি এক সন্ধ্যায় তাঁর প্রণয়িনী এক গাইশা† তরুণীর

* রিয়োকোয়ানের মাতা 'সাদো' দ্বীপে জন্মেছিলেন।

† 'গাইশা' ঠিক বেশ্যা বা গণিকা নহে; মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা অথবা প্রাচীন গ্রীসের 'হেটেরে' শ্রেণীয়া।

বাড়ীতে যান। এমনিতেই তিনি গাইশাদের কাছ থেকে প্রচুর খাতির-যত্ন পেতেন তার উপর তখন তিনি গ্রামের প্রধান। গাইশা তরুণীরা রিয়োকোয়ানকে খুশী করার জন্যে নাচল, গাইল—প্রচুর মদও খাওয়া হল। কিন্তু রিয়োকোয়ান কেন যে চিন্তায় বিভোর হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন তার কোন কারণ বোঝা গেল না। তাঁর প্রিয়া গাইশা-তরুণী বার-বার তাঁর কাছে এসে তাঁকে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেওয়াবার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হল না। তিনি মাথা নিচু করে আপন ভাবনায় মগ্ন রইলেন।

প্রায় চারশ' টাকা খরচ করে সে রাত্রে রিয়োকোয়ান বাড়ী ফিরলেন।

পরদিন সকাল বেলা রিয়োকোয়ান বাড়ীর পাঁচ জনের সঙ্গে খেতে বসলেন না। তখন সকলে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখে, তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। কি হয়েছে বোঝবার জন্য যখন কম্বল সরানো হল তখন বেরিয়ে এল রিয়োকোয়ানের মুণ্ডিত-মস্তক আর দেখা গেল তাঁর সর্বাঙ্গ জাপানী শ্রমণের কালো জোব্বায় ঢাকা।

আত্মীয়-স্বজনের বিস্ময় দূর করার জন্যও রিয়োকোয়ান বিশেষ কিছু বললেন না, শুধু একটুখানি হাসলেন। তার পর বাড়ী ছেড়ে পাশের কহ্‌শহ্‌জী সঙ্ঘের (মন্দির) দিকে রওয়ানা হলেন। পথে তাঁর বল্লভা গাইশার বাড়ী পড়ে। সে দেখে অবাক, রিয়োকোয়ান শ্রমণের কৃষ্ণবাস পরে চলে যাচ্ছেন। ছুটে গিয়ে সে তাঁর জামা ধরে কেঁদে, অনুনয়-বিনয় করে বলল, "প্রিয়, তুমি এ কি করেছ। তোমার গায়ে এ বেশ কেন?"

রিয়োকোয়ানেরও চোখ জলে ভরে এল। কিন্তু তবু দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি সঙ্ঘের দিকে এগিয়ে গেলেন।

হায়, অনন্তের আহ্বান যখন পেঁছিয় তখন সে ঝঞ্ঝার সামনে গাইশা-প্রজাপতি ডানা মেলে কি বল্লভকে ঠেকাতে পারে?

ফিশার বলেন, এ-সব কিংবদন্তী তাঁর মনঃপূত হয় না। তাঁর মতে এগুলো থেকে রিয়োকোয়ানের বৈরাগ্যের প্রকৃত কারণ পাওয়া যায় না।

ফিশারের ধারণা, রিয়োকোয়ান প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকে সন্ন্যাসের অনুপ্রেরণা পান। তিনি যে-জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন সে-জায়গায় প্রকৃতি গ্রীষ্ম-বসন্তে যে-রকম মধুর শান্ত ভাব ধারণ করে ঠিক তেমনি শীতকালে ঝড়-ঝঞ্ঝার রুদ্র রূপ নিয়ে আঘাত আবেগ দিয়ে জনপদবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফিশারের ধারণা, রিয়োকোয়ানের প্রকৃতিতে এই দুই প্রবৃত্তিই ছিল; এক দিকে ঋজু শান্ত পাইন-বনের মন্দ-মধুর গুঞ্জরণ, অন্য দিকে হিম ঋতুর ঝঞ্ঝা-মথিত বীচি-বিক্ষোভিত সমুদ্রতরঙ্গের অন্তহীন উদ্বেল উচ্ছ্বাস।

প্রকৃতিতে এ দ্বন্দ্বের শেষ নেই—রিয়োকোয়ান তাঁর জীবনের দ্বন্দ্ব সমাধান-কল্পে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ফিশার দৃঢ়কণ্ঠে এ কথা বলেন নি—এই তাঁর ধারণা।

মানুষ কেন যে সন্ন্যাস নেয় তার সদুত্তর তো কেউ কখনো খুঁজে পায়নি। সন্ন্যাসী-চক্রবর্তী তথাগত জরা-মৃত্যু দর্শনে না কি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন; আরো তো লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিদিন জরা-মৃত্যু চোখের সামনে দেখে, কিন্তু কই, তারা তো সন্ন্যাস নেয় না? বার্ধক্যের ভয়ে তারা অর্থসঞ্চয় করে আরো বেশী, মৃত্যুর ভয়ে তারা বৈদ্যরাজের শরণ নেয় প্রাণপণে—ত্রিশরণের শরণ নেবার প্রয়োজন তো তারা অনুভব করে না। যে জরা-মৃত্যু বুদ্ধদেবকে সন্ন্যাস এবং মুক্তি এনে দিল সেই জরা-মৃত্যুই সাধারণ জনকে অর্থের দাস এবং বৈদ্যের দাস করে তোলে।

গাইশা-তরুণীর প্রেমের নিষ্ফলতা আর ক্ষণিকতা হৃদয়ঙ্গম করে রিয়োকোয়ান সন্ন্যাস গ্রহণ করেন? তাই বা কি করে হয়? প্রেমে হতাশ হলেই তো সাধারণ মানুষ বৈরাগ্য বরণ করে,—রিয়োকোয়ানের বেলা তো দেখতে পাই গাইশা প্রণয়িনী তাঁকে করুণ কণ্ঠে প্রেম-নিবেদন করে সন্ন্যাস-মার্গ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে।

এবং অতি সামান্য কারণেও তো মানুষ সন্ন্যাস নেয়। কন-ফুৎসিয় কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তার কারণ ছন্দে বেঁধে দিয়েছেন :

> মসৃণ দেহ উচ্চপৃষ্ঠ উদ্ধত বলীয়ান
> বৃষ চলিয়াছে ভয়ে তার কাছে কেহ নহে আগুয়ান
> সে করিল এক ধেনুর কামনা অমনি শৃঙ্গাঘাত
> আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র; সংসারে প্রণিপাত! (—সত্যেন দত্ত)

এবং এ সব কারণের চেয়েও ক্ষুদ্রতর কারণে মানুষ যে সন্ন্যাস নেয় তার উদাহরণ তো আমরা বাঙালী জানি। 'ওরে বেলা যে পড়ে এল'—অত্যন্ত সরল দৈনন্দিন অর্থে এক চাষা আর এক চাষাকে এই খবরটি যখন দিচ্ছিল তখন হঠাৎ কি করে এক জমিদারের কানে এই মামুলি কথা কয়টি গিয়ে পৌঁছল। শুনেছি, সে জমিদার না কি অত্যাচারীও ছিলেন এবং এ-কয়টি কথা যে পূর্বে কখন তিনি শোনেননি সে-ও তো সম্ভবপর নয়। তবে কেন তিনি সেই মুহূর্তেই পাল্কী থেকে বেরিয়ে এক বস্ত্রে সংসার ত্যাগ করলেন?

সমুদ্রবক্ষে বারিবর্ষণ তো অহরহ হচ্ছে, শুক্তিরও অভাব নেই। কোটি কোটি বৃষ্টিবিন্দুর ভিতর কোনটি মুক্তায় পরিণত হবে কেউ তো বলতে পারে না, হয়ে যাওয়ার পরেও তো কেউ বলতে পারে না কোন শুক্তি কোন মুক্তার মুক্তি পেল।

রাজার ডাকঘর অমলের জানলার সামনেই বসল কেন? অমলই বা রাজার চিঠি পেল কেন?

শুধু পতঞ্জলি বলেছেন, 'তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ।' (১, ২১) অর্থাৎ যাঁদের বৈরাগ্য ভাব প্রবল তাঁরাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে মোক্ষ পান। কিন্তু কাদের

বৈরাগ্য ভাব প্রবল হয় আর কেনই বা প্রবল হয় তার সন্ধান পতঞ্জলিও তো দেননি।

তাই বোধ হয় শাস্ত্রকাররা এই রহস্যের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'সন্ন্যাসের সময়-অসময় নেই। যে মুহূর্তে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হবে, সেই মুহূর্তেই সন্ন্যাস গ্রহণ করবে।'

রিয়োকোয়ান উনিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

এ-প্রসঙ্গে ফিশার বলেন, 'আপাতদৃষ্টিতে রিয়োকোয়ানের সন্ন্যাস গ্রহণ স্বার্থপরতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি জনসাধারণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার থেকে তাঁকে স্বার্থপর বলা চলে না।'

এই সামান্য কথাটিতেই ফিশার ধরা দিয়েছেন যে তিনি ইয়োরোপীয়। সন্ন্যাস গ্রহণ কোন অবস্থাতেই স্বার্থপরতার চিহ্ন নয়। অন্ততঃ ভারতবর্ষে নয়।

সর্বস্ব ত্যাগ করে শান্তির সন্ধানে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের সম্মুখে কি কি বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হতে পারে, তার বর্ণনা ভারতবর্ষের সাধকেরা দিয়ে গিয়েছেন। সংসার ত্যাগের প্রথম উত্তেজনায় মানুষ যে তখন সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে সীমারেখা টানতে পারে না, সে সাবধান-বাণী ভারতীয় গুরু বার বার সাধনার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন এবং সব চেয়ে বেশী সাবধান করে দিয়ে গিয়েছেন উৎকট কৃচ্ছ্রসাধনের বিরুদ্ধে।

ভারতবর্ষ নানা দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে এই সব চরম সত্য আবিষ্কার করতে পেয়েছে বলেই পরবর্তী যুগের ভারতীয় সাধকের ধ্যান-মার্গ অপেক্ষাকৃত সরল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চীন জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধভূমি ভারতবর্ষের এ ইতিহাসের সঙ্গে সুপরিচিত নয়। তারা নিয়েছে আমাদের সাধনার ফল— আমাদের পন্থা যে কত পতন-অভ্যুদয় দ্বারা বিক্ষুব্ধ, তার সন্ধান ভারতবর্ষের বাইরে কম সাধকই পেয়েছেন। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভবের প্রত্যাশা করতে গিয়ে ভারতবর্ষের বাইরে বহু নবীন সাধক সাধনার দৃঢ় ভূমি থেকে বিচ্যুত হন।

রিয়োকোয়ানের জীবনী-লেখক অধ্যাপক ফিশারের বর্ণনা হতে তাই দেখতে পাই, তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করে কি অহেতুক কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর দিয়ে নির্বাণের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব যে সব আত্মনিপীড়ন বর্জনীয় বলে বার বার সাধককে সাবধান করে দিয়েছেন, বহু জাপানীসঙ্ঘে সেই আত্মনিপীড়নকেই নির্বাণ লাভের প্রশস্ততম পন্থা বলে বরণ করে নেওয়া

ফিশার বলেন, 'সঙ্ঘের চৈত্যগৃহে কুশাসনের উপর পদ্মাসনে বসে দেয়ালের দিকে মুখ করে নবীন সাধককে প্রহরের পর প্রহর আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করতে হত। এক মাত্র আহারের সময় ছাড়া অন্য কোনো সময়েই দেয়াল ছাড়া অন্য দিকে চোখ ফেরাবার অনুমতি তাদের ছিল না। একটানা কুড়ি ঘণ্টা ধরে

কখনো কখনো তাদের ধ্যানে নিমজ্জিত থাকতে হত এবং সেই ধ্যানে সামান্যতম বিচ্যুতি হলে পিছন থেকে হঠাৎ স্কন্ধোপরি গুরুর নির্মম লগুড়াঘাত।'

ধ্যানে নিমজ্জিত হবার চেষ্টা যাঁরাই করেছেন, তাঁরাই জানেন, প্রথম অবস্থায় নবীন সাধক ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। একেই বলে জড়-সাধনা এবং পতঞ্জলি তাই যে উপদেশ দিয়েছেন, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, অল্প সময়ে ফললাভের আশা করা সাধনার প্রতিকূল। অত্যধিক মানসিক কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে কত সাধক যে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যান, সে কথা ভারতীয় গুরু জানেন বলেই শিষ্যকে অতি সন্তর্পণে শারীরিক ও মানসিক উভয় সাধনাতে নিযুক্ত করে ধীরে ধীরে অগ্রগামী হতে উপদেশ দেন।

আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, রিয়োকোয়ান সঙ্ঘের উৎকট কৃচ্ছ্রসাধনায় ভেঙে পড়েননি। নয় বৎসর ধ্যান-ধারণার পর তাঁর গুরুর মৃত্যু হয়। রিয়োকোয়ান তখন সঙ্ঘ ত্যাগ করে পর্যটকরূপে বাহির হয়ে যান। রিয়োকোয়ানের পরবর্তী জীবনযাপনের পদ্ধতি দেখলে স্পষ্টই অনুমান করা যায়, তিনি অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধনের নিষ্ফলতা ধরতে পেরেছিলেন বলেই সঙ্ঘ ত্যাগ করে পর্যটনে বাহির হয়ে যান।

দীর্ঘ কুড়ি বৎসর রিয়োকোয়ান ধ্যান-ধারণা ও পর্যটনে অতিবাহিত করেন। তাঁকে তখন কোন সব দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল, তার সন্ধান আমরা কিছুটা পাই তাঁর কবিতা থেকে; কিন্তু সেগুলি থেকে রিয়োকোয়ানের সাধনার ইতিহাস কালানুক্রমিক ভাবে লেখবার উপায় নেই।

কিন্তু একটি সত্য আমরা সহজেই তাঁর কবিতা থেকে আবিষ্কার করতে পারি। দ্বন্দ্ব থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি রিয়োকোয়ান কখনো পাননি। মাঝে-মাঝে দু'-একটি কবিতাতে অবশ্য রিয়োকোয়ানকে বলতে শুনি, তিনি শান্তির সন্ধান পেয়েছেন, কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, ভিন্ন কবিতায় তিনি হয় নব বসন্তের আগমনে উল্লসিত, নয় বৃষ্টি-বাদলের মাঝখানে দরিদ্র চাষার প্রাণান্ত পরিশ্রম দেখে বেদনানুভূতিতে অবসন্ন। আমার মনে হয়, রিয়োকোয়ান যে চরম শান্তি পাননি, সেই আমাদের পরম সৌভাগ্য। নির্দ্বন্দ্ব জীবনের সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের তো কবিতা রচনা করবার জন্য কোনো আবেগ থাকার কথা নয়। শান্ত রস এক প্রকারের রস হতেও পারে কিন্তু সে রস থেকে কবিতা সৃজন হয় কি না, তা তো জানিনে এবং হলেও সে রস আস্বাদন করবার মত স্পর্শকাতরতা আমাদের কোথায়? দাক্ষিণাত্যের আলঙ্কারিকেরা তাই শঙ্করবরণম্‌কে সন্ন্যাস রাগ বলে সঙ্গীতে উচ্চ স্থান দিতে সম্মত হয় না। তাঁদের বক্তব্য, সন্ন্যাসীর কোনো অনুভূতি থাকতে পারে না, আর অনুভূতি না থাকলে রসসৃষ্টিও হতে পারে না।

রিয়োকোয়ানের কবিতা শঙ্করবরণম্‌ বা সন্ন্যাস রাগে রচিত হয়নি। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ কুড়ি বৎসর সাধনা ও পর্যটনের পর যখন তিনি খবর পেলেন যে,

তাঁর পিতা জাপানের রাজনৈতিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবার জন্য আত্মহত্যা করেছেন তখন এক মুহূর্তেই তাঁর সমস্ত সাধনা-ধন তাঁকে বর্জন করল।

খৃষ্ট বলেছেন, "The foxes have holes and the birds of the air have nests ; but the Son of man hath not where to lay his head.' অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের জন্মভূমি নেই, আবাসভূমিও নেই। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে রিয়োকোয়ান বিচলিত হয়ে হঠাৎ যেন বাল্যজীবনে ফিরে গেলেন।

হেথায় হোথায় যেখানে যখন আমি
তন্দ্রামগন,—সুপ্তির কোলে আপনারে দিই ছাড়া
সেই পুরাতন নিত্যনবীন স্বপ্নের মায়া এসে
গুঞ্জরে কানে, চিত্ত আমার সেই ডাকে দেয় সাড়া।
এ স্বপ্ন নয়, ক্ষণেকের খেদ, উড়ে-যাওয়া আবছায়া
এ স্বপ্ন হানে আমার বক্ষে অহরহ একই ব্যথা
ছেলেবেলাকার স্নেহ ভালোবাসা, আমার বাড়ীর কথা।

এ কি শ্রমণের বাণী, এ কি সন্ন্যাসের নিরাবলম্বতা!

ফিশার বলেন, 'মাতৃভূমির আহ্বান রিয়োকোয়ানকে এতই বিচলিত করে ফেলল যেন তিনি স্বগ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সান্ত্বনা দেবার চেয়ে হয়ত সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যই তাঁর হৃদয় তৃষাতুর হয়েছিল বেশী। আত্মজনের সঙ্গসুখ শ্রমণ রিয়োকোয়ান কখনো ভুলতে পারেননি; সে-সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়া 'ক্ষণেকের খেদ' নয়, চিত্তাকাশে 'উড়ে-যাওয়া আবছায়া' নয়, সে-বেদনা অবচেতন মনে বাসা বেঁধে ক্ষণে ক্ষণে নির্বাণ অন্বেষণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্যের হাতে নিজকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে কবি রিয়োকোয়ান শ্রমণ রিয়োকোয়ান হতে পারতেন না। কবি ও শ্রমণের মাঝখানে যে অক্ষয় সেতু রিয়োকোয়ান নির্মাণ করে গিয়েছেন, যে-সেতু আমাদের কাছে চির বিস্ময়ের বস্তু, সেই সেতুর বিশ্বকর্মা তিনি কখনই হতে পারতেন না।

ফিশার বলেন, কিন্তু বাড়ীর কাছে পেঁৗছে রিয়োকোয়ান থমকে দাঁড়ালেন, নিজের আচরণে লজ্জিত হলেন এবং চিত্তসংযম আয়ত্ত করে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্বিতীয় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। ফিশার বলেন, বোধ হয় রিয়োকোয়ানের সন্ন্যাসবৃত্তি তাঁর নীচাসক্তি থেকে প্রবলতম ছিল বলেই শেষ মুহূর্তে তিনি স্বগ্রামে প্রবেশ করলেন না। তাই হবে। কারণ, উপেন দুই বিঘে জমি কিছুতেই না ভুলতে পেরে শেষ কালে যখন আপন বাস্তুভিটায় ফিরে এল, তখন

সে দুটি আমের লোভ সম্বরণ করতে পারল না। আর যে চিত্ত সন্ন্যাসের দৃঢ় ভূমি নির্মাণে তৎপর সেই-চিত্ত ক্ষণিক দুর্বলতার মোহে স্বগৃহে ফিরে এলেও গৃহ-সংসারের প্রকৃত রূপ হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ও প্রবাসের দূরত্বে যে গৃহ তার কাছ মধুময় বলে মনে হয়েছিল ('নিকটে ধূসর-জর্জর অতি দূর হতে মনলোভা') তার বিকট রূপ দেখে সে তখন পুনরায় 'আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র সংসারে প্রণিপাত' বলে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে।

বৌদ্ধদৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন সন্ন্যাসধর্মকে ক্ষুন্ন করে না। স্বয়ং বুদ্ধদেব বোধিলাভের পর কপিলবস্তুতে ফিরে এসেছিলেন। শ্রমণ রিয়োকোয়ান বোধিলাভ করতে পারেননি বলেই স্বগ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

এই সময় রিয়োকোয়ানের পিতার নিজের হাতের লেখা একটি কবিতা পুত্রের হাতে এসে পড়ে। কবিতাটি তিন লাইনে লেখা জাপানী হাক্কু পদ্ধতিতে রচিতঃ—

কি মধুর দেখি রেশমের গাছে ফুটিয়াছে ফুলগুলি;
কোমল পেলব করিল তাদের
ভোরের কুয়াশা-তুলি!

রিয়োকোয়ানের মৃত্যুর পর এই কবিতাটি পাওয়া গিয়েছে। আর এক প্রান্তে রিয়োকোয়ানের নিজের হাতে লেখা, 'হায়, এই কুয়াশার ভিতর বাবা যদি থাকতেন! কুয়াশা সরে গেলে তো বাবাকে দেখতে পেতুম।'

বোধ হয়, এই সময়কারই লেখা আরেকটি কবিতা থেকে রিয়োকোয়ানের মনের সংগ্রাম স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েঃ—

'এই যে জীবন, এই যে মৃত্যু প্রভেদ কোথাও নাই,
যে জন জানিল তার কাছে বাঁচা হয়ে ওঠে মধুময়।
কিন্তু হায় রে মাটি দিয়ে গড়া অন্ধ আমার হিয়া
ফিরে চারি দিকে—রিপুর ঝঞ্ঝা যখন যেদিকে বয়।
দুর্বার রণ! তার মাঝখানে শিশু আমি, অসহায়
ধুক্‌ধুক্‌ বুকে বাজে 'ভুল' বাজে 'ঠিক'—
চরম সত্য স্মরণ ছাড়িয়া লুপ্ত হয়েছে, হায়!

এই দ্বন্দ্বই তো চিরন্তন দ্বন্দ্ব। সর্বদেশের সর্বকালের বহু লোক এই দ্বন্দ্বের নিদারুণ বর্ণনা দিয়েছেন। সত্য দেখতে পেয়েছি, কিন্তু আমার রিপু যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে—এই প্রতিবন্ধক ভিতরের না বাইরের, তাতে কিছু মাত্র আসে-যায় না, রাধার বেলা শাশুড়ী ননদী, হাফিজের বেলা,—

প্রেম নাই প্রিয় লাভ আশা করি মনে
হাফিজের মত ভ্রান্ত কে ভব-ভবনে!

এ দ্বন্দ্বের তুলনা দিয়েছেন সব কবিই আপন হৃদয় দিয়ে। পূর্ববঙ্গের কবি হাসন রাজা চিঁড়ে-ভানার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেছেন,—

হাসনজানের রূপটা দেখি ফাল্‌দি ফাল্‌দি উঠে
চিঁড়া-বারা হাসন রাজার বুকের মাঝে কুটে।

রায়োকোয়ান কান পেতে বুকের ধুকধুকে শুনতে পেয়েছেন, 'ভুল, ঠিক,' 'ভুল, ঠিক,' 'ভুল, ঠিক'!

এ তো গেল রিয়োকোয়ানের মনের দ্বন্দ্বের কথা, কিন্তু বাইরের দিকে রিয়োকোয়ানের জীবন অত্যন্ত সহজ গতিতেই চলেছিল। আহার শয়ন বাসস্থান সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন বলে সন্ন্যাস আশ্রমের অভাব-অনটন তাঁকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর ভ্রাম্যমান জীবন সম্বন্ধে জাপানে বহু গল্প প্রচলিত আছে এবং সে গল্পগুলির ভিতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায়, শ্রমণ রিয়োকোয়ান আর কিছু না হোক, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, বিলাস-ব্যসনের মোহ সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই গল্প-গুলির কয়েকটি অনুবাদ করার পূর্বে বলে নেওয়া ভালো যে, বৃদ্ধ বয়সে রিয়োকোয়ান স্বগ্রামের দিকে ফিরে আসেন, আর পাশের পাহাড়ের এক পরিত্যক্ত আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই জরাজীর্ণ গৃহে বহু কাল ধরে কেউ বসবাস করেনি, তার অর্ধেক ধ্বসে গিয়েছে, বাকিটুকু লতা-পাতার নিচে ঢাকা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু ফিশার বলেন, বহু বৎসরের পরিভ্রমণে শ্রান্ত-ক্লান্ত শ্রমণের কাছে এই ধ্বংসস্তূপই শান্তির নীড় বলে মনে হল।

এই প্রত্যাবর্তন নিয়ে ফিশার দীর্ঘ আলোচনা করেননি। আমাদেরও মনে হয়, করার কোনো প্রয়োজন নেই। গৃহী হোন আর সন্ন্যাসীই হোন, বার্ধক্যে আশ্রয়ের প্রয়োজন। রিয়োকোয়ানের বেলা শুধু এইটুকু দেখা যায় যে, সর্ব-সঙ্ঘের দ্বার তাঁর সামনে উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি শ্রমণমণ্ডলীর প্রধান তো হতে চানইনি*, এমন কি কারো সেবা পর্যন্ত গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন।

রিয়োকোয়ানের প্রত্যাবর্তন-সংবাদ পেয়ে তাঁর ভাই-বোনেরা তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি।

বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে ফিরেছিলেন বটে, কিন্তু রাজপ্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেননি।

* জাতকের গল্পে আছে, এক বৃদ্ধ শ্রমণ কোনো সংঘে আশ্রয় গ্রহণ করতে চাইলে সেই সংঘের প্রধান শ্রমণ ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। হয়ত জাতকের এই গল্পটি রিয়োকোয়ানের অজানা ছিল না, কারণ ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ান বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং জাতক বৌদ্ধধর্মের কতখানি স্থান অধিকার করেছে, সে কথা অমরাবতী, সাঁচীর ভাস্কর্য-স্থাপত্য দেখলে আজও চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

এই সময়ের লেখা একটি কবিতাতে রিয়োকোয়ানের শান্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় :—

এই তো পেয়েছি শান্তিনিলয়, খরতাপ হেথা নাই,
জীবন-সাঁঝের শেষ ক'টি দিন কাটাব হেথায় আমি
স্বপ্নের মোহে, কল্পনা বুনে। গাছেতে ছায়াতে হেথা
আমারে রাখিবে সোহাগে ঘিরিয়া—কাটাবো দিবস-যামী।

কিংবদন্তীচয়ন

লুকোচুরি খেলা

রিয়োকোয়ান প্রকৃতি আর ছেলেপিলেদের নিয়েই বেশীর ভাগ জীবন কাটিয়েছেন। ফিশার বলেন, তিনি কোনো জায়গাতে কিছু দিন থাকলেই ছেলেমেয়েরা তাঁকে চিনে নিত। ফিশার বলেননি কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকৃতিও তাঁকে চিনে নিত এবং রবীন্দ্রনাথের 'হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহ তো কহেনি কথা' কবিতাটি আমার মতের সায় দেবে।

রিয়োকোয়ান গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় ছেলেমেয়েরা লুকোচুরি খেলছিল। রিয়োকোয়ানকে দেখে তাদের উৎসাহ আর আনন্দের সীমা নেই। বেশী ঝুলোঝুলি করতে হল না। রিয়োকোয়ান তো নাচিয়ে বুড়ী, তার উপর পেয়েছেন মৃদঙ্গের তাল। তদ্দণ্ডেই খেলাতে যোগ দিলেন। খেলাটা বনের ভিতরে ভালো করে জমবে বলে সবাই গ্রাম ছেড়ে সেখানে উপস্থিত। সবাই হেথায় হোথায় লুকোলো। রিয়োকোয়ান এ খেলাতে বহু দিনের অভ্যাসের ফলে পাকাপোক্ত—তিনি লুকোলেন এক কাঠুরের কুঁড়ে ঘরে। ঘরের এক কোণে কাঠ গাদা করা ছিল, তিনি তার উপরে বসে ঝোলা-ঝোলা আস্তিন দিয়ে মুখ ঢেকে ভাবলেন, ওখানে তাঁকে কেউ কক্‌খনো খুঁজে পাবে না, আর পেলেই বা কি, তাঁর তো মুখ ঢাকা, চিনবে কি করে?

খেলা চলল। সবাইকে খুঁজে পাওয়া গেল। রিয়োকোয়ান যে কুঁড়ে ঘরে লুকিয়েছিলেন, সে-কথা কারো অজানা ছিল না, কিন্তু ছেলেরা বলল, 'দেখি, আমরা সবাই চুপ-চাপ বাড়ী চলে গেলে কি হয়?'

রিয়োকোয়ান সেই কাঠের গাদার উপর বসে সমস্ত বিকেল বেলাটা কাটালেন—পরদিন সকাল বেলা কাঠুরের বউ ঘরে ঢুকে চমকে উঠে বলল, 'ওখানে কে ঘুমুচ্ছ হে?' তার পর চিনতে পেরে থ' হয়ে বলল, 'সে কি, সন্ন্যাসী ঠাকুর যে! আপনি এখানে কি করছেন?'

রিয়োকোয়ান আস্তিন-ফাস্তিন নাড়িয়ে মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরে চুপ, চুপ, চুপ। ওরা জেনে যাবে যে! বুঝতে পারো না!'

রিয়োকোয়ানকে যে ছেলেমেয়েরা হামেশাই বোকা বানাতে পারত, সে-কথা সবাই জানে, আর পাঁচ জনও তাঁকে আকসার ঠকাবার চেষ্টা করত। কিন্তু প্রশ্ন, রিয়োকোয়ানের কাছে এমন কি সম্পদ ছিল যে মানুষ তাঁকে ঠকাবার চেষ্টা করবে? ফিশার বলেন, রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা ছবির চেয়েও বেশী কদর পেত এবং সেই হাতের লেখায় তাঁর কবিতার মূল্য অনেক লোকই জেনে গিয়েছিল। কিন্তু রিয়োকোয়ান চট করে যাকে তাকে কবিতা দিতে রাজী হতেন না, বিশেষ করে যারা তাঁর কবিতা বিক্রী করে পয়সা মারার তালে থাকত, তাদের ফন্দী-ফাঁদ এড়াবার চেষ্টা সব সময়ই করতেন। গল্পগুলো থেকে জানা যায়, তিনি ফাঁদে ধরা পড়েছেনই বেশী, এড়াতে পেরেছেন মাত্র দু'-এক বার।

জাপানে 'চলো' খেলার খুবই চলতি, আর রিয়োকোয়ানকে তো কোন খেলাতেই নামাবার জন্য অত্যধিক সাধাসাধি করতে হত না।

রিয়োকোয়ান বন্ধু মনসুকের সঙ্গে এক দিন দেখা করতে গিয়েছিলেন। মনসুকে বললেন, 'এসো, 'চলো' খেলা খেলবে?' রিয়োকোয়ান তো তৎক্ষণাৎ রাজী। মনসুকে খেলা আরম্ভ করার সময় বললেন, 'কিছু একটা বাজী ধরে খেললে হয় না? তাহলে খেলাটা জমবে ভালো।'

রিয়োকোয়ান বললেন, 'তা তো বটেই। যদি আমি জিতি তাহলে তুমি আমাকে কিছু কাপড়-জামা দেবে—শীতটা তো বেড়েই চলেছে।'

মনসুকে বললেন, 'বেশ, কিন্তু যদি আমি জিতি?'

রিয়োকোয়ান তো মহা দুর্ভাবনায় পড়লেন। তাঁর কাছে আছেই বা কি, দেবেনই বা কি? বললেন, 'আমার তো, ভাই, কিছুই নেই।'

মনসুকে অতি কষ্টে তাঁর ফূর্তি চেপে বললেন, 'তোমার চীনা হাতের লেখা যদি দাও তাইতেই আমি খুশী হব।' রিয়োকোয়ান অনিচ্ছায় রাজী হলেন। খেলা আরম্ভ হল। রিয়োকোয়ান হেরে গেলেন। আবার খেলা শুরু, আবার রিয়োকোয়ানের হার হ'ল। করে করে সব শুদ্ধ আট বার খেলা হল, রিয়োকোয়ন আট বারই হারলেন। আর চীনা হাতের লেখা না দিয়ে এড়াবার যো নেই।

রিয়োকোয়ান হস্তলিপি দিলেন। দেখা গেল, আটখানা লিপিতেই তিনি একই কথা আট বার লিখেছেন;—

'চিনি মিষ্টি
ওষুধ তেতো।'*

মনসুকে যখন আপত্তি জানিয়ে বললেন, আট বার একই কথা লেখা উচিত

* খুব সম্ভব কবিতাটির গূঢ়ার্থ, 'বাজী জেতাতে বড় আনন্দ, আর বাজী হারাতে বড় দুঃখ।'

হয়নি তখন রিয়োকোয়ান হেসে উত্তর দিলেন, ‘কিন্তু চালো খেলা কি [illegible] বারই একই রকমের হয় না? তাই একই কথা আটবার লিখে দিয়েছি।’

কুড়িয়ে-পাওয়া

রিয়োকোয়ানকে কে যেন এক বার বলেছিল রাস্তায় পয়সা কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারী আনন্দ। একদিন আশ্রমে ফেরার পথে তিনি মনে মনে সেই কথা নিয়ে চিন্তা করতে করতে বললেন, ‘এক বার দেখাই যাক না, কুড়িয়ে পাওয়াতে কি আনন্দ লুকনো আছে।’ রিয়োকোয়ান ভিক্ষা করে কয়েকটি পয়সা পেয়েছিলেন। সেগুলো তিনি একটা একটা করে রাস্তায় ছড়িয়ে ফের তুলে নিলেন। অনেক বার ছড়ালেন, কুড়োলেন, কিন্তু কোন রকম আনন্দই পেলেন না। তখন মাথা চুলকে আপন মনে বললেন, ‘এটা কি রকম হল? আমায় সবাই বললে, কুড়িয়ে পাওয়াতে ভারী ফুর্তি, কিন্তু আমার তো কোন ফুর্তি হচ্ছে না। তারাও তো ঠকাবার লোক নয়।’ আরো বহু বার ছড়ালেন, কুড়োলেন, কিন্তু কোন সুখই পেলেন না। এই রকম করতে করতে শেষটায় বেখেয়ালে সব ক’টি পয়সাই ঘাসের ভিতর হারিয়ে গেল।

তখন তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে পয়সাগুলো খুঁজতে হল। যখন পেলেন তখন মহা ফুর্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, ‘এই বারে বুঝতে পেরেছি। কুড়িয়ে পাওয়াতে আনন্দ আছে বৈ কি!’

ধূর্ত নাপিত

রিয়োকোয়ানের হাতের লেখা এতই সুন্দর ছিল আর তাঁর কবিতাতে এমনি অপূর্ব রসসৃষ্টি হত যে তাঁর হাতের লেখা কবিতা কেউ জোগাড় করতে পারলে বিক্রি করে বেশ দু’পয়সা কামাতে পারত। রিয়োকোয়ান নিজে শ্রমণ; কাজেই তিনি এ সব লেখা বিক্রি করতেন না—গরীব-দুঃখীকে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু কেউ ধাপ্পা দিয়ে তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করার চেষ্টা করলে তিনি ফাঁদ এড়াবার চেষ্টা করতেন।

শ্রমণকে মাথা নেড়া করতে হয়। তাই রিয়োকোয়ান প্রায়ই এক নাপিতের কাছে যেতেন। নাপিতটি আমাদের দেশের নাপিতের মতই ধূর্ত ছিল এবং রিয়োকোয়ানের কাছ থেকে অনবরত কিছু লেখা আদায় করার চেষ্টা করত। তাঁকে তাই নিয়ে বড্ড বেশী জ্বালাতন করলে তিনিও ‘দেব’ ‘দিচ্ছি’ করে কোনো গতিকে এ অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করতেন।

শেষটায় ধূর্ত নাপিত এক দিন তাঁর মাথা অর্ধেক কামিয়ে বলল, ‘ঠাকুর, হাতের লেখা ভালোয় ভালোয় এই বেলা দিয়ে দাও। না হলে বাকী অর্ধেক আর কামাবো না।’ এ-রকম শয়তানির সঙ্গে রিয়োকোয়ানের এই প্রথম পরিচয়। কি আর করেন? হাতের লেখা দিয়ে মাথাটি মুড়িয়ে—উভয়ার্থে—আশ্রমে

ফিরলেন। নাপিতও সগর্বে সদম্ভে লেখাটি ফ্রেমে বাঁধিয়ে দোকানের মাঝখানে টাঙালো—ভাবখানা এই, সে এমনি গুণী যে রিয়োকোয়ানের মত শ্রমণ তাঁকে হাতের লেখা দিয়ে সম্মান অনুভব করেন।

কিন্তু খদ্দেরদের ভিতর দু'-চার জন প্রকৃত সমঝদার ছিলেন। তাঁরা নাপিতকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, লেখাতে একটা শব্দ সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গিয়েছে। নাপিত ছুটে গিয়ে রিয়োকোয়ানের ভুল দেখিয়ে শুদ্ধ করে দেবার জন্যে বলল। তিনি বললেন, 'ওটা ভুল নয়। আমি ইচ্ছে করেই ও-রকম ধারা করেছি। তুমি আমার মাথা অর্ধেক কামিয়ে দিয়েছিলে। আমিও তাই লেখাটি শেষ করে দিইনি। আর ঐ যে বুড়ী আমাকে সিম বিক্রি করে সে সর্বদাই আমাকে কিছুটা ফাউ দেয়। তোমার লেখা থেকে যেটুকু বাদ পড়েছে সেটুকু বুড়ীকে লেখা দেবার সময় ফাউ করে জুড়ে দিয়েছি। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখে এসো।'

তার পর রিয়োকোয়ান অনেকক্ষণ ধরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসলেন।

রিয়োকোয়ান ও মোড়ল তোমিতোরি

শ্রমণদের দিন কাটে নানা ধরণের লোকের আতিথ্য নিয়ে। রিয়োকোয়ান একবার অতিথি হলেন মোড়ল তোমিতোরির। জাপানে তখন 'চলো' খেলার খুব চলতি এবং রিয়োকোয়ান সর্বদাই এ-খেলাতে হারেন বলে সকলেই তাঁর সঙ্গে খেলতে চায়।

তাই খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু রিয়োকোয়ানের অদৃষ্ট সেদিন ভালো ছিল। বাজীর পর বাজী তিনি জিতে চললেন। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা ভারী খুশী—রিয়োকোয়ানও আনন্দে আত্মহারা। তোমিতোরি রিয়োকোয়ানকে বিলক্ষণ চিনতেন, তাই রগড় দেখবার জন্য হঠাৎ যেন ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে বললেন, 'তুমি তো আচ্ছা লোক হে! অতিথি হয়ে এসেছ আমার বাড়ীতে আর জিতে-জিতে আমার সর্বস্ব কেড়ে নিতে তোমার এতটুকু লজ্জা হচ্ছে না? এ-রকম স্বার্থপর ছোটলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভদ্রত্ব কি করে বজায় রাখা যায় আমি তো ভেবেই পাচ্ছি নে।'

রিয়োকোয়ান রসিকতা না বুঝতে পেরে ভারী লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি কোনো গতিকে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন বন্ধু কেরার বাড়ীতে। কেরা বন্ধুর চেহারা দেখেই বুঝলেন, কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করেছ, খুলে বলো।' রিয়োকোয়ান বললেন, 'ভারী বিপদগ্রস্ত হয়েছি। তোমিতোরির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কি যে করব ভেবেই পাচ্ছি নে। তুমি কিছু বুদ্ধি বাৎলাতে পারো? তোমিতোরিকে যে করেই হোক খুশী করতে হবে।'

কেরা ব্যাপারটা শুনে তখনই বুঝতে পারলেন যে রিয়োকোয়ান রসিকতা

বুঝতে পারেননি। কিন্তু তিনিও চেপে গিয়ে দরদ দেখিয়ে বললেন, 'তাই তো! তা আচ্ছা, কাল তোমাকে তোমিতোরির কাছে নিয়ে গিয়ে মাপ চাইব।'

রিয়োকোয়ান অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

পরদিন ভোর বেলা দু'জনা মোড়লের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। রিয়োকোয়ান দোরের বাইরে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেরা ভিতরে গিয়ে যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়েছে, এ-রকম ভাবে গম্ভীর গলায় রিয়োকোয়ানের হয়ে তোমিতোরির কাছে মাপ চাইলেন। রিয়োকোয়ান উদ্বেগে কাতর হয়ে কান খাড়া করে শুনতে পেলেন তোমিতোরি তাঁকে মাপ করতে রাজী আছেন। তদ্দণ্ডেই দুশ্চিন্তা কেটে গেল আর মহা খুশী হয়ে তৎক্ষণাৎ তোমিতোরির সামনে গিয়ে হাজির। তোমিতোরি প্রচুর খাতিরযত্ন করে রিয়োকোয়ানকে বসালেন। রিয়োকোয়ানকে আর তখন পায় কে! খুশীতে সব কিছু বেবাক ভুলে গিয়ে এক লহমার ভিতরেই বললেন, 'এসো, 'চলো' খেলা আরম্ভ করা যাক।'

রিয়োকোয়ান এমনই সরল মনে প্রস্তাবটা করলেন যে সবাই হেসে উঠলেন। খেলা আরম্ভ হল।

এবারও রিয়োকোয়ান জিতলেন!

কী বিপদ!

রিয়োকোয়ান ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা-ধুলো করতে ভালোবাসতেন। তারা মাঝে-মাঝে তাঁকে বড় বিপদগ্রস্ত করত।

কথা নেই বার্তা নেই এক দিন হঠাৎ একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল, 'ঠাকুর, আমায় একটা রায়ো দাও (রায়ো মুদ্রার দাম প্রায় চার টাকার মত)।' রিয়োকোয়ান তো অবাক্। এক রায়ো? বলে কি? তাঁর কাছে দু'গণ্ডা পয়সা হয় কি না হয়।

ছেলেরা ছাড়ে না। আরেক জন বলল, 'আমাকে দু'টো রায়ো দাও।' কেউ বলে তিনটে, কেউ বলে চারটে। নিলামের মত দাম বেড়েই চলল আর রিয়োকোয়ান বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে হাত দু'খানা মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে ভাবছেন অত টাকা তিনি পাবেন কোথায়?

যখন নিলাম দশ রায়ো পেরিয়ে গেল তখন তিনি হঠাৎ দড়াম করে লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ছেলেরা তো এতক্ষণ নিলামের ফুর্তিতে মশগুল হয়েছিল। রিয়োকোয়ানকে হঠাৎ এ-রকম ধারা মাটিতে পড়ে যেতে দেখে ভয়ে-ভয়ে কাছে এগিয়ে এসে ডাকল, 'ও ঠাকুর, ওঠো। এ-রকম করছ কেন?' কোনো সাড়া-শব্দ নেই। আরো কাছে এগিয়ে এসে দেখে তাঁর চোখ বন্ধ, সমস্ত শরীরে নড়া-চড়া নেই।

ভয় পেয়ে সবাই কানের কাছে এসে চেঁচাতে লাগল, 'ও ঠাকুর, ওঠো।

এরকম ধারা করছ কেন?' তখন কেউ কেউ বলল, 'ঠাকুর মারা গিয়েছেন।' দু-চারজন তো হাউ-মাউ করে কে'দে ফেলল।

যখন হট্টগোলটা ভালো করে জমে উঠেছে তখন রিয়োকোয়ান আস্তে আস্তে চোখ মেললেন। ছেলেরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। যাক্, ঠাকুর তাহলে মারা যাননি। সবাই তখন তাঁর আস্তিন ধরে ঝুলোঝুলি করে চে'চাতে লাগল, 'ঠাকুর মরে যাননি, ঠাকুর বে'চে আছেন।'

রায়োর কথা সবাই তখন ভুলে গিয়েছে। কানামাছি খেলা আরম্ভ হয়েছে। ঠাকুরও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

ফিশার আরও বহু কিংবদন্তী উদধৃত করে তাঁর পুস্তিকাখানি সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে তুলেছেন। সেগুলো থেকে দেখা যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিয়োকোয়ান বয়স্ক লোকের সংসর্গ ত্যাগ করে ক্রমেই ছেলে-মেয়ে, প্রকৃতি আর প্রাণিজগৎ নিয়ে দিন যাপন করেছেন। কিংবদন্তীর চেয়ে রিয়োকোয়ানের কবিতাতে তাঁর এই পরিবর্তন চোখে পড়ে বেশী।

বস্তুতঃ, রিয়োকোয়ানের জীবনী আলোচনার চেয়ে বহু গুণে শ্রেয় তাঁর কবিতা পাঠ। কিন্তু তিনি তাঁর কবিতা লিখেছেন এমনি হাল্কা তুলি দিয়ে যে তার অনুবাদ করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কোনো প্রকৃত সমঝদার যদি এই গুরুভার গ্রহণ করেন তবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখা সার্থক হবে।

মহাপরিনির্বাণ

ভিক্ষুণী তেইশা রিয়োকোয়ানের শিষ্যা ছিলেন সে-কথা এ জীবনীর প্রথম ভাগেই বলা হয়েছে। রিয়োকোয়ানের শরীর যখন তেহাত্তর বৎসর বয়সে জরা-জীর্ণ, তখন তিনি খবর পেলেন শ্রমণের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। সংবাদ পেয়ে তেইশা গুরুর পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন।

সেই অবসন্ন শরীর নিয়ে শ্রমণ যে মধুর কবিতাটি রচনা করেছেন তার থেকে আমরা তাঁর স্পর্শ-কাতর হৃদয়ের খানিকটা পরিচয় পাই,—

নয়ন আমার যার লাগি ছিল তৃষাতুর এত দিন
ভুবন ভরিয়া আজ তার আগমন,
তারই লাগি মোর কঠোর বিরহ মধুর বেদনা ভরা
তারই লাগি মোর দিন গেল অগণন।
এত দিন পরে মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে আজ
শান্তি বিরাজে ঝঞ্ঝা-মথিত ক্ষুব্ধ হৃদয়-মাঝ।

শেষ দিন পর্যন্ত তেইশা রিয়োকোয়ানের সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন। গুরুর মন প্রসন্ন রাখার জন্য তেইশা সব সময়ই হাসিমুখে থাকতেন, কিন্তু আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ভিক্ষুণী কতটা কাতর হয়ে পড়েছিলেন ফিশার তাঁর পুস্তকে সে-বেদনার কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেন।

শেষ মুহূর্ত যখন প্রায় এসে উপস্থিত তখনো রিয়োকোয়ান তাঁর হৃদয়াবেগ কবিতার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন;—

নলিনীর দলে শিশিরের মত মোদের জীবন, হায়—
শূন্যগর্ভ বাতাহত হয়ে চলিছে সম্মুখ পানে।
আমার জীবন তেমনি কাটিল, এবার হয়েছে শেষ
কাঁপন লেগেছে আমার শিশিরে—চলে যাবে কোন্‌খানে।

রিয়োকোয়ান শান্ত ভাবে শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু ভিক্ষুণী তেইশার নারী-হৃদয় যে কতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল, সে-কথা তেইশার ঐ সময়ের লেখা কবিতাটি থেকে বোঝা যায়;—

গভীর দুঃখে হৃদয় আমার সান্ত্বনা নাহি মানে
এ মহাপ্রয়াণ দুর্দমনীয় বেদনা বক্ষে হানে
সাধনায় জানি, জীবন মৃত্যু প্রভেদ কিছুই নেই
তবুও কাতর বিদায়ের ক্ষণ সমুখে আসিল যেই।

এ কবিতা পড়ে আমাদের মত গৃহী একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ে। সর্বস্ব ত্যাগ করে, আজীবন শান্তির সন্ধান করার পরও যদি ভিক্ষুণীরা এ-রকম কথা বলেন তবে আমরা যাব কোথায়? আমরা তো আশা করেছিলুম, দুঃখের আঘাত সয়ে সয়ে কোনো গতিকে শেষ পর্যন্ত হয়ত আত্মজনের চিরবিচ্ছেদ সহ্য করার মত খানিকটা শক্তি পাব, কিন্তু তার আর ভরসা রইল কোথায়? ঋষি বলেছেন, 'একমাত্র বৈরাগ্যেই অভয়,' কিন্তু তেইশার কবিতা পড়ে মানুষের শেষ আশ্রয় বৈরাগ্য সম্বন্ধেও নিরাশ হতে হল।

জানি, এ কবিতা পড়ে রিয়োকোয়ান উত্তরে লিখেছিলেন—

রক্তপদ্মপত্রের মত মানব জীবন ধরে,
একে একে সব খসে পড়ে ভূমি পরে
ঝরার সময় লাগে তার গায়ে যে ক্ষুদ্র কম্পন
সেই তো জীবন।

কিন্তু রিয়োকোয়ান তো ও-পারের যাত্রী—তাঁর দুঃখ কিসের? বিরহ-বেদনা তো তাদের তরেই, যারা পিছনে পড়ে রইল।

"—কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা?" (রবীন্দ্রনাথ)।

তাই ফিশার বলেন, 'শত শত লোক শ্রমণের শব-যাত্রার সঙ্গে গিয়েছিল। আর যে সব অগণিত ছেলে-মেয়ের সঙ্গে তিনি খেলা-ধুলো করেছিলেন, তারাই যেন শ্রমণের শোকসন্তপ্ত বিরাট পরিবার।'

ফিশার তাঁর পুস্তিকা শেষ করেছেন রিয়োকোয়ানের সর্বশেষ কবিতাটি উদ্ধৃত করে,—

চলে যাবো যবে চিরতরে হেথা হতে
স্মৃতির লাগিয়া কী সৌধ আমি গড়ে যাবো কোন্ পথে?
কিন্তু যখন আসিবে হেথায় ফিরে ফিরে মধু ঋতু
পেলব-কুসুম মুকুলিত মঞ্জরি
নিদাঘের দিন স্বর্ণ-রৌদ্রে ভরা
কোকিল কুহরে, শরৎ-পবন গান গায় গুঞ্জরি
রক্তপত্র সর্ব অঙ্গে মেপল লইবে পরে
এরাই আমার স্মৃতিটি রাখিবে ধরে।
এরাই তখন কহিবে আমার কথা
ফুল্লকুসুম মুখর কোকিল যথা
রক্তবসনা দীপ্তা মেপল শাখা
প্রতিবিম্বিত আমার আত্মা—এদেরই হিয়ায় আঁকা॥

ফুটবল

'পরশুরামের' কেদার চাটুয্যে মশাই দূর থেকে বিস্তর মেমসাহেব দেখেছিলেন; আমিও দূর থেকে বিস্তর সিনেমা-স্টার, পলিটিশিয়ান আর ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছি। দেখে ওদের প্রতি ভক্তি হয়েছে এবং গদ গদ হয়ে মনে মনে ওঁদের পেন্নাম জানিয়েছি।

তাই কি করে যে 'ইস্ট বেঙ্গল' ক্লাবের কয়েকজন খেলোয়াড় এবং ম্যানেজার মশায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল তার সঠিক ব্যাখ্যা আমি এখনো সমঝে উঠতে পারিনি। তবে শুনেছি আমরা যে-রকম খাঁচার ভিতর সিংহ দেখে খুশী হই, সিংহটাও নাকি আমাদের দিকে কৌতূহলের সঙ্গে তাকায়—তার বিশ্বাস মানুষকে নাকি জড়ো করা হয় নিছক তাকে আনন্দ দেবার জন্য, যে-দিন লোকের সংখ্যা কম হয় সেদিন নাকি সিংহ রীতিমত মন-মরা হয়ে যায়। (আরো শুনেছি, একটা খাঁচার গোটাকয়েক শিক ভেঙে যাওয়াতে গরিলা নাকি দস্তুরমত ভয় পেয়ে গিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল—তার বিশ্বাস ছিল খাঁচাটার উদ্দেশ্য তাকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য।)

তাই যখন 'ইস্ট বেঙ্গলের' গুটিকয়েক রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমার দিকে তাকালেন তখন আমি খুশী হলুম বই কি। তারপর তাদের মাধ্যমে আর সক্কলের সঙ্গেও মোলাকাত হয়ে গেল। সব কটি চমৎকার ভদ্রসন্তান, বিনয়ী এবং নম্র। আমি বরঞ্চ সদম্ভে তাঁদের শুনিয়ে দিলুম ছেলেবেলায় 'বী' টীমের খেলাতে কি রকম কায়দাসে একখানা গোল লাগিয়ে দিয়েছিলুম, অবশ্য সেটা সুইসাইড্ গোল ছিল।

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁদের খেলা দেখতে যাবো কি না? বললুম, ফাইনালের দিন নিশ্চয়ই দেখতে যাবো। ম্যানেজার বললেন, তা হলে তো যে-করেই হোক ফাইনাল পর্যন্ত উঠতে হবে—বিবেচনা করুন, একমাত্র নিতান্ত আমাকে খুশী করার জন্যই তাদের কী বিপুল আগ্রহ!

ফাইনালের দিন ম্যানেজার আমাকে আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

দিল্লীতে ফুটবলের কদর কম। খেলা আরম্ভ হওয়ার পনরো মিনিট পূর্বে গিয়েও দিব্য সীট পাওয়া গেল। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম আমার এক চ্যালাকে—শিটিফিটি দেওয়ার জন্য। পরে দেখলুম, ওসব পারে না, সে জন্মেছে পশ্চিমে। বললুম, 'আরে বাপু, মুখে আঙ্গুল পুরে যদি হুইসিলই না দিতে পারিস

তবে ফুটবল খেলা দেখতে এসেছিস কেন? রবিঠাকুরের 'ডাকঘর' দেখতে গেলেই পারিস।'

খেলা দেখতে এসেছে বাঙালী—তাদের অধিকাংশ আবার পদ্মার ও-পারের—আর মিলিটারি; এই দুই সম্প্রদায়। মিলিটারি এসেছে গোর্খা টীমকে সাহস দেবার জন্য, আর আমরা কি করতে গিয়েছি সে-কথা তো আর খুলে বলতে হবে না। অবশ্য আমাদের ভিতর যে 'মোহনবাগান' কিংবা 'কালীঘাট' ফ্যান্ ছিলেন না সে-কথা বলবো না, তবে কলকাতা থেকে এত দূর বিদেশে তাঁরা তো আর গোর্খাদের পক্ষ নিতে পারেন না। 'দোস্ত নীস্ত, লেকিন দুশমন-ই-দুশমন হস্ত' অর্থাৎ 'মিত্র নয়, তবে শত্রুর শত্রু' এই ফাসী প্রবাদ সর্বত্র খাটে না।

পিছনে দুই সর্দারজী বড্ড ভ্যাচর ভ্যাচর করতে লাগল। ইস্ট বেঙ্গল নাকি ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছে নিতান্ত লাক্‌সে (কপাল জোরে), ওরা নাকি বড্ড রাফ্ খেলে (সবুট গোর্খার সঙ্গে রাফ্ খেলবে ইস্ট বেঙ্গল!) আর পদে পদে নাকি অফ-সাইড্। ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে দু'ঘা বসিয়ে দি কিন্তু তার বপুটা দেখে সাহস হল না।

খেলার পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় হল ইস্ট বেঙ্গল নিশ্চয়ই জিতবে। দশ মিনিটের ভিতর গোর্খারা গোটা চারেক ফাউল করলে আর ইস্ট বেঙ্গল গোটা তিনেক গোল দেবার মোকা নির্মমভাবে মিস্ করলে। একবার তো বলটা গোল-বারের ভিতরে লেগে দুম করে পড়ে গেল গোল লাইনের উপর। গোলি সেটা তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেললে। আমি দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে বললুম, 'হে মা কালী, বাবা, মৌলা আলী তোমাদের জোড়া পাঁঠা দেব, কিন্তু এরকম আস্কারা দিয়ো মস্কোরা কোরো না, মাইরি।' বলেই মনে পড়ল 'মাইরি' কথাটা এসেছে 'মেরি' থেকে। থুড়ি থুড়ি বলে 'দুর্গা, দুর্গা, দুর্গতি-নাশিনী'কে স্মরণ করলুম।

হাফ-টাইম হতে চললো গোল আর হয় না—এ কী গব্বযন্তনা রে, বাবা! ওদিকে অবশ্য ফাউলের সংখ্যা কমে গিয়েছে—রেফারি দেখলুম বেজায় দড় লোক। কেউ ফাউল করলে তার কাছে ছুটে গিয়ে বেশ দু'কথা শুনিয়েও দেয়। জীতা রহো বেটা! ফাউলগুলো সামলাও, তারপর ইস্ট বেঙ্গলকে ঠ্যাকাবে কেডা?

নাঃ, হাফ-টাইম হয়ে গেল। খেলা তখনো আঁটকুড়ী—গোল হয়নি।

ওহে চানাচুর বাদাম-ভাজা, এদিকে এসো তো বাবা। নাঃ থাক, শরবতই খাই। চেঁচাতে চেঁচাতে গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে। চ্যালাই পয়সাটা দিলে; তা দেবে না? যখন হুইসিল দিতে জানে না। রেফারি আর ক'বার হুইসিল বাজালে? সমস্তক্ষণ তো বাজালুম আমিই।

হাফ-টাইমের পর খেলাটা যদি দেখতেন। গপাগপ আরম্ভ হল পোলো দিয়ে রুই ধরার মত গোল মারা।

আমি তো খেলার রিপোর্টার নই তাই কে যে কাকে পাস করলে, কে কতখানি প্যাটার্ণ উইভ করলে, কে ক'জন দুশমনকে নাচালে লক্ষ্য করিনি তবে এটা পষ্ট দেখলুম, বলটাই যেন মনস্থির করে ফেলেছে, সবাইকে এড়িয়ে গোর্খার গোলে ঢুকবেই ঢুকবে। একে পাশ কাটিয়ে, ওর মাথার উপর দিয়ে, কখনো বা তিন কদম পেঁছিয়ে গিয়ে, কখনো বা কারো দু'পায়ের মধ্যিখানের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ দেখি বলটা ধাঁই করে হাওয়ায় চড়ে গোর্খা গোলের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদপিণ্ডটা এক লম্ফ দিয়ে টনসিলে এসে আট্‌কে গিয়েছে—বিকৃতস্বরে বেরল, 'গো——অ——অ——ল!' ('রূপদর্শী' দ্রষ্টব্য)।

ফুটবলী ভাষায় একটি তীব্র 'সটের'র ('Sot'—not 'shot') ফলে গোলটি হল।

পিছনের সর্দারজী বললেন, 'ইয়ে গোল বচানা মুশকিল্ নহী থা।'

আমি মনে মনে বললুম, 'সাহিত্যে একে আমরা বলি, 'মুখবন্ধ'। এরপর আরো গোটা দুই হলে তোমার মুখ বন্ধ হবে।' লোকটা জোরোলো না হলে—।

এ সব ভাবাভাবির পূর্বেই আরেকখানা সরেস গোল হয়ে গিয়েছে। কেউ দেখলো, কেউ না। একদম বেমালুম। তারই ধকল কাটাতে কাটাতে আরেকখানা, তিসরা অতিশয় মান-মনোহর গোল। সেটি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। ও গোল কেউ বাঁচাতে পারতো না। দশটা গোলি লাগিয়ে দিলেও না।

এবারে ম্যানেজারকে অভিনন্দন জানানো যেতে পারে। উঠে গিয়ে তাকে জোর শ্যাকহ্যাণ্ড করলুম। ভারী খুশী। আমায় বললে, 'প্রত্যেক গোলে আপনার রি-একশন লক্ষ্য করছিলুম। আমরা আমাদের কথা রেখেছি (অর্থাৎ ফাইনালে উঠেছি) আর আপনিও আপনার কথা রেখেছেন (আমি কথা দিয়েছিলুম ওরা ফাইনাল জিতবেই)।' তার সঙ্গী তো আমার হাতখানা কপালে ঠেকালে।

মোরগ যে রকম গটগট করে গোবরের ঢিপিতে ওঠে আমি ঠিক তেমনি আমার চেয়ারে ফিরে এলুম। ভাবখানা, তিনটে গোলই যেন নিতান্ত আমিই দিয়েছি।

তারপর শাঁ করে আরো একখানা।

দশ বারো মিনিটের ভিতর ধনাধন চারখানা আদি ও অকৃত্রিম, খাঁটি, নির্ভেজাল গোল!

পিছনের সর্দারজী চুপ।

চ্যালাকে বললুম, 'চলো বাড়ী যাই। খেলা কি করে জিততে হয়, হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলুম তো!'

রাত্রে সব খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাতে গেলুম। গিয়ে দেখি এক ঢাউস ট্রফি। সঙ্গে আরেকটা বাচ্চা। বললুম, 'বাচ্চাটাই ভালো। বড়টা রাখা শক্ত (উভয়ার্থে)।'

ওদের-ই বিস্তর নাইন-নাইন্টি-নাইন পুড়িয়ে বাড়ী ফিরলুম।

বেমক্কা

বন্ধুবর

গুলাম কুদ্দুসকে—

লোকসঙ্গীত ও বিদগ্ধ সঙ্গীতে যে পার্থক্য সেটা সহজেই আমাদের কানে ধরা পড়ে, তেমনি লোকসাহিত্য ও বিদগ্ধ সাহিত্যের পার্থক্য সম্বন্ধেও আমরা বিলক্ষণ সচেতন। আর্টের যে-কোনো বিভাগেই—নাট্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য—তা সে যাই হোক না কেন, এই বিদগ্ধ এবং লোকায়ত রসসৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যটা আমরা বহুকাল ধরে করে আসছি।

তাই বলে লোকসঙ্গীত কিম্বা গণ-সাহিত্য নিন্দনীয় এ-কথা কোনো আলঙ্কারিকই কখনো বলেন নি। বাউল ভাটিয়ালি বর্বরতার লক্ষণ কিম্বা বারমাসী যাত্রাগান রসসৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না, এ-কথা বললে আপন রসবোধের অভাব ঢাক পিটিয়ে বলা হয় মাত্র।

কিন্তু যখন এই লোকসঙ্গীত বা লোকনৃত্য শহরের মাঝখানে স্টেজের উপর সাজিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাড়ম্বরে শোনানো এবং দেখানো হয়, তখনই আমাদের আপত্তি। যখনই বলা হয় এই সাঁওতাল নাচের সামনে ভরত নৃত্যম হার মানে কিম্বা বলা হয় এই 'রাবণবধ' পালা 'ডাকঘরের' উপর ছক্কা-পাঞ্জা মেরেছে—তোমরা অতিশয় বেরসিক বর্বর বুর্জুয়া বলে এ তত্ত্বটা বুঝতে পারছো না, তখন নিরীহ বুর্জুয়া হওয়া সত্ত্বেও আপত্তি না করে থাকতে পারিনে।

কথাটা খুলে বলি। লোকসঙ্গীত (এবং বিশেষতঃ গণ-নৃত্য) ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পার্থক্য অনেক জায়গায় আছে, কিন্তু একটা পার্থক্য এস্থলে বলে নিলে আমার প্রতিবাদের মূল তত্ত্বটা পাঠক সহজেই ধরে নিতে পারবেন। এই ধরুন সাঁওতাল কিম্বা গুজরাতের গরবা নাচ। এগুলো গণ-নৃত্য এবং এর সবচেয়ে বড় জিনিস এই যে, ঐ-নাচে সমাজ বা শ্রেণীর সকলেই হিস্যাদার।

চাঁদের আলোতে, না-ঠাণ্ডা না-গরম আবহাওয়াতে জনপদবাসী যখন দু'দণ্ড ফুর্তিফার্তি করতে চায়, তখন তারা সকলেই নাচতে শুরু করে। যাদের হাড় বড্ড বেশী বুড়িয়ে গিয়েছে তারা ঘরে শুয়ে থাকে, কিন্তু যারা আসে তাদের কেউই নাচ থেকে বাদ যায় না। হয় নাচে, না হয় ঢোল বাজায়—বাচ্চা কোলে নিয়ে আধ-বয়সী মা'দেরও নাচের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। তাই বলা যেতে পারে সাঁওতাল কিম্বা গরবা নাচ—অর্থাৎ তাবৎ গণ-নৃত্যই—নাচা হয় আপন আনন্দের জন্য, লোককে দেখানোর জন্য কিম্বা 'লোক-দেখানোর' জন্য নয়। অর্থাৎ লোকনৃত্যে দর্শক থাকে না।

কিন্তু যখন উদয়শঙ্কর নাচেন তখন আমরা সবাই ধেই ধেই করে নেচে উঠিনে, কিম্বা যখন খানসাহেব চোখ বন্ধ করে জয়জয়ন্তী ধরেন তখন আমরা আর সবাই চেল্লাচেল্লি করে উঠিনে। ইচ্ছে যে একদম হয় না সে-কথা বলতে পারিনে, তবু যে করিনে তার একমাত্র কারণ উদয়শঙ্করের সঙ্গে পা মিলিয়ে কিম্বা খান সাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রসসৃষ্টি আমরা এক মুহূর্তের তরেও করতে পারিনে। (যদি পারতুম তবে উদয়শঙ্করের নাচ দেখবার জন্য, খান সাহেবের গান শোনবার জন্য গাঁঠের পয়সা খরচ করতুম না—কিম্বা বলতে পারেন, সিংগীর গলায় আপন মাথা ঢোকাতে পারলে সার্কাসে যেতুম না)।

তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কিম্বা নৃত্যের জন্য শ্রোতা এবং দর্শকের প্রয়োজন।

লোকনৃত্যে যখন সবাই হিস্যা নিতে পারে আপন পা চালিয়েই, তখন এ-কথা আশা করি সকলেই মেনে নেবেন যে সে নৃত্য খুব সরল হওয়াই স্বাভাবিক। তাতে সূক্ষ্ম পায়ের কাজ থাকার কথা নয়, ভাবভঙ্গী প্রকাশের জন্য দুর্বোধ্য মুদ্রা সেখানে থাকতেই পারে না এবং তাই বলা যেতে পারে, সে নৃত্যে আর যা থাকে থাকুক, বৈচিত্র্য থাকতে পারে না।

তাই গণ-নৃত্য মাত্রই একঘেয়ে।

কম্যুনিস্ট ভায়ারা (কমরেডরা) মনস্থির করেছেন গণ-কলা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কলা এবং সেই গণ-নৃত্য শহরে বুর্জুয়াদের দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। তাই বহু মেহন্নত, ততোধিক তকলিফ বরদাস্ত করে তাঁরা শহরে স্টেজ খাটান, পর্দা ঝোলান, রঙ-বেরঙের আলোর ব্যবস্থা করেন আর তারপর চালান হৈদ্রাবাদী কিম্বা কুয়াম্বতুরেরও হতে পারে,—জানিনে, ধোপার নাচ। কিম্বা গুজরাতি গরবা। বলেন, 'পশ্য, পশ্য'—থুড়ি, 'দ্যাখ, দ্যাখ, এরেই কয় লাচ'।

পূর্বেই নিবেদন করেছি গণ-নৃত্য নিন্দনীয় নয়, কিন্তু যে গণ-নৃত্য একঘেয়ে এবং বৈচিত্র্যহীন হতে বাধ্য, সেই নাচ দেখতে হবে ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে? ঘন ঘন হাততালি দিয়ে বলতে হবে 'মরি, মরি'? দু-চার মিনিটের তরে যে এ নাচ দেখা যায় না, সে-কথা বলছিনে।

আলো-অন্ধকারে ভিন্ গাঁয়ে যাচ্ছেন, দেহ ক্লান্ত মন অবসন্ন, চাঁদ উঠি

উঠি করেও উঠছেন না—এমন সময় দেখতে পেলেন গাঁয়ের মন্দিরের আঙিনায় একপাল মেয়ে মাথায় ছ্যাঁদা-ওলা কলসীতে পিদিম রেখে চক্কর বানিয়ে ধীরে ধীরে মন্দ-মধুর পা ফেলে ফেলে নাচছে। জানটা তর হয়ে গেল। দু' মিনিট দাঁড়িয়ে আলোর নাচ আর মেয়েদের গান, 'সোনার দেওর, আমার হাত রাঙাবার জন্য মেহেদি এনেছ কি?' দেখে নিলেন। কিন্তু তারপর? যে নাচ আস্তে আস্তে বিকাশের দিকে এগিয়ে যায় না, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, পদবিন্যাসের ভিতর দিয়ে যে নাচ পরিসমাপ্তিতে পৌঁছয় না, সে নাচ দেখবেন কতক্ষণ ধরে? এ-নাচের পরিসমাপ্তি কোনো রসসৃষ্টির আভ্যন্তরীণ কারণে হয় না, এর পরিসমাপ্তি হয় নর্তকীরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখনই।

আলো-অন্ধকার, চাঁদ উঠি উঠি, শ্যাওলামাখা ভাঙা দেউলের পরিবেশ থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে-আসা নৃত্য শহরের স্টেজে মূর্চ্ছা তো যান বটেই, তার উপর মাইক্রোফনযোগে চীৎকার করে তারস্বরে আপনাকে বলা হয় 'এ নাচ বড় উমদা নাচ—' এ নাচ আপনাকে দেখতে হয় আধঘণ্টা ধরে! আধঘণ্টা ধরে দেখতে হয় সেই নাচ, যার সর্ব পদবিন্যাস মুখস্ত হয়ে যায় আড়াই মিনিটেই।

পনরো টাকার সীটে বসে (টাকাটা দিয়েছিলেন আমার এক গোলাপী অর্থাৎ নিম-কম্যুনিষ্ট কমরেড) আমি আর থাকতে না পেরে মুখে আঙুল পুরে শিটি দিয়েছিলুম প্রাণপণ। হৈ হৈ রৈ রৈ। মার মার কাট কাট। এ কী বর্বরতা?

আমি বললুম, 'কেন বাওয়া, আপত্তি জানাবার এই তো প্রলেটারিয়েটেষ্ট অব দি প্রলেটারিয়েট কায়দা।'

আমরা হাসি কেন?

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে কবিগুরু বিশ্বভারতী সাহিত্য-সভায় এক খ্যাতনামা লেখকের সদ্য-প্রকাশিত একটি রচনা পাঠ করেন। রচনার আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল 'আমরা হাসি কেন?'

এতদিন বাদে আজ আর সব কথা মনে নেই, তবে এইটুকু স্পষ্ট স্মরণে পড়ছে যে, বের্গসন হাসির কারণ অনুসন্ধান করে যে সব তত্ত্বকথা আবিষ্কার করেছিলেন, প্রবন্ধটি মোটের উপর তারই উপর খাড়া ছিল।

প্রবন্ধ পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ আপন বক্তব্য বলেন।

সভায় উপস্থিত অন্যান্য গুণীরাও তখন নানারকম মতামত দেন এবং সবাই মিলে প্রাণপণ অনুসন্ধান করেন, 'আমরা হাসি কেন?' যতদূর মনে পড়ছে, শেষ পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পাকাপাকি কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

পর দিন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন সভার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'হাসির

কারণ বের করতে গিয়ে সকলের চোখের জল বেরিয়ে গিয়েছিল।' (ঠিক কি ভাষায় তিনি জিনিসটে রসিয়ে বলেছিলেন আজ আর আমার সম্পূর্ণ মনে নেই—আশা করি আচার্য অপরাধ নেবেন না)।

দিল্লীর ফরাসিস ক্লাবের ('সের্কল ফ্রাসে' অর্থাৎ 'ফরাসী-চক্র') এক বিশেষ সভায় মসিয়ে মার্তে নামক এক ফরাসী গুণী গত বুধবার দিন ঐ একই বিষয় নিয়ে অর্থাৎ 'আমরা হাসি কেন?' একখানা প্রামাণিক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ফরাসী রাজদূত এবং আরো মেলা ফরাসী জাননেওলা ফরাসী অফরাসী ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। ফরাসী কামিনীগণ সর্বদাই অত্যুত্তম সুগন্ধ ব্যবহার করেন বলে ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল আমি বুঝি প্যারিসে বসে আছি।

(এ কিছু নূতন কথা নয়—এক পূর্ববঙ্গবাসী শিয়ালদা স্টেশনে নেমেও

ল্যামা ইসটিশানে গাড়ির থনে
মনে মনে আমেজ করি
আইলাম বুঝি আলী-মিয়ার রঙমহলে
ঢাহা জেলায় বশ্যাল ছাড়ি।)

শুধু প্যারিস নয় আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন 'কোতি' 'উবিগাঁর' খুশবায়ের দোকানে বসে আছি।

ডঃ কেসকর উত্তম ফরাসী বলতে পারেন। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে প্রাঞ্জল ফরাসীতে বক্তার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সেই বের্গসন আর সেই চিরন্তন কারণানুসন্ধান, 'হাসি কেন?' আমি তো নাকের জলে চোখের জলে হয়ে গেলুম—ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে রকমধারা হয়েছিলুম—কিন্তু তবু কোনো হদিস মিলল না।

কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, এই দিল্লী শহর যে ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক মহানগরী হতে চলল সেইটেই বড় আনন্দের কথা।

এতদিন ধরে আমরা ইয়োরোপকে চিনতে শিখলুম ইংরেজের মাধ্যমে এবং তাতে করে মাঝে মাঝে আমরা যে মারাত্মক মার খেয়েছি, তার হিসেব-নিকেশ এখনো আরম্ভ হয়নি। একটা সামান্য উদাহরণ নিন।

ইংরেজের আইরিশ স্টু, মাটন রোস্ট আর প্লাম পুডিং খেয়ে খেয়ে আমরা ভেবেছি ইয়োরোপবাসী মাত্রই বুঝি আহারাদি বাবতে একদম হটেনটট।

তারপর যেদিন উত্তম ফরাসী রান্না খেলুম, তখন বুঝতে পারলুম, ক্রোয়াসাঁ রুটি কি রকম উপাদেয়, একটি মামুলি অমলেট বানাতে ফরাসী কতই না কেরদানি-কেরামতি দেখাতে পারে, পাকা টমাটো, কাঁচা শসা আর সামান্য লেটিসের পাতাকে একটুখানি মালমশলা লাগিয়ে কী অপূর্ব স্যালাড্ নির্মাণ করতে পারে। মাস্টার্ড, উস্টারসস আর বিস্তর গোল মরিচ না মাখিয়েও যে ইয়োরোপীয় রান্না গলাধঃকরণ করা যায় সেইটে হৃদয়ঙ্গম হল ফরাসী রান্না খেয়ে।

তাই আমার আনন্দ যে, ধীরে ধীরে একদিন ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত এ-দেশে বসেই হবে।

সের্কল ফ্রাসেঁ দিল্লীবাসীকে তার জন্য তৈরী করে আনছেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর মসিয়ো মার্তে কয়েকটি রসালো গল্প বলেন। তিনি যে অনবদ্য ভাষায় এবং তার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী সঞ্চালনে গল্পগুলো পেশ করেছিলেন সে জিনিস তো আর কালি-কলমে ওৎরাবে না—তাই গল্পটি পছন্দ না হলে মসিয়োর নিন্দা না করে দোষটা আমারই ঘাড়ে চাপাবেন।

এক রমণী গিয়েছেন এক সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। তিনি ডাক্তারের ঘরে ঢুকতেই ডাক্তার তাঁকে কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই আধ ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। অতি কষ্টে সুযোগ পাওয়ার পর রমণী বললেন, 'ডাক্তার, আমাকে অতশত বোঝাচ্ছেন কেন? আমি এসেছি আমার স্বামীর চিকিৎসা করাতে।'

ডাক্তার বললেন, 'ও! তাঁর কি হয়েছে?'

রমণী বললেন, 'ঠিক ঠিক বলতে পারবো না তবে এইটুকু জানি, তাঁর বিশ্বাস তিনি সীল মাছ!'

'বলেন কি? তা, তিনি এখন কোথায়?'

'তিনি বারান্দায় বসে আছেন।'

'তাঁকে নিয়ে আসুন তো; দেখি, ব্যাপারটা কি।'

ভদ্রমহিলা বাইরে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা সীল মাছ॥
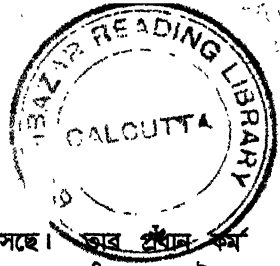
গাইড

দিল্লীতে একটি সরকারী ট্যুরিস্ট ব্যুরো বসেছে। তার প্রধান কর্ম ট্যুরিস্টদের সদুপদেশ দেওয়া, এটা-সেটা করে দেওয়া এবং বিচক্ষণ গাইডের তদারকিতে শহরের যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু দেখানো।

এই সম্পর্কে এক ভদ্রলোক খবরের কাগজে চিঠি লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন, দিল্লীতে বিচক্ষণ গাইডের বিলক্ষণ অভাব। আমি পত্রলেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

'পাণ্ডা' এবং 'গাইড' হরে দরে একই মাল। তীর্থস্থলের গাইডকে পাণ্ডা বলা হয়—তাই গয়াতে আপনি পাণ্ডা ধরেন, কিংবা বলুন, পাণ্ডা আপনাকে ধরে—আর ঐতিহাসিক ভূমি এবং তীর্থক্ষেত্রের যদি সমন্বয় ঘটে তবে সেখানে পাণ্ডা এবং গাইডের সমন্বয় হয়। যেমন জেরুজালেম। তিন মহা ধর্ম—ক্রীশ্চান, ইহুদী এবং মুসলমান—এখানে এসে সম্মিলিত হয়েছেন। তার উপর জেরুজালেমের অভেজাল ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। ফলে পৃথিবীর হেন দেশ হেন জাত নেই যেখান থেকে তীর্থযাত্রী (পাণ্ডার বলির পাঁঠা) এবং ট্যুরিস্ট (গাইডের কুরবানীর বকরী) জেরুজালেমে না আসে।

দিল্লী অনেকটা জেরুজালেমের মত। এর ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই, তীর্থের দিক দিয়ে এ জায়গা কম নয়। চিশতী সম্প্রদায়ের যে পাঁচ গুরু এদেশে মোক্ষলাভ করেছেন তাঁদের তিনজনের কবর দিল্লীতে। কুতব-মিনারের কাছে কুৎব উদ্-দীন বখতিয়ার কাকীর (ইনি ইলতুৎমিশ-অলতমশের গুরু) কবর, হুমায়ুনের কবরের কাছে নিজাম উদ্-দীন আওলিয়ার কবর (ইনি বাদশা আলা উদ্-দীন খিলজী এবং মুহম্মদ তুগলুকের গুরু) আর দিল্লীর বাইরে শেষ গুরু নাসির উদ্দীন 'চিরাগ-দিল্লী'র কবর। আর কালকাজী, যোগমায়া তো আছেনই।

এ সব জায়গার পাণ্ডারা যা গাঁজাগুল ছাড়ে সে একেবারেই অবর্ণনীয়। এদিকে বলবে এটা হচ্ছে আকবরের দুধ-ভাইয়ের কবর, ওদিকে বলবে, তিন হাজার বছরের পুরনো এই কবরের উপরকার এমারৎ!

বেঙ্গল কেমিকেলের আমার এক সুহৃদ্ গিয়েছিলেন বৃন্দাবন। পাণ্ডা দেখালে এক দোলনা—ভক্তি ভরে বললে, এ দোলায় দোল খেতেন রাধাকৃষ্ণ পাশাপাশি বসে। বন্ধুটি নাস্তিক নন, সন্দেহ-পিশাচ। বললেন, 'যে কড়ির সঙ্গে দোলনা ঝোলানো রয়েছে, তাতে তো লেখা রয়েছে, টাটা কোম্পানীর নাম; আমি তো জানতুম না, টাটা এত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান।'

পরদিন বৃন্দাবন থেকে সজল নয়নে বিদায় নেবার বেলা বন্ধু সে জায়গায় গিয়ে দেখেন, কড়িতে প্রাণপণ পলস্তরার পর পলস্তরা রঙ লাগানো হচ্ছে।

দিল্লীতে ভালো গাইডের সত্যই বড় অভাব। সখা এবং শিষ্য শ্রীমান বিবেক ভট্টাচার্য কপালী লোক। তিনি কখনো কখনো ভালো গাইড পেয়ে যান—সে বিষয়ে তিনি 'দেশে' মনোরম প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু সচরাচর আপনার কপালে এখানে যা গাইড জুটবে তারা না জানে ইতিহাস এবং না পারে ছাড়তে গাঁজা-গুল।

ভালো গাইড মানে কথকঠাকুর, আর্টিস্ট। তাঁর কর্ম হচ্ছে, ইতিহাস আর কিম্বদন্তী মিলিয়ে মিশিয়ে আপনাকে গল্পের পর গল্প বলে যাওয়া, আর সে সব গল্প শুনে আপনি এত খুশী যে দিনের শেষে তাকে পাঁচ টাকা দিতে আপনার বুক কচ কচ করে না।

একদা ভিয়েনা শহরে আমি এই রকম একটি গাইড পেয়েছিলুম। শহরের দ্রষ্টব্য বস্তু দেখাতে দেখাতে বললে, 'এই দেখুন শ্যোনব্রুন প্রাসাদ। রাজাধিরাজ ফ্রান্‌ৎস্‌য়োসেফ এখানে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখতেন পল্টনের কুচকাওয়াজ। দেশ-বিদেশের গেরেমভারী রাজকর্মচারী রাজদূতেরা হুজুরের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে দেখতেন আমাদের শৌর্য বীর্য আমাদের ঐশ্বর্য। তারপর হুজুর বেরতেন সোণার পাত-মোড়া গাড়িতে, বীবীসাহেবা বেরতেন রূপোর গাড়িতে। আহা, কোথায় গেল সে সব দিন!'

খানিকক্ষণ পর বাড়ি ফেরার পথে গাইড বলল, 'দেখুন, দেখুন এই ছোট্ট বাড়িখানা, ফ্রান্‌ৎস্‌য়োসেফ যে রকম রাজার রাজা ছিলেন, ঠিক তেমনি সঙ্গীতে রাজার রাজা বেটোফেন দৈন্যে-ক্লেশে কাতর হয়ে এই লজঝড় বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর শেষ কটি সিমফনি—সেই ত্রিলোকবিখ্যাত স্বর্গীয় সঙ্গীতসুধা কে না পান করেছে বলুন—তিনি এইখানেই রচেছিলেন।'

আমি করজোড়ে সে বাড়িকে নমস্কার করলুম দেখে গাইডের হৃদয়ে বিষাদে হরিষ দেখা দিল। ট্যাক্সিওলাকে বললে, 'একটুখানি চক্কর মেরে বেটোফেন যে বাড়িতে দেহ-ত্যাগ করেছিলেন সেইটে দেখিয়ে দাও।'

সে বাড়ির সামনে আমরা দুজনাই নিস্তব্ধ। এই জীর্ণ শীর্ণ দরিদ্র গৃহে রাজাধিরাজ বেটোফেন দেহত্যাগ করলেন!

আমরা বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ গাইড ট্যাক্সিওলাকে বললে, 'একটু তাড়াতাড়ি চালাও বাছা, ঐ পাশের বাড়িতে আমার শাশুড়ী থাকেন, খাণ্ডার রমণী, পাছে না দেখে ফেলে!'॥

আচার্য তুচ্চি

দিল্লীর ইণ্ডিয়ান কালচারেল এসোসিয়েশন গত শুক্রবার দিন ইতালির খ্যাতনামা অধ্যাপক জিয়োসেপ্পে তুচ্চিকে এক সভায় নিমন্ত্রণ করে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সভাস্থলে ইতালির রাজদূত ও শ্রীযুক্তা তুচ্চিও উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-তিব্বত-চীনের ইতিহাস এবং বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ এবং দেশদেশান্তরে তার প্রসার সম্বন্ধে আজকের দিনে অধ্যাপক তুচ্চির যে জ্ঞান আছে তার সঙ্গে বোধহয় আর কারোর তুলনা করা যায় না। বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে সব শাস্ত্র সংস্কৃতে লোপ পেয়ে গিয়েছে কিন্তু তিব্বতী এবং চীনা অনুবাদে এখনো পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে অধ্যাপক তুচ্চি নানাপ্রকারের তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে বৌদ্ধধর্মের যে ইতিহাস নির্মাণ করে যাচ্ছেন, সে ইতিহাস ভারতের গৌরব বর্ধন করে চলেছে। ঠিক বলতে পারব না কিন্তু অনুমান করি, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে তিনি এই কর্মে নিযুক্ত আছেন। তাঁর স্বাস্থ্য এখনো অটুট; তাই আশা করা যেতে পারে, তিনি আরো বহু বৎসর ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যার সেবা করতে পারবেন।

ইতালির ইস্কুলে থাকতেই তুচ্চি সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেন। কলেজে ঢোকার পূর্বেই তাঁর মহাভারত, রামায়ণ ও কালিদাসের প্রায় সব কিছুই পড়া হয়ে গিয়েছিল—টোলে না পড়ে এতখানি সংস্কৃত চর্চা এই ভারতেই ক'টি ছেলে করতে পেরেছে? কলেজে তুচ্চি সংস্কৃতের বিখ্যাত অধ্যাপক ফরমিকির সংস্রবে আসেন। অধ্যাপক ফরমিকির নাম এদেশে সুপরিচিত নয়, কিন্তু ইতালির পণ্ডিত মাত্রই জানেন, সে দেশে সংস্কৃত-চর্চার পত্তন ও প্রসারের জন্য তিনি কতখানি দায়ী। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ছিল অবিচল অনুরাগ এবং গভীর নিষ্ঠা। অধ্যাপক তুচ্চি তাঁর অন্যতম সার্থক শিষ্য।

অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি, উইনটারনিৎস ও লেসনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করে স্বদেশ চলে যাওয়ার পর এদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ করেন অধ্যাপক ফরমিকি এবং তুচ্চিকে। ১৯২৫এ এঁরা দুজন ভারতবর্ষে আসেন।

অধ্যাপক ফরমিকি শান্তিনিকেতনে সংস্কৃত পড়াবার সুযোগ পেয়ে বড় আনন্দিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, 'জানো, সমস্ত জীবনটা

কাটল ছাত্রদের সংস্কৃত ধাতুরূপ আর শব্দরূপ শিখিয়ে। রসিয়ে রসিয়ে কাব্য-নাট্য পড়ানো আরম্ভ করার পূর্বেই তাদের কোর্স শেষ হয়ে যায়—তারা তখন স্বাধীনভাবে সংস্কৃত-চর্চা আরম্ভ করে দেয়। জীবনে এই প্রথম শান্তি-নিকেতনে সুযোগ পেলুম পরিণত-জ্ঞান ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাব্যনাট্য পড়ার। ব্যাকরণ পড়াতে হচ্ছে না, এটা কি কম আরামের কথা!'

এবং আশ্চর্য, আমাদের মত মূর্খদেরও তিনি অবহেলা করতেন না। এবং ততোধিক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর—কঠিন জিনিস সরল করে বোঝাবার। সাংখ্য বেদান্ত তখনো জানতুম না, এখনো জানিনে, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে বসুমতী বেহ্নের বাড়ির বারান্দার মোড়াতে বসে সাংখ্য এবং বেদান্তের প্রধান পার্থক্য তিনি কি অদ্ভুত সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলেছিলেন। তিতিক্ষু পাঠক অপরাধ নেবেন না, যদি আজ এই নিয়ে গর্ব করি যে, অধ্যাপক ফরমিকি আমাকে একটুখানি স্নেহের চোখে দেখতেন। রাস্তায় দেখা হলেই, সাংখ্য বেদান্তের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বাজিয়ে নিতেন, যা শিখিয়েছেন আমার ঠিক ঠিক মনে আছে কি না।

হেমলেট চরিত্রের সাইকো-এনালেসিস ইয়োরোপে তিনিই করেন প্রথম। হেমলেট যে কেন প্রতিবারে তার কাকাকে খুন করতে গিয়ে পিছু-পা হত সে কথা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

গুরু পড়াতেন সংস্কৃত আর শিষ্য পড়াতেন ইতালিয়ান। অধ্যাপক তুচ্চির অন্যতম মহৎ গুণ, তিনি ছাত্রের মনস্তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে অধ্যাপনা করেন। আমরা একটুখানি ইতালিয়ান শিখে নিয়ে বললুম, এইবারে আমরা দানুন্‌দ্‌জিয়ো পড়ব।

তুচ্চি বললেন, 'উপস্থিত মাদ্‌জিনি পড়ো।'

তারপর বুঝিয়ে বললেন, 'তোমরা এখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছো। তোমাদের চিন্তাজগতে এখন স্বাধীনতা কি, স্বাধীনতা-সংগ্রাম কাকে বলে এই নিয়ে তোলপাড় চলছে। আর এসব বিশ্লেষণ মাদ্‌জিনি যে রকম করে গিয়েছেন, স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশবাসীকে তিনি যে রকম উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন এ রকম আর কেউ কখনো পারেননি। তোমাদের চিন্তা-ধারার সঙ্গে এগুলো মিলে যাবে, ভাষা-শেখাটাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে।'

হলও তাই। অধ্যাপক তুচ্চি শান্তসমাহিত গম্ভীর প্রকৃতির পণ্ডিত নন—তাঁর ধাঁচ অনেকটা ফরাসিস। অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে যান আর মাদ্‌জিনির ভুবন-বিখ্যাত বক্তৃতাগুলোতে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রচুরতম খোরাক রয়েছে তা যাঁরা মাদ্‌জিনি পড়েছেন তাঁরাই জানেন—এমনকি এই গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ও চার্চিল মাদ্‌জিনির বক্তৃতা আপন বক্তৃতায় কাজে লাগিয়েছেন। ...তুচ্চি

পড়াতে পড়াতে উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠতেন আর দিক্‌চক্রবালের দিকে হাত বাড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে মাদজিনির ভাষায় বলতেন,

"আভান্তি, আভান্তি\ও ফ্রাতেল্লি—"

"অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, হে ভ্রাতৃবৃন্দ—"

'আসবে সে দিন আসবে, যেদিন নবজীবনের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে তোমরা পিছন পানে তাকাবে—পিছনের সবকিছু তখন এক দৃষ্টিতেই ধরা পড়বে, তার কোনো রহস্যই তোমাদের কাছে তখন আর গোপন রইবে না; যেসব দুঃখবেদনা তোমরা একসঙ্গে সয়েছ সেগুলোর দিকে তাকিয়ে তোমরা তখন আনন্দের হাসি হাসবে।'

এসব সাহসের বাণী সর্বযুগের সর্বমানবের সুপরিচিত। আমরা যে উৎসাহিত হয়েছিলুম তাতে আর বিচিত্র কি?

তারপর দীর্ঘ সাতাশ বৎসর কেটে গিয়েছে। এর ভিতর অধ্যাপক তুচ্চি পাণ্ডুলিপির সন্ধানে ভারত-তিব্বত বহুবার ঘুরে গিয়েছেন এবং তাঁর পরিশ্রমের ফল ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার এবং ইতালীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

ইতালির প্রাচ্যবিদ্যামন্দির আচার্য তুচ্চির নিজের হাতে গড়া বললে অত্যুক্তি করা হয় না। শুধু যে সেখানে সংস্কৃত, পালির চর্চা হয় তাই নয়, বাঙলা, হিন্দী শেখাবার ব্যবস্থাও সেখানে আছে এবং চীনা, জাপানী, তিব্বতী ভাষার অনুসন্ধান করে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সেখানে লেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে তুচ্চি নিজে যেসব প্রাচীন পুস্তক প্রকাশ করেছেন, যেসব সারগর্ভ পুস্তক রচনা করেছেন, তার সম্পূর্ণ তালিকা দিতে গেলেই এ পত্রিকার আরো দু'কলমের প্রয়োজন হবে।

* * * *

সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আচার্য তুচ্চি বলেন, 'বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারত-ইতালিতে যে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগসূত্র স্থাপিত ছিল সে কথা আপনারা সকলেই জানেন (দক্ষিণ-ভারতে আজও প্রতি বৎসর বহু রোমান মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়) কিন্তু সেইটেই বড় কথা নয়। ভারত-ইতালির আত্মায় আত্মায় যে ভাব বিনিময় হয়েছিল সেইটেই সবচেয়ে মহান তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বানুসন্ধান করে নূতন করে আমাদের ভাবের লেনদেন, আদানপ্রদান করতে হবে।

'আমি ইতালিতে যে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছি সেটিকে সফল করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।'

* * * *

আমরা একবাক্যে বলি ভগবান আচার্য তুচ্চিকে জয়যুক্ত করুন॥

নিশীথদা

কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র, খ্যাতনামা ব্যারিস্টার, নিঃস্বার্থ দেশ-সেবক শ্রীযুত নিশীথচন্দ্র সেন ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এদেশের বহু গুণী-জ্ঞানী, বহু প্রখ্যাত কর্মী তাঁর সংস্রবে এসেছিলেন—এমন কি, একথা বললে ভুল বলা হবে না যে, দেশসেবা করেছেন, কিন্তু শ্রীযুত নিশীথ সেনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি, এরকম লোক বাঙলা দেশ দেখেনি। তাই নির্ভয়ে বলতে পারি, কৃতী নিশীথ সেনের কর্মজীবনের প্রশস্তি কীর্তন করার লোকের অভাব হবে না।

আমি কিন্তু নিশীথদাকে সেভাবে চিনিনি। আমি তাঁকে পেয়েছিলুম বন্ধুরূপে, তাঁর জীবন-অপরাহ্নে। তিনি তখন কলকাতার ভিতর-বাইরে এতই সুপরিচিত যে প্রথম আলাপের দিন কেউই আমাকে বুঝিয়ে বলল না, নিশীথ সেন বলতে কি বোঝায়। তারপর নানা রকম গাল-গল্পের মাঝখানে কে যেন আমাকে বলল, 'আনন্দবাজারে যে ইংরেজকে কটু-কাটব্য আরম্ভ করেছ (আমি তখন 'সত্যপীর' নাম নিয়ে ঐ কাগজে কলমে ধার দিচ্ছি) তার আগে খবর নিয়েছ কি, 'সিডিশন', 'ডিফেমেশন', 'মহারাণীর বিরুদ্ধে লড়াই' এসব জিনিসের অর্থ কি?' আমি কোনো কিছু বলবার আগেই নিশীথ সেন বললেন, 'আমরাই জানিনে, উনি জানবেন কি করে? আপনি তো দর্শনে ডক্টর, না?' আমি সবিনয়ে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' নিশীথ সেন আমার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'ইংরেজ তার সমালোচককে জেলে ঠেলবার জন্য যেসব আইন-কানুন বানিয়েছে, সেগুলো কোন্ স্থলে প্রযোজ্য, কাকে সেই ডাণ্ডা দিয়ে ঠ্যাঙানো যায়, তার টীকাটিপ্পনি, নজীর-দলিল ইংরেজ আপন হাতেই রেখেছে। সুবিধে মত কখনো সেটা টেনে টেনে রবারের মত লম্বা করে, কখনো ফাঁদ ঢিলে করে পাখীকে উড়ে যেতেও দেয়। এই দেখুন না, লোকমান্য টিলককে যে আইনের জোরে জেলে পুরল, সে আইন ওরকমধারা কাজে লাগানো যায়, সে কথা একেবারে আনাড়ি উকিলও মানবে না। তবু টিলককে তো জেলে যেতে হল। তাই সিডিশন কিসে হয় আর কিসে হয় না, সেকথা ঝানু উকিলরা পর্যন্ত আগেভাগে বলতে পারে না। ইংরেজ যদি মনস্থির করে আপনাকে আলীপুর পাঠাবে তবে সে তখন আপনার বিরুদ্ধে অনেক নূতন-পুরাতন আইন বের করবে। আমরা—অর্থাৎ উকিল-ব্যারিস্টাররা—তখন তার বিরুদ্ধে লড়ি, সব সময়ে যে হারি, তাও বলতে পারিনে।' তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আমার ফোন নম্বরটা জানেন তো? কোনো অসুবিধে হলে ফোন করবেন। আমি যা পারি করে দেব।'

প্যারীদা কান পেতে শুনছিল, লক্ষ্য করিনি। তক্ষুণি বললে, 'নম্বরটা টুকে নাও হে, আলী। কাজে লাগবে।'

পরে খবর নিয়ে জানতে পারলুম, নিশীথদা কত বড় ডাকসাঁইটে ব্যারিস্টার এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেই আলীপুরের আমল থেকে আজ পর্যন্ত পাঁজ-জনের জানাঅজানাতে কত অসংখ্যবার ফীজ না নিয়ে বিপ্লবীদের জন্য লড়েছেন। লোকটির প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠলো।

কিন্তু থাক এসব কথা। পূর্বে নিবেদন করেছি, এসব কথা গুছিয়ে বলবার জন্য লোকের অভাব হবে না।

নিশীথদা প্রায় আমার বাপের বয়সী ছিলেন, কিন্তু কি করে তিনি যে একদিন দাদা হয়ে গেলেন এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, তাঁকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করে দিয়েছি সে শুধু যাঁরা নিশীথদাকে চিনতেন, তাঁরাই বলতে পারবেন।

একই প্লেনে শিলং গেলুম, সেখানে প্যারীদার বাড়িতে উঠলুম। সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে আমার ঘরে ঢুকে খাটের একপাশে বসে বললেন, 'কবি (বিশ্ব সাক্ষী, আমি কবি নই) চমৎকার ওয়েদার, বাইরে এসো।' বাইরে মুখোমুখি হয়ে বসলুম। তিনি নানা রকমের প্রাচীন কাহিনী বলে যেতে লাগলেন; অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন বাঁড়ুয্যে, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ মুখুয্যে, আব্দুর রসুল এ'দের সম্বন্ধে এমন সব কথা বললেন, যার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, কতখানি পাণ্ডিত্য, কত গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকলে পরে মানুষ এত সহজে বাঙলা দেশের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস এবং তার কৃতী সন্তানদের জীবনী একবার মাত্র না ভেবে অনর্গল বলে যেতে পারে। আজ আমার দুঃখের অবধি নেই, কেন সেসব কথা তখন টুকে রাখলুম না।

আমি মূর্খের মত মাঝে মাঝে আপত্তি উত্থাপন করেছি এবং খাজা গবেটের মত আইন নিয়েও। নিশীথদার চোখ তখন কৌতুক আর মৃদু হাস্যে জ্বলজ্বল করে উঠত। চুপ করে বাধা না দিয়ে শুনতেন। তারপর মাত্র একখানি চোখা-যুক্তি দিয়ে আমাকে দু'টুকরো করে কেটে ফেলতেন। আমার তাতে বিন্দুমাত্র উত্তাপ বোধ হয়নি। তাই শেষের দিকে যখন যে সব জিনিস নিয়ে আমি মনে মনে দম্ভ পোষণ করি, সেখানেও আমি তর্কে হেরে যেতুম তখন প্রতিবারে আনন্দ অনুভব করেছি, এই লোকটির সংশ্রবে আসতে পেরেছি বলে।

কী অমায়িক অজাতশত্রু পুরুষ! আর কি একখানা স্নেহকাতর হৃদয় নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি! আইন আদালতের খররৌদ্র তাঁর সে শ্যামমনোহর হৃদয়ে সামান্যতম বাণ হানতে পারেনি।

তাঁর বয়স তখন ৭০। সেই শিলঙে একদিন সকাল বেলা দেখি, ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত পুরে বারান্দায় ঘন ঘন পাইচারি করছেন, মুখে সিগার

নেই। কথা কয়ে ভালো করে উত্তর পাইনে। কি হয়েছে, ব্যাপার কি নিশীথদা?

তিন দিন ধরে স্ত্রীর চিঠি পাননি।

সে কি নিশীথদা, সত্তর বছর বয়সে এতখানি?

সেই জ্বলজ্বলে চোখ—সে চোখ দুটি কেউ কখনো ভুলতে পারে—দিয়ে বললেন, 'কবি, সব জানো, সব বোঝো, কিন্তু বিয়ে তো করোনি, তাহলে এটাও বুঝতে।'

নিশীথদা বউদিকে বড্ড ভালোবাসতেন। আমি জানি নিশীথদা আরো কিছুদিন কেন এ সংসারে থাকলেন না।

ফেব্রুয়ারি মাসে অখণ্ডসৌভাগ্যবতী শ্রীমতী শোভনা ইহলোক ত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিশীথদার জীবনের জ্যোতিও যেন নিভে গিয়েছিল।

আজ বোধ হয় নিশীথদার আর কোনো দুঃখ নেই—আমাদেরও দুঃখের অন্ত নেই।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি॥

পরিমল রায়

পরিমল রায়ের অকালমৃত্যুতে কেউ সখা, কেউ গুরু, কেউ সহকর্মী, কেউ প্রতিবেশী এবং দিল্লী শহর একটি উৎকৃষ্ট নাগরিক থেকে বঞ্চিত হল।* মৃত্যুকালে পরিমল রায় নিউইয়র্কে ছিলেন কিন্তু এ আশা সকলেই মনে মনে পোষণ করতেন যে, আমেরিকায় বহু প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি আবার দিল্লীতেই ফিরে আসবেন এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব, তাঁর শিষ্যমণ্ডলী তথা বাঙলা সাহিত্যামোদীজন তাঁর সে অভিজ্ঞতার ফল লাভ করতে সক্ষম হবেন।

পরিমল রায় সত্যই নানা গুণের আধার ছিলেন।

একদা "মৌলানা খাফী খান" আমাকে একটি ক্ষুদ্র বিতর্ক-সভাতে নিয়ে যান। সে সভাতে পরিমল রায় ভারতবর্ষে কি প্রকারে কলকব্জা কারখানা ফ্যাক্টরী তৈরী করার জন্য পুঁজি সংগ্রহ করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এরকম আলোচনা আমি জীবনে কমই শুনেছি। পরিমল রায় জানতেন, তাঁর শ্রোতারা অর্থনীতি বাবদে এক একটি আস্ত 'বিদ্যেসাগর'; তাই তিনি এমন সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় মূল বক্তব্যটি বলে গেলেন যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সে পাণ্ডিত্যকে অজ্ঞজনের সামনে নিতান্ত স্বতঃসিদ্ধ দৈনন্দিন সত্যরূপে প্রকাশ করার অলৌকিক পদ্ধতি দেখে আমি মুগ্ধ হলুম।

* স্বর্গীয় পরিমল রায়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সহানুভূতি জানাই।

তাঁর ভাষণ শেষ হলে আমি দু'একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলুম। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি বাঘা পণ্ডিতের মত খেঁকিয়ে উঠলেন না। অতিশয় সবিনয়ে তিনি আমার দ্বিধাগুলোকে এক লহমায় সরিয়ে দিলেন। আমার আর শ্রদ্ধার অন্ত রইল না। পণ্ডিতজনের বিনয় মূর্খের চিত্তজয় করতে সদাই সক্ষম।

সেদিন তাঁর সঙ্গে আলাপচারি হয় নি। তার কয়েকদিন পরে আরেক সভাতে তাঁর সঙ্গে দেখা। শুধালেন, 'চিনতে পারছেন কি?"

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।' আর সঙ্গে সঙ্গে গড় গড় করে তাঁর ভাষণের আটটি পয়েন্ট একটার পর একটা আউড়ে গেলুম। এ আমার স্মৃতিশক্তির বাহাদুরী নয়। এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণ পরিমল রায়ের। পূর্বেই নিবেদন করেছি, পরিমল রায় তাঁর বক্তব্য এমন চমৎকারভাবে গুছিয়ে বলতে পারতেন যে, একবার শুনলে সেটি ভুলে যাওয়ার উপায় ছিল না। আজ যে বিশেষ করে পরিমল রায়ের শিষ্যেরাই সবচেয়ে বেশি শোকাতুর হয়েছেন, সেটা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কিন্তু এসব কথা থাক। অর্থনীতিতে পরিমল রায়ের পাণ্ডিত্য যাচাই করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই।

নিছক সাহিত্যিকের চেয়ে যাঁরা আর পাঁচটা কাজে জড়িত থেকেও সাহিত্য-চর্চা করেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে আমি বড়ই উল্লসিত হই। পেটের ধান্দার একটা হেস্তনেস্ত কোনোগতিকে করে নেওয়ার পর যে লোক তখনো বাণীকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি পেশাদারী সাহিত্যসেবীর চেয়েও শ্রদ্ধার পাত্র। পরিমল রায়ের কর্তব্যবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল বলে তাঁর বেশি সময় কাটত অধ্যাপন অধ্যয়নে। তারপর যেটুকু সময় বাঁচত তাই দিয়ে তিনি বাণীর সেবা করতেন।

এবং সকলেই জানেন সাহিত্যিকের দুটি মহৎ গুণ তাঁর ছিল। তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয় রসের সন্ধানে অহরহ সচেতন থাকত এবং তিনি সে রস বড় প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরে দিতে পারতেন। পরিমল রায়ের চোখে পড়ত দুনিয়ার যত সব উদ্ভট ঘটনা, আর সে সব উদ্ভট ঘটনাকে অতিশয় সাদামাটা পদ্ধতিতে বর্ণনা করার অসাধারণ ক্ষমতা তিনি পরিশ্রম করে আয়ত্ত করেছিলেন।

এদেশের লোকের একটা অদ্ভুত ভুল ধারণা আছে যে, রসিক লোক ভাঁড়ের শামিল। এ ভুল ধারণা ভাঙাবার জন্যই যেন পরিমল রায় বাঙলা দেশে জন্ম নিয়েছিলেন। সকলেই জানেন, তিনি কথা বলতেন কম, আর তাঁর প্রকৃতি ছিল গম্ভীর—একটুখানি রাশভারি বললেও হয়তো ভুল বলা হয় না। চপলতা না করেও যে মানুষ সুরসিক হতে পারে পরিমল রায় ছিলেন তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ; আমাদের নমস্য 'পরশুরাম' এস্থলে পরিমল রায়ের অগ্রজ।

আর যে গুণের জন্য পরিমল রায়কে আমি মনে মনে ধন্য ধন্য বলতুম সেটা

তার লেখনী সংযম। এ গুণটি বাঙলা দেশে বিরল। ভ্যাজর ভ্যাজর করে পাতার পর পাতা ভর্তি না করে আমরা সামান্যতম বক্তব্য নিবেদন করতে পারিনে। সংক্ষেপে বলার কায়দা রপ্ত করা যে কী কঠিন কর্ম সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম। এ গুণ আয়ত্ব করার জন্য বহু বৎসর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। তিন লাইনে যে নন্দলাল একখানা হাসি-মুখ এঁকে দিতে পারেন কিম্বা একটি মাত্র 'সা' দিয়ে আরম্ভ করেই যে ওস্তাদ শ্রোতাকে রসাপ্লুত করতে পারেন তার পশ্চাতে যে কত বৎসরের মেহন্নত আর হয়রানী আছে সে কি দর্শক, শ্রোতা বুঝতে পারে?

তাই আমার শোকের অন্ত নেই যে, বহুদিনের তপস্যার ফলে যখন পরিমল রায়ের আপন সংক্ষিপ্ত নিরলঙ্কার ভাষাটি শান দেওয়া তলওয়ারের মত তৈরী হল, যখন আমরা সবাই এক গলায় বললুম, 'ওস্তাদ, এইবারে খেল দেখাও' ঠিক তখনই তিনি তলওয়ারখানা ফেলে দিয়ে অন্তর্ধান করলেন।

এই তো সেদিনকার লেখা। একটি মোটা লোক রায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেড়াতে বেরোন। আরেকটি রোগাপটকা পন্ পন্ করে সেই সময় বেড়াতে বেরোয়। একজনের আশা ঘোঁৎঘোঁতিয়ে রোগা হবে, আরেকজনের বাসনা পনপনিয়ে সে মোটা হবে। ফলং? যথাপূর্বম্ তথা পরম্।

এ জিনিস চোখের সামনে নিত্যি নিত্যি হচ্ছে। কিন্তু কই, আমরা তো লক্ষ্য করিনি। পরিমল রায় এ তত্ত্বটি আবিষ্কার করে এমনি কায়দায় সামনে তুলে ধরলেন যে, এখন রোগা মোটা যে কোন লোককে যখন ঘোঁৎ ঘোঁৎ কিম্বা পন্ পন্ করতে দেখি তখন আর হাসি সামলাতে পারিনে।

আমার বড় আশা ছিল পরিমল রায় দেশে ফিরে এসে মার্কিনদের নিয়ে হাসির হর্রা, মজার বাজার গরম করে তুলবেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, সুকুমার রায়, পরশুরাম এঁরা কেউ মার্কিন মুল্লুক যাননি। আশা ছিল পরিমল রায়ের মার্কিন-বাস রসের বাজারে আসর জমাবে।

একটি আড়াই ছত্রের টেলিগ্রামে সব আশা চুরমার হল। কাকে সান্ত্বনা দিই? আমিই সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছিনে॥

মপাসাঁ

বাঙলায় বলি, 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না,' পদ্মার ওপারে বলি,—

'পীর মানে না দেশে-খেশে,
পীর মানে না ঘরের বউয়ে'

আর পশ্চিমারা বলেন, 'ঘরকী মুর্গী দাল বরাবর' অর্থাৎ ঘরে পোষা মুর্গী মানুষ এমনি তাচ্ছিল্য করে খায়, যেন নিত্যিকার ডাল-ভাত খাচ্ছে।

কিন্তু একবার গাঁয়ের কদর পাওয়ার পর আবার যে মানুষ গেঁয়ো যোগী হতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রবাদ আমার জানা নেই। কিন্তু তাই হয়েছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মপাসাঁর বেলায়।

মাস তিনেক পূর্বে মপাসাঁর কয়েকখানা চিঠি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।* তারি সমালোচনা করতে গিয়ে ফরাসী একাডেমির সদস্য—অর্থাৎ তিনি অতিশয় কেষ্ট-বিষ্টু জন—মসিয়ো আঁদ্রে বিইঈ (Billy) মপাসাঁ সম্বন্ধে মিঠে-কড়া দু-চারটি কথা বলেছেন।

এক ফরাসী সাহিত্য-প্রচারক নাকি বিইঈকে বললেন, 'কেম্ব্রিজের ছেলে-মেয়েরা আজকাল যে মপাসাঁ পড়ে, সে শুধু অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল নিয়ে।' (অর্থাৎ মপাসাঁর যৌন-গল্পগুলোই তারা পড়ে বেশি)। উত্তরে বিইঈ বললেন, 'বিদেশীরা, বিশেষত কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের লোক আজকাল আর মপাসাঁ পড়ে না, তারা পড়ে প্রুস্ত, ভালেরি, মালার্মে, র‍্যাঁবো। মপাসাঁর কদর এখনো আছে জর্মনি এবং রাশায়। খুদ ফ্রান্সে ছোকরার দল তো মপাসাঁকে একদম পাঁচের বাদ দিয়ে বসে আছে। ভুল করেছে না ঠিক করেছে? কিছুটা ভুল কিছুটা ঠিক—কারণ মপাসাঁ একদিক দিয়ে যেমন অত্যাশ্চর্য কলাসৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে আবার অত্যন্ত যাচ্ছেতাইও লিখেছেন।'

এ সম্পর্কে মপাসাঁর চিঠি প্রকাশ করতে গিয়ে সম্পাদক মেনিয়াল বলছেন, 'আমেরিকার লোক মপাসাঁ পড়ে উঁচুদরের ক্ল্যাসিক হিসেবে। মপাসাঁর সর্বাঙ্গসুন্দর ভাষাকে সেখানকার ফরাসী পড়ুয়ামাত্রই আদর্শরূপে মেনে নেয়। তাঁর ভাষার স্বচ্ছতার জন্যই (সে স্বচ্ছতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন আনতোল ফ্রাঁসের মত গুণী) আমেরিকাতে মপাসাঁর লেখা উদ্ধৃত করে অন্তত কুড়িখানা পাঠ্য বই বেরিয়েছে।'

উত্তরে বিইঈ সায়েব অবিশ্বাসের সুরে বলছেন, 'জানতে ইচ্ছে করে, এখনো

* M. Edouard Maynial এবং Artine Artinian কর্তৃক প্রকাশিত Correspondance inedite.

কি মার্কিন পাঠক মপাসাঁকে এতটা কদর করে? আর ইংলণ্ডের অবস্থা কি? মোনিয়াল তো কিছু বললেন না; আমার মনে হয়, মপাসাঁর লেখাতে যেটুকু খাঁটি ফরাসী ইংরেজ সেটা এড়িয়ে চলে।'

চলতে পারে, নাও চলতে পারে। সে কথা উপস্থিত থাক। এর পর কিন্তু বিইঈ সায়েব যেটা বলেছেন সেটা মারাত্মক। সকলেই জানেন, মপাসাঁ ছিলেন ফ্লবেরের অতি প্রিয় শিষ্য—ফ্লবের তাঁকে হাতে ধরে লিখতে শিখিয়েছিলেন। বিইঈও বলছেন, 'ফ্লবের তাঁর প্রিয় শিষ্যের কোনো দোষই দেখতে পেতেন না, কিন্তু তিনি পর্যন্ত বেঁচে থাকলে মপাসাঁর অত্যধিক (Surabondant = Superabundant) লেখার নিন্দা করতেন।'

এ কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না, তবে এ-সম্পর্কে হিটলারের একটা মন্তব্য মনে পড়ল। হিটলার বলতেন, 'আজকালকার ছোকরারা বড্ড বেশি বই পড়ে আর তার শতকরা নব্বুই ভাগ ভুলে যায়। তার চেয়ে যদি দশখানা বই পড়ে ন'খানা মনে রাখতে পারে, তবে সেই হয় ভালো।' মাস্টার হিসেবে আমার জানা আছে, দশখানা বই পড়লে ছেলেরা ভুলে মেরে দেয় ন'খানা। কিম্বা বলতে পারেন পাঁচ দুগুণে দশের শূন্য নেমে হাতে রইবে পেন্সিল!

মপাসাঁ যদি তাঁর লেখার ত্রিশ ভাগ কমিয়ে দিতেন, তবে সে ত্রিশ ভাগে কি শুধু তাঁর খারাপ লেখাগুলিই—বিইঈর বিচারে—পড়ত? কাটা পড়ত দুইই। তাহলে অন্তত শতকরা কুড়িটি উত্তম গল্প আমরা পেতুমই না। ইংরেজিতে বলে 'টবের নোংরা জল ফেলার সময় বাচ্চাকেও ফেলে দিয়ো না।' ফেলা যায় বলেই এ সতর্ক বাণী।

ভালো লেখা বার বার পড়ি। খারাপ লেখা একবার পড়ে না পড়লেই হল।

কিন্তু মোদ্দা কথায় আসা যাক।

ইংরেজি, জর্মন, রাশান, স্পেনিশ, এমনকি আরবী, ফারসী, বাঙলা, উর্দু নিন এমন কোন্ সাহিত্য আছে যে মপাসাঁর কাছে ঋণী নয়? ছোট গল্প লেখা আমরা শিখলুম কার কাছ থেকে? উপন্যাসের বেলা বলা শক্ত কে কার কাছ থেকে শিখল, কিন্তু ছোট গল্প লেখা সবাই শিখেছেন মপাসাঁর কাছ থেকে। কিম্বা দেখবেন রাম যদি শ্যামের কাছ থেকে শিখে থাকেন, তবে শ্যাম শিখেছেন মপাসাঁর কাছ থেকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মপাসাঁর কাছে ঋণী—যদিও জানি অসাধারণ প্রতিভা আর অভূতপূর্ব সৃষ্টিশক্তি ধারণ করতেন বলে রবীন্দ্রনাথ বহুতর গল্পে মপাসাঁকে ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছেন। গীতিরস ছিল রবীন্দ্রনাথের হস্ততলে—মপাসাঁর সেখানে ছিল কিঞ্চিৎ অনটন—তাই ছোট গল্পে গীতিরস সঞ্চার করে তিনি এক নূতন রসবস্তু গড়ে তুললেন, কবিতাতে সুর দিয়ে যে রকম ঐন্দ্রজালিক গান সৃষ্টি করেছিলেন।

শেষ কথা, কার ভাণ্ডার থেকে মানুষ সব চেয়ে বেশি চুরি করেছে? যে কোনো একখানা হেজিপেজি মাসিক হাতে তুলে নিন। দেখবেন ভালো গল্পটি

মপাসাঁর লোপাট চুরি—দেশকালপাত্র বদলে দিয়ে। আর আশ্চর্য, মপাসাঁর বেলাই এ জিনিসটা করা যায় সব চেয়ে বেশি, কারণ তাঁর অধিকাংশ গল্পই সব কিছুর সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

এত চুরির পরও যাঁর ভাণ্ডার অফুরন্ত তিনি প্রাতঃস্মরণীয়॥

রামমোহন রায়

ভারত এবং আরব ভূখণ্ডের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদানপ্রদান কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে, তার সম্যক আলোচনা এখনো হয়নি। গোড়ার দিকে যেসব সংস্কৃত বইয়ের আরবী তর্জমা হয়, সেগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অনুবাদকদের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান খুব গভীর ছিল না। পরবর্তী যুগে দেখা দিলেন এক পণ্ডিত, যাঁর সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, এমন পণ্ডিত পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন।

সেই দশম-একাদশ শতাব্দীতে যখন 'ম্লেচ্ছের' পক্ষে সংস্কৃত শেখার কোন পন্থাই উন্মুক্ত ছিল না, তখন গজনীর মামুদ বাদশার সভাপণ্ডিত আল-বীরুনী অতি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত শিখে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গসুন্দর চর্চা করে আরবী ভাষাতে একখানা অতি উপাদেয় প্রামাণিক গ্রন্থ লেখেন। বইখানি সে-যুগের হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের একখানা ছোটোখাটো বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে।

পাঠান যুগে আরবী-ফাসীর্তে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত চর্চা হয়, কিন্তু আসল চর্চা আরম্ভ হয় আকবরের সময় এবং আল-বীরুনীর পর যদি সত্য পণ্ডিতের অনুসন্ধান কেউ করে তবে তাকে যেতে হয় আকবরের পৌত্রের যুগে, শাহ্জাহানের পুত্র দারা-শীকুহ্'র কাছে। আরবী-ফাসী-সংস্কৃত এ তিন ভাষাতেই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং ভক্তিমার্গে—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—হেন সূক্ষ্মতত্ত্ব নেই, যা তাঁর পাণ্ডিত্যের চৌহদ্দীর বাইরে পড়ে।

তার পর ভারতবর্ষের যে অবিশ্বাস্য অধঃপতন আরম্ভ হয়, তার ইতিহাস সকলেই জানেন। টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসায়, সংস্কৃত এবং আরবী-ফাসী কোন গতিকে বেঁচে রইল মাত্র—এর বেশি জোর করে কিছু বলা যায় না।

তার পর এই হতভাগ্য ভারতবর্ষেই এবং আমাদের পরম শ্লাঘার সম্পদ এই বাঙলা দেশেই জন্মালেন এক বাঘা পণ্ডিত, এক 'জবরদস্ত মৌলবী'—যিনি কি আল-বীরুনী, কি দারাশীকুহ যে কারো সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

শুধু তাই নয়, নানা দ্বন্দ্ব, নানা সংঘাতের উর্ধ্বে যে সত্যশিবসুন্দর

আছেন, যাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করলে পরস্পরবিরোধী সংঘাত মাত্রই লোপ পায়, সেই সত্যশিবসুন্দরকে তিনি হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন, মনোজগতে স্পষ্টরূপে ধারণা করতে পেরেছিলেন বহুবিধ ঐতিহ্যের সম্মিলিত সাধনার ভিতর দিয়ে। বাল্যকালে তিনি শিখেছিলেন আরবী-ফার্সী, পরবর্তীকালে সংস্কৃত এবং সর্বশেষে হীব্রু, গ্রীক, লাতিন। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃস্ট—এই চার ধর্মজগতে তিনি অনায়াসে অতি স্বচ্ছন্দে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, অন্তরের খাদ্য অন্বেষণ করে যে শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন, সে-শক্তি যে শুধু সে-যুগের মূঢ়তা-জড়তাকে জয় করতে পেরেছিল, তাই নয়, সে-শক্তির প্রসাদাৎ পরবর্তী বাঙলা দেশ এবং ভারতবর্ষ যে নব নব অভিযানের পথে বেরিয়েছিল, তার কিঞ্চিৎ কল্পনা আমরা আজ করতে পারি আমাদের অদ্যকার জীবন্মৃত অবস্থা থেকে।

রামমোহন বলতে কি বোঝায়, তার সর্বাঙ্গসুন্দর ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তাঁর বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার সম্যক চর্চা এখনো হয়নি। 'দেশের' এক পৃষ্ঠা সে কর্মের জন্য প্রশস্ত নয় এবং এ অধম সে-শাস্ত্রাধিকার থেকে বঞ্চিত।

নিপীড়িত হলেই সে ব্যক্তি মহাজন, একথা বলা চলে না, কিন্তু মহাজন মাত্রই নিপীড়িত হন, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই। রাজার ভাগ্যে সে নিপীড়ন এসেছিল, চাষীদের কাছ থেকে নয়—সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না—তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন সর্বধর্মের পণ্ডিতগণ!

আরবী ভূমিকা (মুকদ্দমা) সম্বলিত তিনি যে ফার্সী কেতাব রচনা করেন, তাঁর নাম 'তুহফাতু ল্ মুওয়াহ্হিদীন্' (একেশ্বরবাদীর উদ্দেশ্যে উপঢৌকন) এবং সে-গ্রন্থে তিনি আল্লার সত্যরূপের যে-বর্ণনা মুসলমান ধর্মশাস্ত্র তন্ন তন্ন করে বয়ান করলেন, সে-রূপ সে-বর্ণনা ক্রিয়াকাণ্ডে নিমজ্জিত তৎকালীন মুসলমান পণ্ডিতজনকে বিন্দুমাত্র উল্লসিত করে নি। পরবর্তী যুগে মৌলবী-মৌলানা, আলিম-উলামা তাঁকে জবরদস্ত মৌলবীরূপে স্বীকার করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে 'মুতাজিলা' (স্বাধীনচেতা)—গোঁড়ারা যেরকম ভদ্র, ব্রাহ্মকে 'বেহ্মজ্ঞানী' নাম দিয়ে তাচ্ছিল্য করেন—নাম দিয়ে তাঁর সৎ ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করেছিলেন।

হুবহু সেই বিরুদ্ধাচরণই ত তিনি পেয়েছিলেন 'স্বধর্মী'দের কাছ থেকে। অদ্বৈতের অনুসন্ধানকে ঊনবিংশ শতাব্দী প্রায় ম্লেচ্ছাচারের মত বর্জনীয় বলে মনে করেছিল—এ-ইতিহাস সকলেই জানেন।

আবার হুবহু তৃতীয় দফায় তিনি বিরুদ্ধাচরণ পেলেন খৃষ্টান মিশনরীদের কাছ থেকে। যে খৃস্টধর্ম তখন বাঙলা দেশে প্রচারিত হচ্ছিল, সে-ধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু বা মুসলমান যে কোন ধর্মের চেয়ে কোন দিক দিয়ে

আধ্যাত্মিকতায় উৎকৃষ্ট ছিল না। হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মে রামমোহন যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন,\সেই সত্যের অনুসন্ধানে তিনি বাইবেলে যে-খৃস্টকে আবিষ্কার করলেন, সে-খৃস্ট 'কেরামতি' করেন না, অর্থাৎ তিনি জলকে মদ বানাবার ভেল্কিবাজি দেখান না, সাতখানা রুটি দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টাও করেন না।

যে-খৃস্টান মিশনরীরা এতকাল ধরে রামমোহনের কুসংস্কারবর্জিত স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির প্রশংসা করেছিলেন, তাঁরাই হলেন সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ। উচ্চকণ্ঠে সর্বত্র ঘোষণা করলেন, 'রামমোহন মূর্খ, রামমোহন যীশুকে চিনতে পারেনি, অলৌকিক কর্ম (কেরামতি) বাদ দিলে যে যীশু দাঁড়ান, তিনি প্রকৃত যীশু নন।'

হিন্দু-মুসলমান সে-যুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাঁদের বিরুদ্ধ-ব্যবহার রামমোহনকে বিস্মিত কিংবা বিচলিত করেনি। কিন্তু খৃস্টানদের এ ব্যবহারে তিনি নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন—আজ ডীন ইনগ্ সেটা বুঝতে পারবেন।

তিন ধর্মের গলা-মেলানো একই প্রতিবাদে রামমোহন বিচলিত কিংবা পথভ্রষ্ট হননি—সে আমাদের পরম সৌভাগ্য॥

বিশ্বভারতী

কবি, শিল্পী—স্রষ্টামাত্রই স্পর্শকাতর হয়ে থাকেন। এবং সেই কারণেই আর পাঁচজনের তুলনায় এ জীবনে তাঁরা এমন সব বেদনা পান যার সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই। রাজনৈতিক কিম্বা ব্যবসায়ী হতে হলে গণ্ডারের চামড়ার প্রয়োজন—গণ্ডারের চামড়া নিয়ে কোনো কবি আজ পর্যন্ত সার্থক সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি।

জীবনের বহুক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বহু অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়েছেন। তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ পান; তৎসত্ত্বেও বাঙলাদেশ বহুদিন ধরে তাঁকে কবি বলে স্বীকার করতে চায়নি। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে বহু গণ্যমান্য লোক এমন সব অন্যায় আক্রমণ এবং আন্দোলন চালান যে রবীন্দ্রনাথকে হয়ত অল্প বয়সে কীটসের মত ভগ্নহৃদয় নিয়ে ইহলোক পরিত্যাগ করতে হত। রবীন্দ্রনাথ যে বহু বেদনা পেয়েও কীটসের মত ভেঙে পড়েন নি তার অন্যতম প্রধান কারণ, ধর্মে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ছিল এবং দ্বিতীয়ত মহর্ষি স্বহস্তে রবীন্দ্রনাথের নৈতিক মেরুদণ্ডটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

এ জীবনে রবীন্দ্রনাথ বহু বেদনা পেয়েছেন এবং তার খবর বাঙালী মাত্রই কিছু না কিছু রাখেন। আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি, বিশ্বভারতীর নবপ্রতিষ্ঠান উপলক্ষ্যে তারই একটি নিবেদন করি।

১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা করেন কিম্বা বলতে পারি যে ইস্কুলটি ('পূর্ব বিভাগ') প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে বাঙলা এবং বাঙলার বাইরে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল তার সঙ্গে একটি কলেজ ('উত্তর বিভাগ') যোগ দিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নানাপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা করারও ব্যবস্থা হল।

তাই গুরুদেবের বাসনা ছিল, পূর্ব-পশ্চিমের গুণীজ্ঞানীরা যেন শান্তি-নিকেতনে সম্মিলিত হয়ে একে অন্যের সহযোগিতায় বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সাধনায় নিযুক্ত হন।

সেই মর্মে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানালেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিত অধ্যাপক সিলভাঁ লেভিকে। ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ববিষয়ে লেভির অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল তো বটেই; তদুপরি বৌদ্ধধর্মে বোধ করি তখনকার দিনে পশ্চিমে এমন কেউ ছিলেন না যিনি তাঁর সামনে সাহস করে দাঁড়াতে পারতেন।

শান্তিনিকেতনে তখন বহুতর পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, শ্রীযুত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সন, শ্রীযুত নিতাইবিনোদ গোস্বামী, অধ্যাপক কলিন্‌স্‌, বগদানফ বেনওয়া, ক্রামরিশ, শ্রীযুত মিশ্রজী, শ্রীযুত হিড়জিভাই মরিস, শ্রীযুত প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও আরো বহু খ্যাতনামা লোক তখন শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতেন।

সঙ্গীতে ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের ভিতর ছিলেন শ্রীযুত অমিয় চক্রবর্তী, শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী।*

এবং আশ্রমের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত না হয়েও এক ঋষি আশ্রমটিকে আপন আশীর্বাদ দিয়ে পুণ্যভূমি করে রেখেছিলেন। বাঙলাদেশ তাঁকে প্রায় ভুলে গিয়েছে। ইনি রবীন্দ্রনাথের সর্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরবর্তীকালে লেভি এ'র পদপ্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনে তখন পণ্ডিত এবং পাণ্ডিত্যের কিছুমাত্র অনটন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সে ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর সর্বশেষ কপর্দক দিয়ে—এবং এস্থলে ভক্তিভরে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে এই সব বড় বড় পণ্ডিতেরা যে দক্ষিণা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন সে দক্ষিণা আজকের দিনে দিতে গেলে অনেক অপণ্ডিতও অপমান বোধ করবেন।

কিন্তু ছাত্র ছিল না। বিশ্বভারতী তখন পরীক্ষা নিত না, উপাধিও দিত না।

* সিংহলের শ্রমণ পণ্ডিতদ্বয় এবং আরও কয়েকজনের নাম ভুলে যাওয়ার জন্য তাঁদের কাছে লজ্জিত আছি।

এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে, তখনকার দিনে বিশ্বভারতীর অন্যতম প্রধান নীতি ছিল : "দি সিস্টেম অব এগজামিনেশন উইল হ্যাভ নো প্লেস্ ইন বিশ্বভারতী, নর উইল দ্যার বী এনি কন্‌ফারিং অব ডিগ্রীজ।"

এ অবস্থায় বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন করতে আসবে কে?

তবে এই যে এত অর্থব্যয় করে বিদেশ থেকে পৃথিবীবরেণ্য পণ্ডিত লেভিকে আনানো হচ্ছে ইনি বক্তৃতা দেবেন কার সামনে, ইনি গড়ে তুলবেন কোন্ ছাত্রকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের তখন কোনো যোগসূত্র ছিল না। তবু রবীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করলেন যাতে করে কলকাতার ছাত্ররা শান্তি-নিকেতনে এসে সপ্তাহে অন্ততঃ একটি বক্তৃতা শুনে যেতে পারে। শান্তি-নিকেতনে রবিবার অনধ্যায় নয় কাজেই শনির বিকেল কিম্বা রবির সকালের ট্রেন ধরে যে কোনো ছাত্র কলকাতা থেকে এসে লেভির বক্তৃতা শোনবার সুযোগ পেল।

যেদিন প্রথম বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার কথা সেদিন রবীন্দ্রনাথ খবর নিয়ে জানতে পারলেন কলকাতা থেকে এসেছেন মাত্র দুটি ছাত্র! তারও একজন রসায়নের ছাত্র—আর পাঁচজন যে রকম 'বোলপুর দেখতে' আসে এই সুযোগে সেও সেই রকম এসেছে!

বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা তখন বারো জনও হবে না। তার মধ্যে সংস্কৃত পড়তেন জোর চারজন।

এই ছ'টি ছাত্রের সামনে (অবশ্য পণ্ডিতরাও উপস্থিত থাকবেন) বক্তৃতা দেবেন সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত লেভি! রবীন্দ্রনাথ বড় মর্মাহত হয়েছিলেন।

তাই প্রথম বক্তৃতায় ক্লাশের পুরোভাগে খাতাকলম নিয়ে বসলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

লেভির আর কোনো খেদ না থাকারই কথা॥

নাগা

৩১শে অগস্ট সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহর*লাল নেহরু বলেন যে, গত ২৪শে মে একদল নাগা ভারতীয় নাগা-অঞ্চলে হানা দেয় ও ৯৩টি মুণ্ডু কেটে নিয়ে চলে যায়।

আসামে মিরি, মিশমি, আবর, আকা, দফলা, কুকী, গারো, লুসাই, খাসী, নাগা ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্নত, অনুন্নত, সভ্য অসভ্য জাতি আছে। এদের ভিতর খাসী, লুসাই, গারোরা এবং আরো কয়েকটি জাতি বড়ই ঠাণ্ডা মেজাজের, এবং সবচেয়ে মারাত্মক নাগারা। এরা এখনো পরমানন্দে নরমাংস ভক্ষণ করে এবং কে কতটা শৌর্যশালী তার বিচার হয় কে কটা মুণ্ডু কাটতে পেরেছে তাই দিয়ে।

নাগা পাহাড়ের যে অংশটুকু ইংরেজ দখল করে সেখানে ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর মিশনারি যায় এবং ফলে অনেক নাগা খৃস্টান হয়ে যায়। মিশনারিদের ধর্মপ্রচার ও ইংরেজের আইনকানুনের ভয়ে ব্রিটিশ নাগারা বড় অনিচ্ছায় মানুষ কেটে খাওয়া বন্ধ করে; কিন্তু স্বাধীন ও বর্মী নাগারা এসব 'ম্লেচ্ছ-সংস্কারের' কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে সুযোগ পেলেই ব্রিটিশ নাগা-অঞ্চলে হানা দিয়ে মুণ্ডু কেটে নিয়ে যেতে থাকে।

বিশেষ করে ব্রিটিশ (বর্তমান ভারতীয়) অঞ্চলেই এরা হানা দেয় কেন?

তার একমাত্র কারণ ব্রিটিশ আইন করে—এবং সে আইন ভারতীয়রাও চালু রেখেছেন—ব্রিটিশ নাগাদের ভিতর এক গ্রাম অন্য গ্রামকে হানা দেওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করে দেয়। অবশ্য এ আইন নাগারা চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নেয়নি—বিস্তর মার খাওয়ার পর অতি অনিচ্ছায় তারা হানাহানি বন্ধ করে। ফলে তারা নির্বীর্য ও শান্তিপ্রিয় হয়ে পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে হানাহানির জন্য যেসব অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন সেগুলো লোপ পেতে থাকে।

ওদিকে স্বাধীন নাগারা দেখল এ বড় উত্তম ব্যবস্থা। আপোষে তারা মাঝে মাঝে হানাহানি করে বটে, কিন্তু সেখানে যেমন অন্যের মুণ্ডুটি কাটবার সম্ভাবনা আছে ঠিক তেমনি নিজের মুণ্ডুটি কাটা যাওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনাও

* বাঙলাতে সাধারণতঃ 'জওহর' লেখা হয় এবং এ ভুল সংশোধন করা উচিত। 'জওহর' কথাটি ফার্সীতে একবচন এবং অর্থ বাঙলাতে যা তাই। 'জওয়াহর' কিম্বা 'জওয়াহির' শব্দটি 'জওহর' শব্দের আরবী ব্যাকরণসম্মত বহুবচন। পণ্ডিতজী তাঁর নাম বহুবচনে ব্যবহার করেন এবং আমাদেরও তাই করা উচিত। এস্থলে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফার্সীতে আসলে শব্দটি 'গওহর'; কিন্তু আরবী বর্ণমালায় 'গ' নেই ব'লে আরবরা 'জওহর' লেখেন। পরবর্তী যুগে 'গওহর'ও প্রচলিত হয়। তাই মুসলমানী নাম 'গৌহর' ও 'জওহর' একই।

আছে, কারণ উভয় পক্ষই উদয়াস্ত লড়াইয়ের পাঁয়তারা কষে, তীর চোখা রাখে, ধনুকের ছিলে বদলায়। অপিচ ব্রিটিশ নাগারা লড়াই করতে ভুলে গিয়েছে, তীরধনুক যা আছে তা দিয়ে হানাহানি করা চলে না। এদের হানা দিলে প্রাণ যাবার ভয় নেই, গোলায় মজুদ ধান লুট করা যায় আর শুয়ার ছাগল ত নিতান্তই ফাউ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, এক গাদা মুণ্ডু কপাকপ কেটে নিয়ে নির্বিঘ্নে বাড়ি চলে যাওয়া যায়। অন্তত পক্ষে একটা মুণ্ডু না দেখাতে পারলে স্বাধীন নাগা অঞ্চলে বউ জোটে না; কাজেই নাগা সম্বরণদের গত্যন্তর কোথায়?

ভারতীয় নাগারা ফরিয়াদ করে আমাদের বলে, 'হানাহানি বন্ধ করে দিয়ে তোমরা আমাদের নিবীর্য করে ফেলেছ। তাই সই। কিন্তু তার ঝুঁকিটা কি তোমাদেরই নেওয়া উচিত নয়? স্বাধীন নাগারা যখন আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে তখন আমরা আত্মরক্ষা করতে অক্ষম। তোমাদের কি তখন কর্তব্য নয় পুলিশ সেপাই রেখে আমাদের বাঁচানো?'

অতি হক্ কথা। কিন্তু প্রশ্ন, এ কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় কি প্রকারে? আমাদের সেপাইরা যে নাগাদের ডরায় তা নয়, কারণ নাগাদের হাতে বন্দুক থাকে না। গোটা দুত্তিন মেশিনগান দিয়েই এক পাল নাগাকে কাবু করা যায়, কিন্তু বেদনাটা তখন সেখানে নয়। মুশকিল হচ্ছে এই, স্বাধীন নাগারা হানা দেবার পূর্বে শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে দিনক্ষণ জানিয়ে দিয়ে শুভাগমন করে না এবং আমাদের পক্ষেও প্রতি পাহাড়ের চূড়োয় সেপাই মোতায়েন করা সম্ভবপর নয়।

নাগারা দল বেঁধে গাঁ বানিয়ে সমতলভূমিতে বসবাস করে না। তারা থাকে পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় এবং সে চূড়োগুলোর উচ্চতা তিন থেকে ছ' হাজার ফুট। কাজেই এক পাহাড়ের চূড়ো থেকে যদি দেখাও যায় যে অন্য চূড়ো আক্রান্ত হয়েছে তবু সেখানে পেঁছিতে পেঁছিতেই সব কেচ্ছা খতম হয়ে যায়।

তবে কি নাগাদের আপন হাতে কিছু কিছু বন্দুক টন্দুক দেওয়া যায় না? সেখানে মুশকিল হচ্ছে, নাগাদের ঠিক অতটা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ বন্দুক পেলে তারা সোল্লাসে অবিচারে অন্য নাগাদের আক্রমণ করবে। তা হলে সে একই কথায় গিয়ে দাঁড়ালো।

নাগারা এই ব্যবস্থাটাই চায়। তারা বলে, তোমরা যখন আমাদের বাঁচাতে পারছো না তখন আমরাই আপন প্রাণ বাঁচাই। এটাতেও আমাদের মন সাড়া দেয় না।

আচ্ছা, তবে কি আমাদের সৈন্যরা স্বাধীন নাগা অঞ্চল আক্রমণ করে তাদের বেশ কিছু ডাণ্ডা বুলিয়ে দিতে পারে না?

পারে। তবে তাতেও ঝামেলা বিস্তর॥

হিন্দু-মুসলমান-কোড বিল

শাস্ত্রে সব পাওয়া যায়—কোনো কিচ্ছুর অনটন নেই। সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে চান, না বিলিয়ে দিতে চান; বিয়ে করতে চান, না করতে চান,—একখানা কিম্বা বিশখানা; পুজো-পাজা করতে চান কিম্বা ব্যোম ভোলানাথ বলে বুঁদ হয়ে থাকতে চান, এমন কি মরার পর পরশুরামী স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করতে চান কিম্বা রবি ঠাকুরী 'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই' হয়ে গিয়ে নির্গুণ নির্বাণানন্দ লাভ করতে চান, তাবৎ মালই পাবেন।

তা না হলে সতীদাহ বন্ধ করার সময় উভয় পক্ষই শাস্ত্র কপচালেন কেন? বিধবা-বিবাহ আইন পাশ করার সময়, শারদা বিলের হাঙ্গামহুজ্জুতের সময় উভয় পক্ষই তো শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছিলেন, এ-কথা তো আর কেউ ভুলে যায় নি।

শুধু হিন্দু শাস্ত্র না, ইহুদি খৃস্টান মুসলিম সব শাস্ত্রেরই ঐ গতি। শুধু হিন্দুশাস্ত্র এঁদের তুলনায় অনেক বেশি বনেদি বলে এঁর বাড়িতে দালান-কোঠার গোলকধাঁধাঁ ওঁদের তুলনায় অনেক বেশি, পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা পদে পদে। তাতে অবশ্য বিচলিত হওয়ার মত কিছুই নেই, কারণ স্বয়ং যীশুখৃস্ট নাকি বলেছেন, যেহোভার আপন বাড়িতে দালান-কোঠা বিস্তর।

তাই শাস্ত্রের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা। তাতে ফায়দাও এন্তার। মুসলিম শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ চর্চা করেছি বলেই মোল্লা-মৌলবীকে আমি বড্ড বেশি ডরাইনে। কুঁড়েমি করে জুম্মার নমাজে যাইনি, মোল্লাজী রাগত হয়ে প্রশ্ন শুধালেন, যাইনি কেন? চট্ করে শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করলুম, আমি যে জায়গায় আছি সেটাকে ঠিক শহর (মিস্‌র্) বলা চলে না অতএব জুম্মার নমাজ অসিদ্ধ। ব্যস্, হয়ে গেল। ঠিক তেমনি বিয়ে যখন করতে চাই নি, তখন আমি শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছি আবার ওজীর সাহেব ফজলু ভায়া যখন পরিপক্ক বৃদ্ধ বয়সে তরুণী গ্রহণ করলেন, তখন তিনিও হদীস (স্মৃতি) কপচালেন।

গ্রামাঞ্চলে থাকতে হলে কুইনিনের মত শাস্ত্র নিত্য সেব্য।

সে কথা থাক্।

হিন্দু রমণী তালাক (লগ্নচ্ছেদ) দিয়ে নবীন পতি বরণ করতে পারবেন কি না, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনে। আমার শিরঃপীড়া, আমার গৃহিণী বেঁকে গিয়ে কিছু একটা করে ফেলবেন না তো!

এ প্রশ্ন মনে উঠত না, কিন্তু হিন্দু কোড্ বিল আসর গরম করে তোলাতে মুসলমান ভায়াদেরও টনক নড়েছে। খুলে কই।

হঠাৎ এক গুণী খবরের কাগজে পত্রাঘাত করলেন,—তিনি হিন্দু না মুসলমান মনে নেই—হিন্দু রমণী যদি লগ্নচ্ছেদ করবার অধিকার পায়, তবে মুসলমান রমণীতেও সে অধিকার বর্তাবে না কেন? ঠিকই তো। কিন্তু উত্তরে আর পাঁচজন মুসলমান বললেন,—কেউ খেঁকিয়ে, কেউ মুরুব্বির চালে, কেউ বা হিন্দু ভায়াদের পিঠে আদরের থাবড়া দিয়ে—মুসলমান শাস্ত্র নূতন কোড্ দিয়ে রদ-বদল করার কোনো প্রয়োজন নেই। মুসলমান রমণীর যে অধিকার আছে তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট—ওসব মালের প্রয়োজন হিন্দুদের।

লক্ষ্য করলুম, কোনো মুসলমান রমণী খবরের কাগজে এ বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।

তাই প্রশ্ন, লগ্নচ্ছেদ করার জন্য মুসলমান পুরুষ রমণীর কতটুকু অধিকার? এ আলোচনায় মুসলমানদের কিছুটা লাভ হবে, হিন্দুদের কোনো ক্ষতি হবে না।

মৌলা বখ্‌শ্ মিঞা যে কোনো মুহূর্তে বেগম মৌলাকে তিনবার 'তালাক, তালাক, তালাক' বললেই তালাক হয়ে গেল—স্বয়ং শিবেরও সাধ্য নেই তিনি তখন সে তালাক ঠেকান, এস্থলে 'শিব' বলতে অবশ্য মোল্লা-মৌলবী বোঝায়।

বেগম মৌলা সতী সাধ্বী। আজীবন স্বামীর সেবা করেছেন। তাঁর তিনটি পুত্রকন্যা, সব চেয়ে ছোটটির বয়স দশ কিম্বা বারো। তাঁর বাপের বাড়িতে কেউ নেই। তিনি বিগতযৌবনা—বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তিনি পুনরায় বিয়ে করতে চাইলেও নূতন বর পাবেন না।

বেগম মৌলাকে তন্দণ্ডেই পতিগৃহ ত্যাগ করতে হবে। কাচ্চাবাচ্চাদের উপরও তাঁর কোনো অধিকার নেই—নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য হলে অবশ্য আলাদা কথা।

'তালাক, তালাক, তালাক' বলার জন্য মৌলা সাহেবকে কোনো কারণ দর্শাতে হবে না, কেন তিনি গৃহিণীকে বর্জন করছেন; তাঁর কোনো অপরাধ আছে কি না, তিনি অসতী কিম্বা চিররুগ্না, কিংবা বদ্ধ উন্মাদ—এর কোনো কারণই দেখাবার জন্য কেউ তাঁকে বাধ্য করতে পারে না। এস্থলে নিরঙ্কুশ, চৌকশ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।'

(জানি, মৌলা সাহেব হেড আপিসের বড়বাবুর মত বড় শান্ত স্বভাব ধরেন। হঠাৎ তিনি ক্ষেপে গিয়ে এ রকম ধারা কিছু একটা করবেন না, কিন্তু সে কথা অবান্তর। এখানে প্রশ্ন, মৌলার হক্ কতটুকু, বেগম মৌলারই বা কতটুকু? তুলনা দিয়ে বলতে পারি, ভদ্র হিন্দু সচরাচর বিনা কসুরে একমাত্র পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু কস্মিনকালেও করেন না, একথা বললে সত্যের অপলাপ হয়।)

যাঁরা তালাক আইনের কোনো পরিবর্তন চান না, তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আরে বাপু, তালাক দেওয়া কি এতই সোজা কর্ম? 'মহরের' কথাটি কি বেবাক ভুলে গেলে? মৌলার মাইনে তিন শ' টাকা। 'মহরের' টাকা পাঁচ হাজার। অত টাকা পাবে কোথায় মৌলা সাহেব?'

হিন্দু পাঠককে এই বেলা 'মহর' জিনিসটি কি সেটি বুঝিয়ে বলতে হয়। 'মহর' অর্থ মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে স্ত্রীধন। বিয়ের সময় মৌলাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়, তাঁর বেগমকে তিনি কতটা স্ত্রীধন দেবেন। মৌলা বলেছিলেন, পাঁচ হাজার (অবস্থা ভেদে পঞ্চাশ, একশ, এক হাজার বা পাঁচ লক্ষও হতে পারে) এবং এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন, বেগম সাহেবা যে কোনো মুহূর্তে স্ত্রীধন তলব করলে তিনি তদ্দণ্ডেই নগদা-নগদি আড়াই হাজার ঢেলে দেবেন এবং বাকী আড়াই হাজার কিস্তিবন্দিতে শোধ দেবেন।

এসব শুধু মুখের কথা নয়। এ সমস্ত জিনিস বিয়ের রাতে দলিল লিখে তৈরী করা হয় ও পরে 'মেরেজ রেজিস্ট্রারের' আপিসে পাকাপোক্ত রেজিস্ট্রি করা হয়। মৌলা এ টাকাটা ফাঁকি দিতে পারবেন না, সেকথা সুনিশ্চিত।

উত্তরে নিবেদনঃ

মৌলার গাঁঠে পাঁচ হাজার টাকা থাক আর নাই থাক, তিনি যে স্ত্রীকে তালাক দিলেন, সেটা কিন্তু অসিদ্ধ নয়। টাকা না দিতে পারার জন্য শেষ তক্ মৌলার সিভিল জেল হতে পারে, কিন্তু তালাক তালাকই থেকে গেল। অর্থাৎ একথা কেউ মৌলাকে বলতে পারবে না, তোমার যখন পাঁচ হাজার টাকার রেস্ত নেই, তাই তালাক বাতিল, বেগম মৌলা তোমার স্ত্রী এবং স্ত্রীর অধিকার তিনি উপভোগ করবেন।

মোদ্দা কথা, তালাক হয়ে গেল, টাকা থাক আর নাই থাক।

পুনরায় নিবেদন করি, শাস্ত্র কি বলেন সে-কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। কুরানশরীফ যা বলেছেন, তার যেসব টীকা-টিপ্পনি লেখা হয়েছে, তার উপর যে বিরাট শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে দেশাচার-লোকাচার মিলে গিয়ে উপস্থিত যে পরিস্থিতি বিদ্যমান তাই নিয়ে আমাদের আলোচনা। সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের একে অন্যের উপর কতখানি অধিকার, বিশেষ করে একে অন্যকে বর্জন করার অধিকার কার কতটুকু সেই নিয়ে আলোচনা।

পূর্বেই নিবেদন করেছি স্বামী যে কোন মুহূর্তে স্ত্রীকে বর্জন করতে পারেন। তাঁকে তখন কোনো কারণ কিম্বা ওজুহাত দর্শাতে হয় না। তবে তিনি যে 'মহর' বা স্ত্রীধন দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সে অর্থ তাঁকে দিতে হবে। অবশ্য তা না দিতে পারলে যে তালাক মকুব হবে তাও নয়।

স্ত্রী তাঁর ভূতপূর্ব স্বামীর মাইনে 'এটাচ' করতে পারেন, আদালতের ডিক্রী নিয়ে সম্পত্তি ক্রোক করতে পারেন; এক কথায় উত্তমর্ণ অধমর্ণকে যতখানি নাস্তানাবুদ করতে পারেন ততখানি তিনিও করতে পারেন।

উত্তম প্রস্তাব। এখন প্রশ্ন স্ত্রী যদি স্বামীকে বর্জন করতে চান তবে তিনি পারেন কি না? যদি মনে করুন, স্ত্রী বলেন, 'এই রইল তোমার স্ত্রীধন, আমাকে খালাস দাও' কিম্বা যদি বলেন, 'তুমি আমাকে যে স্ত্রীধন দেবে বলেছিলে সে স্ত্রীধনে আমার প্রয়োজন নেই, আমি তোমাকে বর্জন করতে চাই,' তবু স্বামী সাফ 'না' বলতে পারেন। অবশ্য স্ত্রী স্বামীকে জ্বালাতন করার জন্য তাঁর স্ত্রীধন তন্দণ্ডেই চাইতে পারেন—কারণ স্ত্রীধন তলব করার হক্ স্ত্রীর সব সময়ই আছে, স্বামী তালাক দিতে চাওয়া না-চাওয়ার উপর সেটা নির্ভর করে না। স্বামী যদি সে ধন দিতে অক্ষম হন তা হলেও স্ত্রী তালাক পেলেন না। অর্থাৎ তিনি যদি পতিগৃহ ত্যাগ করে ভিন্ন বিবাহ করতে চান তবে সে বিবাহ অসিদ্ধ; শুধু তাই নয়, পুলিশ স্ত্রী এবং নবীন স্বামী দুজনের বিরুদ্ধে 'বিগেমির' মোকদ্দমা করতে পারবে।

পক্ষান্তরে আবার কোনো স্ত্রী যদি স্ত্রীধনটি ভ্যানিটি-ব্যাগস্থ করে বাপের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকেন তবে স্বামীও তাঁকে জোর করে আপন বাড়িতে নিয়ে আসতে পারেন না। আইন স্বামীকে সে অধিকার দেয়, কিন্তু আনবার জন্য পুলিশের সাহায্য দিতে সম্পূর্ণ নারাজ। আপনি যদি জোর করে আনতে যান তবে শালী-শালাজের হস্তে উত্তমমধ্যমের সমূহ সম্ভাবনা।

তখন আপনি আর কি করতে পারেন? তাঁকে তালাক দিয়ে হৃদয় থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে পারেন আর আপনি যদি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হন তবে আপনি তালাক না দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেন। তাতে করে আর কিছু না হোক স্ত্রী অন্তত আরেকটা লোককে বিয়ে করতে পারবেন না।

খুব বেশি না হলেও কোনো কোনো সময় এ রকম হয়ে থাকে। পরিস্থিতিটা দু রকমের হয়।

হয় স্বামী বদরাগী, কিম্বা দুশ্চরিত্র। স্ত্রীকে খেতে পরতে দেয় না, মার-ধোর করে। সহ্য না করতে পেরে স্ত্রী বাপ কিম্বা ভাইয়ের বাড়িতে পালালো (বাপ বেঁচে না থাকলে ভাইও আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়, কারণ ভাই যে সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে তাতে বোনেরও অংশ আছে)। সেখান থেকে সে স্ত্রীধনের তলব করে মোকদ্দমা লাগাল। স্বামীর কণ্ঠশ্বাস—অত টাকা জোগাড় করবে কোথা থেকে?

তখন সাধারণত মুরুব্বিরা মধ্যিখানে পড়েন—বিশেষত সেই সব মুরুব্বিরা যাঁরা বিয়েটা ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাঁরা পতিকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, 'তোমাতে ওতে যখন মনের মিল হয়নি তখন কেন বাপু মেয়েটাকে ভোগাচ্ছো। তালাক দিয়ে ওকে নিষ্কৃতি দাও, ও বেচারী অন্য কোথাও বিয়ে করুক।'

বেয়াড়া বদমায়েশ স্বামী হলে বলে, 'না, মরুকগে বেটি। আমি ওকে তালাক দেব না।'

মুরুব্বিরা বলেন, 'তবে ঢালো 'মহরের' টাকা। না হলে বসতবাড়ি বিক্রি হবে, কিম্বা মাইনে এটাচ্‌ট্‌ হবে। তখন বুঝবে ঠ্যালাটা।'

বিশ্বাস করবেন না, এরকম দুশমন ধরণের স্বামীও আছে যে বাড়ি বিক্রয় করে মহরের শেষ কপর্দক দেয় কিন্তু তালাক দিতে রাজী হয় না।

কিম্বা সে শেষ পর্যন্ত রাজী হয় যে বিবি তাঁর স্ত্রীধন তলব করবেন না। আর সেও তাকে তালাক দিয়ে দেবে।

কিন্তু এটা হল আপোসে ফৈসালা। আইনের হক্‌ স্ত্রীলোকের নেই যে সে পতিকে বর্জন করতে পারে। তবু এস্থলে পুনরায় বলে রাখা ভালো, 'মহরের' টাকা দেবার ভয়ে অনেক স্বামী স্ত্রীর উপর চোট-পাট্‌ করা থেকে নিরস্ত থাকেন।

এখন প্রশ্ন, স্বামীর যদি গলিত কুষ্ঠ হয়, কিম্বা সে যদি বদ্ধ উন্মাদ বর্তায়, যদি তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়, যদি সে বারবার কুৎসিত রোগ আহরণ করে স্ত্রীতে সংক্রামিত করে, যদি সে লম্পট বেশ্যাসক্ত হয় তবে কি স্ত্রী তাকে আইনত তালাক দিতে পারেন? না।

শুনেছি, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে 'তুমি আমার মায়ের মত' অর্থাৎ এই উক্তি দ্বারা সে প্রতিজ্ঞা করে যে স্ত্রীকে সে তার ন্যায্য যৌনাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে তবে নাকি সে স্ত্রী মোকদ্দমা করে আদালতের পক্ষ থেকে তালাক পেতে পারে॥

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইস্কুলে পড়ি; ষোল বছর বয়স। বিশ্বাস হয়, বিশ্ববিখ্যাত অবনীন্দ্রনাথ তাকে প্রথম দর্শনেই পূর্ণ দু'ঘণ্টা ধরে ভারতীয় কলার নবজাগরণের ইতিহাস শোনালেন?

সত্যই তাই হয়েছিল। আমার এক বন্ধু আমাকে নিয়ে গিয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের কাছে। তিন মিনিট যেতে না যেতেই তিনি হঠাৎ সোৎসাহে এক ঝটকায় হেলান ছেড়ে খাড়া হ'য়ে বসে আমাকে সেই প্রাচীন যুগের কথা— কি করে তিনি ছবি আঁকা শিখতে আরম্ভ করলেন, সে ছবি দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ কি বললেন, হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ, টাইকানের সঙ্গে তাঁর সহযোগ, ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির গোড়া পত্তন, নন্দলাল অসিতকুমারের শিষ্যত্ব আরো

কত কী যে বলে গেলেন তার অর্ধেক লিখে রাখলেও আজ একখানা সর্বাঙ্গ-সুন্দর কলা-ইতিহাস হ'য়ে যেত।

আর কী ভাষা, কী রঙ। আজ যখন পিছন পানে তাকাই তখন মনে মনে দেখি, সেদিন অবনীন্দ্রনাথ কথা বলেননি, সেদিন যেন তিনি আমার সামনে ছবি এঁকেছিলেন। রঙের পর রঙ চাপাচ্ছেন; আকাশে আকাশে মেঘে মেঘে সূর্যাস্ত সূর্যোদয়ে যত রঙ থাকে তার থেকে তুলে নিয়ে ছবির এখানে লাগাচ্ছেন, ওখানে লাগাচ্ছেন আর যতই ভাবি এর পর আর নতুন রঙ পাবেন কোথায় তখন দেখি, ভানুমতী দিয়ে তিনি যেন আরো নতুন নতুন রঙ বানিয়ে ছবির উপর চাপাচ্ছেন।

আর কী উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তাঁর সুখদুঃখ, তাঁর পতন-অভ্যুদয়ের অনুভূতি অজানা অচেনা এক আড়াই ফোঁটা ছোকরার মনের ভিতর সঞ্চালন করার প্রচেষ্টা! বুঝলুম, তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ভালোবেসেছেন ভারতীয় কলাশিল্পকে আর 'আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে' প্রদীপ্ত করে দিয়েছেন আমাদের দেশের নির্বাপিত কলাপ্রচেষ্টার অন্ধ-প্রদীপ।

তারপর একদিন তিনি এলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানেও আমি কেউ নই। রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল এবং নন্দলালের কৃতী শিষ্যগণ তাঁর চতুর্দিকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আম্রকুঞ্জে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, বিশ্বকবিরূপে, শান্তিনিকেতনের আচার্যরূপে। আর সেদিন রবীন্দ্রনাথ যে ভাষা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে শান্তি-নিকেতনে আসন নিতে অনুরোধ করলেন সে রকম ভাষা আমি রবীন্দ্রনাথের মুখে তার পূর্বে কিংবা পরে কখনো শুনিনি। রবীন্দ্রনাথ সেদিন যেন গদ্যে গান গেয়েছিলেন, আমার মনে হয়, সেই দিনই তিনি প্রথম গদ্যে কবিতা লেখা আরম্ভ করলেন। দেশবিদেশে বহু সাহিত্যিককে বক্তৃতা দিতে শুনেছি, কিন্তু এরকম ভাষা আমি কোথাও শুনিনি—আমার মনে হয়, স্বর্গে এই ভাষায় কথা বলেন—সেদিন যেন ইন্দ্রপুরীর একখানা বাতায়ন খুলে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উর্বশীর বীণা গুঞ্জরণ করে উঠেছিল।

অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আমি উত্তরায়ণের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি, অবনীন্দ্রনাথ সদলবলে আসছেন। আমাকে চিনতে পারলেন বলে মনে বড় আনন্দ হল।

তখন আমাদের সবাইকে বললেন, 'জানো, বৈজ্ঞানিকরা বড় ভীষণ লোক—আমাদের সব স্বপ্ন ভেঙে দেয়। এই দেখোনা, আজ সন্ধ্যায় আমি দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে দেখি কালো কালো মেঘ এসে বাসা বাঁধছে ভুবনডাঙ্গার ওপারে,

ডাক-বাঙলোর পিছনে। মেঘগুলোর সর্বাঙ্গে কেমন যেন ক্লান্তির ভাব আর বাসা বাঁধতে পেরে তারা একে অন্যকে আনন্দে আলিঙ্গন করছে।

রথী শুনে বলেন, 'মেঘ কোথায়? এ তো ধানকলের ধোঁয়া!'

এক লহমায় আমার সব রঙীন স্বপ্ন বরবাদ হয়ে গেল। তাই বলছিলুম, বৈজ্ঞানিকগুলো ভীষণ লোক হয়।'*

সে যাত্রায় যে ক'দিন ছিলেন তিনি যে কত গল্প বলেছিলেন, তরুণ শিল্পীদের কত অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন তার ইতিহাস, আশা করি, একদিন সেই শিল্পীদের একজন লিখে দিয়ে আমাদের প্রশংসাভাজন হবেন।

আবার সেই প্রথম দিনের পরিচয়ে ফিরে যাই।

আমি তখন অটোগ্রাফ শিকারে মত্ত। প্রথম গগনেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলুম, আমার অটোগ্রাফে কিছু এঁকে দিতে। তাঁর কাছে রঙ তুলি তৈরী ছিল। চট করে পাঁচ মিনিটের ভিতর আকাশে ঘন মেঘ আর তার ফাঁকে ফাঁকে গুটি কয়েক পাখী এঁকে দিলেন।

এর কয়েক দিন পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা কলকাতায় এসে 'বর্ষামঙ্গল' করে গিয়েছে। গগনেন্দ্রনাথ ছবি এঁকে দিয়ে বললেন, 'পাখিরা বর্ষামঙ্গল করছে।'

অবনীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করতে তিনি বললেন, 'তুমি নিজে ছবি আঁকো না কেন?'

আমি সবিনয়ে বললুম, 'আমি ছবি দেখতে ভালোবাসি।'

বললেন, 'দাও তোমার অটোগ্রাফ। তোমাকে কিছু একটা লিখে দিচ্ছি আর যেদিন তুমি তোমার প্রথম আঁকা ছবি এনে দেখাবে সেদিন তোমার বইয়ে ছবি এঁকে দেব।'

বলে লিখলেন, 'ছবি দেখে যদি আমোদ পেতে চাও তবে আকাশে জলে স্থলে প্রতি মুহূর্তে এত ছবি আঁকা হচ্ছে যে তার হিসেব নিলেই সুখে চলে যাবে দিনগুলো।

'আর যদি ছবি লিখে আনন্দ পেতে চাও তবে আসন গ্রহণ করো এক জায়গায়, দিতে থাকো রঙের টান্, তুলির পোঁচ। এ দর্শকের আমোদ নয়, স্রষ্টার আনন্দ।'॥

* পাঠক, অবনীন্দ্র যে ভাষায় বলেছিলেন তার সন্ধান এতে পাবেন না।

'জিদ-ওয়াইল্‌ড্'

আঁদ্রে জিদের বই এবং বিশেষ করে তাঁর 'জর্নাল'গুলো (ডায়েরী) বিশ্ব-বিখ্যাত। আর পাঁচজনের মত আমিও সেগুলো পড়েছি, তাঁর পরলোকগমনের পর ফ্রান্সদেশে তাঁর সম্বন্ধে যেসব লেখা বেরিয়েছে তারও কিছু কিছু নেড়েচেড়ে দেখেছি কিন্তু তবু মেনে নিতেই হল যে, ঠিক ঠিক হদিসটি পেলুম না—জিদকে ফেলি কোন পর্যায়ে, কপালে টিকিট সাঁটি কোন্ রঙের। অথচ গুরুর আদেশ জিদ সম্বন্ধে লিখতে হবে—উপায় কি?

একটা উপায় আছে, সেটি হচ্ছে জিদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আলোচনা করা। এই ধরুন না, অস্কার ওয়াইলড্। জিদ তাঁকে বিলক্ষণ চিনতেন এবং ওয়াইলড্ও তাঁকে স্নেহ করতেন। ওয়াইলড্ তখন খ্যাতনামা পুরুষ, প্যারিসে এলে তাঁর পিছনে ফেউ লেগে যেত। তার উপর ওয়াইলড্ বলতে পারতেন খাসা ফরাসী। জিদই তাঁর চটি বই 'অস্কার ওয়াইলডের স্মরণে'তে লিখেছেন 'ওয়াইল্‌ড্ অত্যুৎকৃষ্ট ফরাসী জানতেন তবু মাঝে মাঝে ভাণ করতেন যেন জুৎসই শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না—অবশ্য তখন তাঁর মতলব হত ঐ কথাগুলোর উপর বিশেষ করে জোর দেবার। উচ্চারণে তার প্রায় কোনো ভুলই ছিল না—শুধু ইচ্ছে করে দুটো একটা শব্দ এমনভাবে উচ্চারণ করতেন যাতে করে সেগুলো ভারী নূতন ধরণের চমক দিয়ে দিত। প্রথম যে সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় সেদিন তিনি একটানা আমাদের গল্প শুনিয়েছিলেন কিন্তু কেমন যেন খাপছাড়া খাপছাড়া আর সে সন্ধ্যার গল্পগুলো তাঁর সবচেয়ে ভালো গল্প বলেও ধরে নেওয়া যায় না। হয়ত ওয়াইলড্ আমাদের চিনতেন না বলে আমাদের পরখ করে নিচ্ছিলেন। ঐ ছিল তাঁর স্বভাব—তা সে বুদ্ধিমানের হোক আর বোকারই হোক—যে-লোক যে জিনিসের রস বুঝতে পারবে না তাকে তিনি সে জিনিস কক্‌খনো পরিবেশন করতেন না। যার যে রকম রুচি তাকে ঠিক সেই রকমেরই মাল দিতেন তিনি। যারা তাঁর কাছ থেকে কোনো জিনিসের প্রত্যাশা করত না তারা পেতও না কিছু—কিম্বা হয়ত পেত সামান্য একটুখানি গেঁজলা। আর সবচেয়ে তিনি পছন্দ করতেন খুশগল্প বলে পাঁচজনকে খুশ্ করে রাখতে, তাই অনেকেই যাঁরা ভেবে নিয়েছেন যে, তাঁরা ওয়াইলড্‌কে চিনতে পেরেছেন, তাঁরা শুধু তাঁকে চিনেছেন খুশি দেনে-ওয়ালা হিসেবে (amuseur=amuser)।"

জিদ এখানে একটুখানি ইঙ্গিত করেছেন যে, বেশীর ভাগ লোকই ওয়াইল্‌ড্‌কে চিনেছে কেমন যেন একটু 'ভাঁড়ু' 'ভাঁড়'রূপে এবং সেইটিই তাঁর আসল রূপ ছিল না।

মনে হচ্ছে এর থেকে জিদ কিঞ্চিৎ শিখে নিয়েছিলেন। কারণ, পূর্বেই তিনি বলেছেন 'ঐ ছিল তাঁর স্বভাব—তা সে বুদ্ধিমানের হোক আর বোকারই হোক—সবাইকে আপন রুচি অনুযায়ী পরিবেশন করার।' তাই বোধ করি, জিদ সেই প্রথম যৌবনেই মনস্থির করে ফেলেছিলেন যে, ওটা বোকারই কর্ম, আর তিনি অন্য কারোর রুচির বিলকুল তোয়াক্কা না করে টকটক হক কথা বলে যাবেন।

সে না হয় বুঝলুম। অপরকে টক কথা শুনিয়ে দেওয়া খুব কঠিন কর্ম নয়—আমরা সবাই জানা-অজানাতে হরদম করে থাকি—কিন্তু প্রশ্ন, নিজের সম্বন্ধে টক কথা পাঁচজনকে শুনিয়ে বলতে পারে কটা লোক? জিদ পারতেন কি না?

ওয়াইল্‌ড্‌ কোন্‌ অপরাধে জেলে গিয়েছিলেন সে-কথা সকলেই জানেন। জেল থেকে বেরিয়ে ওয়াইল্‌ড্‌ দেখেন লন্ডন-সমাজ তাঁর তাবৎ দরজা দড়াম করে তাঁর মুখের উপর বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি তখন গেলেন ফ্রান্স। প্যারিসেও গোড়ার দিকে ঐ একই অবস্থা হতে পারে ভেবে তিনি গেলেন একটি ছোট নির্জন শহরে। খবর পেয়ে জিদ তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটে গিয়ে জখমী ওয়াইল্‌ডের বিস্তর তত্ত্বতাবাশ করলেন। জিদ তাঁর অতি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন উপর্যুক্ত চটি বইয়ে। পাঁচজনে কি বলবে না বলবে তার তোয়াক্কা জিদ তখন করেননি; সে কথাটা তিনি না বললেও স্পষ্ট বোঝা যায়।

তারপর ওয়াইল্‌ড্‌ ফিরে এলেন প্যারিসে। জিদের সঙ্গে তাঁর দু'চার বার দেখা সাক্ষাৎ হল। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, প্যারিসও যে শুধু ওয়াইল্‌ডের হুঁকো-নাপিতই বন্ধ করেছে তা নয়, তাঁর বন্ধুবান্ধবের অনেকেও তাঁকে কুষ্ঠ-রোগীর মত বর্জন করতে আরম্ভ করেছেন। জিদ লিখেছেন, 'ওয়াইল্‌ড্‌ যখন দেখতে পেলেন দু'চারখানা দরজা তাঁর জন্য বন্ধ তখন তিনি আর কোনো দরজাতেই কড়া নাড়লেন না—ছন্নের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।'

এমন সময় একদিন জিদ দেখতে পেলেন, ওয়াইল্‌ড্‌ এক কাফের বারান্দায় বসে আছেন। 'স্বীকার করি, ও রকম জায়গায় হঠাৎ মোলাকাৎ হয়ে যাওয়াতে আমি একটুখানি অস্বস্তি অনুভব করলুম—চতুর্দিকে ভিড়। বন্ধু 'জি—' ও আমার জন্য ওয়াইল্‌ড্‌ দু'টো কক্‌টেল অর্ডার দিলেন। আমি তার মুখোমুখি হয়ে বসতে যাচ্ছিলুম যাতে করে লোকজনের দিকে পিঠ ফিরানো থাকে কিন্তু ওয়াইল্‌ড্‌ ভাবলেন, আমি পাশে বসতে বোকার মত নিরর্থক লজ্জা পাচ্ছি (হায়, ওয়াইল্‌ড্‌ সম্পূর্ণ ভুল করেননি) তাই পাশের চৌকি দেখিয়ে বললেন,

'আঃ, আমার পাশে এসে বসো না; আমি আজকাল বড্ড একলা পড়ে গিয়েছি।''

তারপর দু'জনাতে কি কথাবার্তা হ'ল সে কথা আরেক দিন হবে। উপস্থিত

লক্ষ্য করার বস্তু যে, জিদও জনমতের ঠেলায় কাবু হয়ে পড়েছিলেন। এবং যে ব্যবহার করলেন তাকে স্নবক্যাডের আচরণ বলা যেতে পারে। বাঙলা কথায় একদম ছোটলোকামি করলেন।

একদিন জিদ নির্ভয়ে যেচে গিয়ে ওয়াইল্‌ডের সঙ্গে দেখা করেছিলেন লোকনিন্দার পরোয়া না করে, এবং আশ্চর্য তাই নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র গর্ব করেননি এবং আজ যখন অন্যায় আচরণ করলেন তখনও সেটা লুকোলেন না। শুধু তাই নয়, পাঠক যাতে অতি নির্মমভাবেই তার মাথায় ঘোল ঢালতে পারে তাই কোনো প্রকারের অজুহাত বা আত্মনিন্দাও পেশ করলেন ন।

কি উপন্যাস, কি ছোট গল্প, কি জুর্নাল, সর্বত্রই জিদ এই আশ্চর্য সাধুতা দেখিয়েছেন॥ †

এষাস্য পরমগতি

প্রাচ্যভূমি থেকে শ্বেতের প্রাধান্য কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যেমন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নব নব আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছে, ঠিক তেমনি সংস্কৃতির ভূমিতেও নূতন নূতন চাষ-আবাদ আরম্ভ হয়েছে। চীন দেশ থেকে আরম্ভ করে ইন্দোনেশিয়া, ভারত-পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্থান, ইরান, আরব ভূমি পেরিয়ে এক দিকে মরক্কো পর্যন্ত এবং অন্য দিকে তুর্কী ইস্তক। সব-গুলোর খবর রাখা অসম্ভব—এতগুলো ভাষা শেখার শক্তি এবং সময় আছে কার?—তবু মোটামুটিভাবে তার খানিকটা জরিপ করা যায়।

তিনটে বড় বড় বিভাগ করে প্রাথমিক জরিপ করা যায়। চীন, ভারত-পাকিস্তান এবং আরব ভূমি। ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং তুর্কীকেও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু উপস্থিত সেগুলোকে হিসেবে নিলে আলোচনাটা একদম কব্জার বাইরে চলে যাবে।

এ তিন ভূখণ্ডেই দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃতির বাজারে দিশী-বিদেশী দুই মালই চলছে। দর্শন, বিজ্ঞানের তুলনায় সাহিত্যই উপস্থিত এ তিন ভূখণ্ডে সংস্কৃতির প্রধান বাহন—এবং সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি যে বস্তু লেখা এবং পড়া হচ্ছে সে হল উপন্যাস এবং ছোট গল্প। এ দুই জিনিসই প্রাচ্য দেশীয় নিজস্ব ঐতিহ্যগত সম্পদ নয়; ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজের কাছ থেকে শেখা। চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের বেলাও তাই—সেজান, রেনওয়া, রদাঁ এপস্টাইনের প্রভাব কি কাইরো কি কলকাতা সর্বত্রই দেখা যায়। ইয়োরোপীয় দর্শন এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে ভারত—কিছুটা কাইরো, তেলাভিভ

* Andre Gide: Oscar Wilde, In memoriam, Paris, Mercure de France.

এবং বাইরুৎ। একমাত্র ওস্তাদী সংগীতের বেলা বলা যেতে পারে যে, ইয়োরোপীয় প্রভাব এর উপর কোন চাপই দিতে পারেনি।

কিন্তু এরকম পদ গুণে গুণে ফিরিস্তি বানাতে গেলে একখানা ছোটখাটো বিশ্বকোষ লিখতে হয়। সেটা এড়াতে হলে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি নির্মিত হয় বিশেষ মনোবৃত্তি হৃদয়াবেগ দ্বারা। তার কিছুটা হদিস পেলে মোটামুটিভাবে বলতে পারা যায়, বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি চলছে কোন্ পথে।

শ্বেতের প্রভাব কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে আন্দোলন এ তিন ভূখণ্ডে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে 'ছুঁৎবাই', 'বিশুদ্ধীকরণ' বা 'সত্যযুগে প্রত্যাবর্তন' নাম দেওয়া যেতে পারে। এর প্রধান ধর্ম, বৈদেশিক সর্বপ্রকার প্রভাব বর্জন করে বিশেষ কোন প্রাচীন ঐতিহ্যকে নূতন করে চাঙ্গা করে তোলা। এই ভারতবর্ষেই কেউ চায় বৈদিক যুগে ফিরে যেতে (ক্রিয়াকাণ্ডে যাদের ভক্তি অত্যধিক), কেউ চায় উপনিষদের যুগ জাগাতে (দার্শনিক মনোবৃত্তি-ওয়ালারা), কেউ বা গুপ্ত যুগ (সাহিত্য-কলায় যাদের মোহ) কেউ বা ভক্তিযুগে (বৈষ্ণবজন) ডুব মারতে চান। কেউ বলেন, রবরের জুতো পরে কাঁচা শাকসব্জী খাও, কেউ বলেন, ছেলেমেয়েরা বড্ড বেশি মেশামিশি করছে, তাদের সিনেমা যেতে বারণ করে দাও। পাকিস্তানে এ আন্দোলন 'ইসলামী রাষ্ট্রের' নামে শক্তি-সঞ্চয় করতে চায়। কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কট্টর মৌলানারা এ-দলেরই শামিল। ইন্দোনেশিয়ায় এদেরই নাম দার-উল-ইসলাম সম্প্রদায়। ইবন-ই-সউদ গোষ্ঠীর ওয়াহ্হাবী আন্দোলন এই মনোবৃত্তি নিয়েই আরম্ভ হয়। এ-দলের মান্দারিনরা চীনে কিন্তু বিশেষ পাত্তা পাচ্ছেন না।

প্রমাণ করতে পারবো না, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বানচাল হবে। তার প্রধান কারণ, কোন দেশেরই যুবক সম্প্রদায় এ আন্দোলনে যোগ দিতে রাজী হচ্ছে না।

দ্বিতীয় আন্দোলন ঠিক এর উল্টো। এর চাঁইরা বলেন, 'প্রাচ্য প্রাচ্য করে তো ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজের হাতে মার খেলে বিস্তর। প্রাচ্য ঐতিহ্য সর্ব-প্রকার প্রগতির 'এনিমি নাম্বার ওয়ান।' আমাদের সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য-সংস্কৃতি প্রচেষ্টা যদি আধুনিকতম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে বিজড়িত না হয়, তবে তার কোন প্রকারেই ভবিষ্যৎ নেই।' এ আন্দোলনের বড়কর্তাদের অধিকাংশই কম্যুনিস্ট ভায়ারা। এঁদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের রংঢং সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিত্তোৎপাদন এবং ধন-বণ্টন পদ্ধতির উপর এবং যেহেতু প্রাচ্যভূমিও একদিন মার্কসের অলঙ্ঘ্য নিয়মানুযায়ী প্রলেতারিয়ারাজে পরিণত হবে, সেই হেতু প্রাচ্যেরও সংস্কৃতি গড়ে উঠবে গণ-নৃত্য, গণনাট্য, গণ-সাহিত্যের উপর। তাই ঐতিহ্যগত সর্বপ্রকার বৈদগ্ধ্য-সংস্কৃতি 'বুর্জুয়া'—সুতরাং বর্জনীয়।

ভারত-পাকিস্তানে এ আন্দোলন সুবিধে করে উঠতে পারছে না, কিন্তু বিশেষ করে তুর্কীতে এবং কিছুটা কাইরো বাইরুতে এর প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কম্যুনিস্ট ছাড়াও বহু যুবকযুবতী এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তার অন্যতম কারণ অবশ্য এই যে প্রথম আন্দোলনে যোগ দিতে হলে ক্ল্যাসিক্‌স্‌ পড়তে হয়, সঙ্গীতের শখ থাকলে দশ বছর সা রে গা মা করতে হয়, কুরাণ-হদিস কণ্ঠস্থ করতে হয়—তাতে বয়নাক্কা বিস্তর। এতো হাঙ্গামা পোয়ায় কে? তাই দ্বিতীয়টাই সই।

এ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ঠিক করবেন ট্রুমান স্তালিন। আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।

তৃতীয় আন্দোলন প্রাচ্যভূমিতে আরম্ভ করেন রাজা রামমোহন। তাঁর প্রচেষ্টা বাঙালী পাঠককে নূতন করে বলতে হবে না। প্রাচ্যভূমির ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ মিলিয়ে নিয়ে তিনি নব নব সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ তাঁর স্বপ্নকে বৈদগ্ধ্যের বহু ক্ষেত্রে মূর্তমান করেছেন। কাইরোর তাহা হোসেন, বাইরুতের খলীল গিবরানী, ঢাকার বাঙালী সাহিত্যিক সম্প্রদায়, লাহোরে ইকবালের শিষ্যমণ্ডলী এবং ইন্দোনেশিয়ার সুতান শহরীর এ সম্প্রদায়ভুক্ত।

বিশেষ করে সুতান শহরীরের নাম ভক্তি ভরে স্মরণ করতে হয়। জাভা সুমাত্রা বালীর অনাড়ম্বর জীবন যাপন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে সদানন্দ কৃত্রিমতা বিবর্জিত সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয়ায় এত দিন ধরে গড়ে উঠেছে, ওলন্দাজ বর্বরতা যাকে বিনষ্ট করতে পারেনি, সেই সংস্কৃতির সঙ্গে শহরীর চান উত্তম উত্তম ইয়োরোপীয় চিন্তাবৃত্তি, অনুভব সম্পদ যোগ দিয়ে নূতন সভ্যতা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। এবং সে চাওয়ার পিছনে রয়েছে শহরীরের নিরঙ্কুশ আত্মত্যাগ আর কঠোরতম সাধনা। বিশ্বসংসারের সব আন্দোলন সব প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি নিজকে অহরহ সংযুক্ত রেখে সেই পন্থার অনুসন্ধান করছেন, যে পন্থা শুধু যে ইন্দোনেশিয়ার চিন্তাবিকাশ কলাপ্রকাশ মূর্তমান করবে তাই নয়, তাবৎ প্রাচ্যভূমি তার থেকে অনুপ্রেরণা আহরণ করতে পারবে।

এ পন্থা অন্বেষণে নিজকে অহরহ সজাগ রাখতে হয়—গীতার সংযমী, যিনি সদাজাগ্রত তিনিই এ মার্গের অধিকারী। শহরীর এ মার্গের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

এষাস্য পরমাগতি॥

গিরিজা মুখুয্যে দেশে থাকতে বার দুই জেলে যান—সে কিছু না, নস্যি। (কেন বলছি, বাকিটুকু পড়লেই বুঝতে পারবেন) তারপর ছিটকে গিয়ে লণ্ডন, সেখান থেকে প্যারিস। দিব্য আছেন, সর্‌বন্‌ যান, ফরাসী গুণীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, দু পয়সা কামানও বটে। এমন সময় দেখা গেল, জর্মনরা প্যারিসের ঘাড়ে এসে পড়ল বলে। মুখুয্যে গুটিকয়েক ফরাসী আত্মজনের সঙ্গে আর সব লক্ষ লক্ষ ফরাসীদের মত দক্ষিণের পথ ধরলেন। পায়ে হেঁটে, মাল বোঝাই বাইসিকেল কিম্বা হাত-গাড়ি ঠেলে ঠেলে যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তিতে ভিরমি যাবার উপক্রম (ওদিকে মনে মনে ভাবছেন, জর্মনদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন), তখন হঠাৎ মালুম হল, জর্মন বাহিনী তাঁকে পিছনে ফেলে রাতারাতি অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। তখন সামনে পিছনে সবই সমান; ফিরে এলেন প্যারিস।

মুখুয্যে ভারতীয়, কাজেই ইংরেজের দুশমন। কিন্তু তাহলে কি হয়—পাসপোর্টে যে পাকাপোক্ত ইস্টাম্পো মারা রয়েছে, মুখুয্যে ব্রিটিশ প্রজা, অর্থাৎ তিনি জর্মনির শত্রু। কাজেই যদিও পাদমেকং ন গচ্ছামি করে আপন কুঠুরীতে শুবু-শাম ঘাপটি মেরে বসে থাকতেন, তবু

একদা কেমনে জানি ভারতীয় মহাশয়
পড়িলেন ধরা, আহা, দুরদৃষ্ট অতিশয়।

জর্মন পুলিশের তদারকিতে ফরাসী জেলখানায় মুখুয্যে তখন ইষ্টদেবতার নাম জপ করতে লাগলেন। সে-জেলে ইংরেজের শত্রু-মিত্র বিস্তর 'ব্রিটিশ' প্রজার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল। তার বর্ণনাটি মনোরম।

কিছুদিন পর জেল থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।

তখন নাম্বিয়ার তাঁকে বললেন, তাঁর সঙ্গে বার্লিন যেতে। সেখানে গিয়ে দেখেন, সুভাষচন্দ্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য হরেক রকম তরিবৎ-তত্ত্বতাবাশ আরম্ভ করে দিয়েছেন। মুখুয্যেকে 'আজাদ হিন্দ' বেতারে বেঁধে দেওয়া হল নানা প্রকারের ব্রডকাস্টের জন্যে। সুভাষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগাযোগ হল। গ্র্যাণ্ড মুফতির সঙ্গেও বিস্তর দহরম মহরম হল।

সুভাষ সম্বন্ধে মুখুয্যে অনেক কিছু লিখেছেন। উপাদেয়।

তারপর সুভাষ দেখলেন, বার্লিনে থেকে কাজ হবে না। ওদিকে ইংরেজ সিঙ্গাপুর শিঙে ফুঁকেছে। জাপানীরা বর্মায় ঢুকছে। সুভাষ চলে গেলেন জাপান। এদিকে 'আজাদ হিন্দ' বেতার দড়কচ্চা মেরে গেল। মুখুয্যেরা কিন্তু ক্ষান্ত দেননি।

তারপর জর্মনির পতন আরম্ভ হল। বোমার ঠেলায় বার্লিনে কাজ করা দায়। তাবৎ ভারতীয়কে সরানো হল হল্যাণ্ডে; সেখান থেকে 'আজাদ হিন্দের' বেতারকর্ম চালু থাকলো বটে, কিন্তু মুখুয্যেরা বুঝলেন, সময় ঘনিয়ে এসেছে। তারপর প্রায় সবাই একে একে ফিরে এলেন বার্লিন। সেখান থেকে মুখুয্যে গেলেন দক্ষিণ-জর্মনিতে। ইতিমধ্যে রাশানরা ঢুকল বার্লিনে।

এবারে তিনি আইনত রাশার শত্রু। কারণ রাশার মিত্র ইংরেজের বিরুদ্ধে তিনি বিস্তর বেতার বক্তৃতা ঝেড়ে বসে আছেন। আইনত তিনি অ্যামেরি, হো হো'র সমগোত্র। কাজেই পালাতে হল 'নিরপেক্ষ' সুইটজারল্যাণ্ডে। এক দরদী জর্মন সীমান্ত পুলিশই তাঁকে বাৎলে দিলে কি করে নিশুতি রাতে রাইন নদী সাঁৎরে ওপারে যাওয়া যায়।

আমরা ভাবি, সুইসরা বড্ডই নিরপেক্ষ মোলায়েম জাত। মুখুয্যে সেখানে যে বেইজ্জতি আর লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে গেলেন, তার বর্ণনা আমি আর এখানে দিলুম না।

সুইসরা মুখুয্যেকে আত্মহত্যার দরজায় পৌঁছিয়ে হঠাৎ একদিন প্রায় 'কানে ধরে' ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিল জর্মনিতে। জর্মনির যে অঞ্চলে তাঁকে ফেরৎ-ডাকে পাঠানো হল, সেটি তখন ফরাসীর তাঁবেতে। কাজেই তাঁকে পত্রপাঠ গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু মুখুয্যে যখন কমাণ্ডাণ্টকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি জর্মনিতে যা কিছু করেছেন, সে শুধু 'পাত্রি'র (দেশের) জন্য, তখন ফরাসীরা—আর এ শুধু ফরাসীরাই পারে—মুখুয্যের বিগত জীবনটা যেন বেবাক ভুলে গেল। শুধু তাই নয়, খেতে পরতে দিল। বলল, 'তুমি যখন দিব্য ফরাসী-জর্মন জানো, তখন আমাদের সঙ্গে থেকে কাজ করো না কেন?' তাই সই। ব্যবস্থাটা স্থানীয় জর্মনদেরও মনঃপূত হল—অবশ্যি বিজয়ী ফরাসীরা তখন তার থোড়াই পরোয়া করত—কারণ মুখুয্যে তাদের সামনে 'বিজয়ী বীরের' মূর্তিতে দেখা দেননি।

তারপর সেই ফরাসী রেজিমেণ্ট দেশে চলে গেল। মুখুয্যের আবার জেল। ইংরেজ তখন অ্যামেরি হো হো'র মত মুখুয্যেকে পেলে তাঁকেও ঝোলায়।

কিন্তু ঝোলাবার সুযোগ পায়নি। ফরাসীরা মুখুয্যেকে ইংরেজের হাতে তুলে দেয়নি।

তারপর স্বরাজ হয়ে গেল। দেশের ছেলে দেশে ফিরে এল।

কিন্তু বইখানা মুখুয্যের আত্মজীবনী নয়। বইটিতে মুখুয্যে ইয়োরোপ দেখেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা পটপরিবর্তনের সামনে, পয়লা সারিতে বসে। উত্তম বই।*

---

* Girija Mukherjee, This Europe. Saraswaty Library, Calcutta.

শমীম

আমার বন্ধু শমীম মারা গিয়েছে। শমীম এ-সংসারে কোন কীর্তি রেখে যেতে পারে নি, যার জন্যে লোকে সভাস্থলে কিংবা কাগজে শোক প্রকাশ করবে। তার আত্মজন এবং নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া তাকে কেউ বেশিদিন স্মরণ করবে না।

তার কথা আপনাদের জোর করে শোনাবার অধিকার আমার নেই, কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি, শমীম কোন কীর্তি রেখে যেতে পারেনি। তবু যে কেন তার সম্বন্ধে লিখছি, তার কারণ সে আমার বন্ধু, আর তাই আশা, আমার বহু সহৃদয় পাঠক সেই সূত্রে তাকে স্নেহের চোখে দেখবেন, এবং বহু দেশ দেখার পর বলছি, ওরকম সচ্চরিত্র ছেলে আমি কোথাও দেখিনি।

শমীম আমার ছেলের বয়সী। তার জন্মের প্রায় প্রথম দিন থেকেই আমি তাকে চিনি। আর এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে সে জন্মাল, আর সে সৌন্দর্য দিন দিন এমনি বাড়তে লাগল যে, বাড়িতে যে আসত, সে-ই ছেলেটির দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারত না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল, কী বিনয়নম্র ভদ্রসংযত ব্যবহার এবং পরদুঃখকাতর হৃদয় ভগবান তাকে দিয়েছেন। আমি নিশ্চয়ই জানি বাড়ির ভিতরে বাইরে এমন কেউ ছিল না যে শমীমের উপর বিরক্ত হয়েছে কিংবা রাগ করেছে।

কিন্তু তবু বলব, শমীম মন্দ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছিল।

ধরা পড়ল সে সন্ন্যাস রোগে ভুগছে। সন্ন্যাসের চিকিৎসা আছে কি না জানিনে, কিন্তু একথা জানি, তার পিতা (আমার অগ্রজ-প্রতিম) চিকিৎসক হিসেবে আর আমরা পাঁচজনে বন্ধুবান্ধব হিসেবে তার চিকিৎসার কোন ত্রুটি করিনি। আর মায়ের সেবা সে কতখানি পেয়েছিল, সেকথা কি বলবো? সর্ব-কনিষ্ঠ চিররুগ্ন কোন্ ছেলেকে তার মা হৃদয় উজাড় করে সেবা-শুশ্রূষা করে না?

ভগবান এতেও সন্তুষ্ট হলেন না,—তাকে দিলেন মারাত্মক টাইফয়েড জ্বর। আমি দেশে ছিলুম না, ফিরে এসে দেখি জ্বর যাবার সময় শমীমের একটি চোখ নিয়ে গিয়েছে। আমি অনেক দুঃখকষ্ট অবিচার-অত্যাচার দেখেছি, সহজে কাতর হইনে, কিন্তু শমীমের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যে আঘাত পেয়ে-ছিলুম সে আঘাত যেন আমার চেয়ে দুর্বল লোককে ভগবান না দেন।

শমীমের বাপ খুড়ো ঠাকুর্দা সকলেই গম্ভীর প্রকৃতির—শমীমও ছেলেবেলা থেকে শান্তস্বভাব ধরত, এখন সে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর হতে লাগল। পড়াশোনা

তার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং কখনো যে করতে পারবে সে ভরসা ক্রমেই ক্ষীণ হতে লাগল। হয়ত তাই নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করত—আশ্চর্য কি, যে ছেলে অল্পবয়সে লেখাপড়ায় সকলের সেরা ছিল তার সব লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত মর্মন্তুদ ব্যাপার কি হতে পারে?

বিশ্বাস করবেন না, ঐ গাম্ভীর্যের পিছনে কিন্তু তার ছিল প্রচুর রসবোধ। আমাকে খুশি করবার জন্য সে আমাদের বাড়ি —নং পার্ল রোড সম্বন্ধে একটি রচনা লেখে। তাতে আমাদের সকলের রসময় (অনেকটা আইরিশ ধরণের হিউমার) বর্ণনার পর ছিল উপরের তলার তার দাদামশায়ের বর্ণনার ফিনিশিং টাচ্। দাদামশায় আসলে কুষ্টিয়ার লোক, 'এটা' 'সেটা' না বলে বলেন 'ইডা', 'সিডা', আর বুড়োমানুষ বলে সমস্ত দিন বাড়ির এঘর ওঘর করে বেড়ান। তার বর্ণনা শমীম দিল এক লাইনে—'আর দাদামশাই তো সমস্ত দিন 'ইডা' 'সিডা' নিয়েই আছেন।'

শমীমের বড় ভাই শহীদ তখন প্রেমে পড়েছে। মেয়েটির নাম হাসি। খানার টেবিলে একদিন জল্পনাকল্পনা হচ্ছে, একটা চড়ুই-ভাত করলে হয় না? শহীদ গম্ভীর হয়ে বসে আছে—আমি শুধালুম, 'তুমি আসছো তো।' শহীদ বলল 'না'।

শমীম বলল 'ও আসবে কেন? আমরা তো 'হাসি' না।'

অর্থাৎ তার ডার্লিং 'হাসি' তো আমাদের সঙ্গে চড়ুই-ভাতে আসবে না এবং, আহা, শহীদ কতই-না jolly chap—আমরাই শুধু গম্ভীর!

কিন্তু আমাকে সব চেয়ে মুগ্ধ করত তার পরোপকার করার প্রচেষ্টা। ৪৭এর দাঙ্গার সময় আমাদের বাড়িতে প্রায় সত্তর জন হিন্দু নরনারী আশ্রয় নেন—আমি তখন দক্ষিণে—ফিরে এসে শুনি গুণ্ডারা বাড়ি আক্রমণ করেছিল, শমীম নির্ভয়ে এদের সেবা করেছে; আমি আশ্চর্য হইনি।

তার পর ৫০ সনে হোলির কয়েকদিন আগে যখন সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে বিস্তর মুসলমান নরনারী এসে আমাদের পাড়ায় আশ্রয় নিল তখন শমীম তার মা, বাবা, বোনের সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে তাদের সেবা করল, তার বাবার ডিসপেনসারিতে বসে রুগীদের জন্য ওষুধ তৈরি করাতে, ইনজেকশন-ভেকসিনেশন দেওয়াতে সর্বপ্রকারে সাহায্য করলে। পৃথিবীর সবাই শমীমকে ভুলে যাবে কিন্তু দু একটি আর্ত হয়ত এই সুহাস, সুভাষ, প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে মনের কোণে একটুখানি ঠাঁই দেবে।

সেই সময় দিল্লীর এক হিন্দু ভদ্রলোক আমাদের এবং পাড়ার মুসলমানদের অনেক সাহায্য করেন। আমরা স্থির করলুম, দিল্লীর লোক, এঁকে নিমন্ত্রণ করে কোর্মা-পোলাও খাওয়াতে হবে। সব ঠিক, এমন সময় শমীম তার মাকে গিয়ে বলল, 'এই দুর্দিনে লোকে খেতে পাচ্ছে না, আর তোমরা

দাওয়াত করে খাওয়াচ্ছ কোর্মা-পোলাও! আমি তা হলে খাব না। যদি নিতান্তই খাওয়াতে হয়, তবে খাওয়াও আমরা যা রোজ খাই।'

আমরা মামুলি খানাই পরিবেশন করেছিলুম।

খবর পেলুম, শমীম ট্রেনের সামনে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি কিছুই ভাবতে পারছিনে। এত সহৃদয়, পরোপকারী ছেলে বুঝতে পারল না যে তার মা, বাপ, খুড়ো, ভাই, বোন, আমাকে তার বন্ধু শুকুরকে এতে কতখানি আঘাত দেবে?

দিনেন্দ্রনাথ

'দেশে'র ৪১শ সংখ্যায় শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে দিনেন্দ্রভক্ত, দিনেন্দ্র-সখাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। গুপ্ত মহাশয় দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়, দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্ব এবং তথ্য, দিনেন্দ্রনাথের মধুর, সহৃদয়, বন্ধুবৎসল যে বর্ণনা তার সঙ্গে আমার মনে দিনেন্দ্রনাথের যে ছবি আছে সেটি হুবহু মিলে গেল। একাধিকবার ভেবেছি, দিনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত অল্প লোকই লিখেছেন যে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার যেটুকু জানা আছে তাই লিখে ফেলি, কিন্তু প্রতিবারেই মনে হয়েছে, দিনেন্দ্র-জীবন আলোচনা করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই। গুপ্ত মহাশয় এখন আমার কর্তব্যটি সরল করে দিলেন। আমার বক্তব্যের কোনো কথা যদি গুপ্ত মহাশয়ের কাজে লেগে যায়, তবে আমি শ্রম সাফল্যের আনন্দ পাব।

স্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-মন্দিরে যে বক্তৃতা দিতেন, তা অতুলনীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করি, যেদিনকার উপাসনা দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত দিয়ে আরম্ভ হত সেদিন সে সঙ্গীত যেন আমাদের মনকে রবীন্দ্রনাথের উপাসনার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত এবং উন্মুখ করে তুলত। দিনেন্দ্রনাথের বিশাল গম্ভীর কণ্ঠ আমাদের হৃদয়মন ভরে দিত, তার পর সমস্ত মন্দির ছাপিয়ে দিয়ে ডাঙা-খোয়াই পেরিয়ে যেন কোথা থেকে কোথা চলে যেত। তাই আমার সব সময় মনে হয়েছে দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠ এক জনকে শোনাবার জন্য, এমন কি একটা সম্পূর্ণ আসরকেও শোনাবার জন্য নয়, তাঁর কণ্ঠ যেন ভগবান বিশেষ করে নির্মাণ করেছিলেন সমস্ত দেশের জনগণকে

শোনাবার জন্য। তাই বোধহয় তাঁর কণ্ঠে যে রকম 'জনগণমন অধিনায়ক' গান শুনেছি আজ পর্যন্ত কারো কণ্ঠে সে রকম ধারা শুনলুম না।

এ রকম গলা এ দেশে হয় না—এ গলার ভলুম পেলে ইতালির শ্রেষ্ঠতম অপেরা-গাইয়ে জীবন ধন্য মনে করেন।

হয়ত আমার কল্পনা, কিন্তু প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, মন্দিরে দিনেন্দ্রনাথের সংগীত যেন অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠতর ধর্মব্যাখ্যানে অনুপ্রাণিত করেছে।

একথা সবাই জানেন, দিনেন্দ্রনাথ যে শুধু গায়কই ছিলেন তাই নয়, তিনি অতিশয় উচ্চদরের সংগীতরসজ্ঞও ছিলেন। কি উত্তর কি দক্ষিণ, কি ইয়োরোপীয় সর্বসংগীতের সর্ববাদ্যের খবর তিনি তো রাখতেনই—তার উপর তিনি জানতেন কি করে গায়ক এবং যন্ত্রীকে উৎসাহ দিয়ে দিয়ে তার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য টেনে বের করে আনতে হয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর হয়ে গিয়েছে, তাই আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে বোধহয় সে গুণীর নাম ছিল সংগমেশ্বর শাস্ত্রী, পিঠাপুরম্ মহারাজের বীণকার—তিনি এসেছেন রবীন্দ্রনাথকে বীণা শোনাতে। রবীন্দ্র আর দিনেন্দ্রনাথ উদ্গ্রীব হয়ে বসেছেন; তার পর আরম্ভ হল বীণাবাদন।

আমার সন্দেহ হয়েছিল দক্ষিণের গুণীর মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধা ছিল, উত্তর ভারতের শান্তিনিকেতন তাঁর সংগীত সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে কি না। দশ মিনিট যেতে না যেতেই রবীন্দ্রনাথ আর দিনেন্দ্রনাথ যেমন যেমন তাঁদের সূক্ষ্ম রসানুভূতি ঘাড় নেড়ে, মৃদু হাস্য করে, বা বাহবা বলে প্রকাশ করতে লাগলেন সঙ্গে সঙ্গে সংগমেশ্বর বুঝতে পারলেন তিনি যে সমজদার শ্রোতার সামনেই বাজাচ্ছেন তাই নয়, এ রকম শ্রোতা তিনি জীবনে পেয়েছেন কমই। সে রাত্রে ক'টা অবধি মজলিস্ চলেছিল আজ আর ঠিক মনে নেই, তবে শান্তিনিকেতনের 'খাবার ঘণ্টা'র অনেক পর অবধি—বার'টা হতে পারে, দুটোও হতে পারে।

সে যুগে ইয়োরোপ থেকেও বহু কলাবৎ আসতেন রবীন্দ্রনাথকে গান কিংবা বাজনা শোনাতে। দু'জনকে স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু নাম ভুলে গেছি। একজন ডাচ মহিলা গাইয়ে (বিনায়করাও এর নাম স্মরণ করতে পারবেন) এবং অন্যজন বেলজিয়ান বেহালা-বাজিয়ে। ডাচ মহিলাটি খুব বেশি দিন আশ্রমে থাকেন নি, কিন্তু বেলজিয়ানটি দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে একদম জমে যান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বাজিয়ে যেতেন—ভদ্রলোক দিনে অন্ততঃ বারো ঘণ্টা আপন মনে, একা একা, বেহালা বাজাতেন—আর দিনেন্দ্রনাথ তাঁর সূক্ষ্মতম কারুকার্যের সময় মাথা নেড়ে নেড়ে রসবোধের পরিচয় দিয়ে তাঁর উৎসাহ বাড়াতেন।

বেলজিয়ানটি দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকেও অনেক কিছু শিখেছিলেন—তার অন্যতম, সিগার বর্জন করে গড়গড়া পান। আশ্রম ছাড়ার দিন ভদ্রলোক দুঃখ

করে আমাকে বলেছিলেন, 'দেশে যেতে মন চাইছে না, সেখানে তামাক পাবো কোথায়?' যদিস্যাৎ পেয়ে যান সেই আশায় ভদ্রলোক তাঁর আলবোলাটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথ সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ সমঝদার ছিলেন। প্রাপ্তবয়সে তিনি ফরাসীও শিখেছিলেন এবং স্বচ্ছন্দে ফরাসী উপন্যাস পড়তে পারতেন। ওদিকে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতি ছিল তাঁর গভীর প্রেম। তাই কি লেভি, কি উইনটার্‌নিৎস্‌ সকলের সঙ্গে ছিল তাঁর হৃদ্যতা। বিদেশীকে কি করে খানা খাইয়ে, আড্ডা জমিয়ে, সঙ্গীতের চর্চা করে, সৌজন্যতা ভদ্রতা দেখিয়ে —আমি একমাত্র দিনেন্দ্রনাথকেই চিনি যিনি পৃথিবীর সকল জাতের লোকেরই ম্যানারস্‌ এটিকেট জানতেন—তার দেশের কথা ভুলিয়ে দেওয়া যায় এ কৌশল তাঁর যা রপ্ত ছিল এর সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। তাই তাঁর বাড়ি ছিল বিদেশীদের কাশীবৃন্দাবন।

দিনেন্দ্রনাথ গাইতে পারতেন, বাজাতে জানতেন, অন্যের গানবাজনার রস চাখতে পারতেন এ-কথা পূর্বেই নিবেদন করেছি; তদুপরি তিনি ছিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ। এ বড় অদ্ভুত সমন্বয়। শাস্ত্রজ্ঞের রসবোধ কম, আবার রসিক-জন শাস্ত্রের অবহেলা করে—দিনেন্দ্রনাথ এ নীতির ব্যত্যয়—শাস্ত্রের কচকচানি তিনি ভালোবাসতেন না কিন্তু সঙ্গীতের বিজ্ঞানসম্মত চর্চার জন্য যেখানেই শাস্ত্রের প্রয়োজন হত, তিনি সেখানেই সত্য শাস্ত্র আহরণ করে ছাত্রের সঙ্গীত-চর্চা সহজ-সরল করে দিতে জানতেন।

আমাদের ঐতিহ্যগত রাগপ্রধান সঙ্গীতচর্চার জন্য প্রাচীন অর্বাচীন বহু শাস্ত্র আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ যুগে সঙ্গীতের যে নূতন ভুবন সৃষ্টি করে দিলেন, তার রহস্য ভেদ করার জন্য কোনো প্রামাণিক শাস্ত্র নেই। এ-শাস্ত্র নির্মাণ করার অধিকার একমাত্র দিনেন্দ্রনাথেরই ছিল। বহু অনুনয়-আবেদন করার পর তিনি সে-শাস্ত্র রচনা করতে সম্মত হলেন।

কয়েকটি অধ্যায় তিনি লিখেছিলেন। সেগুলি অপূর্ব। শুধু যে সেগুলিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত 'দর্শনের' সন্ধান মেলে তাই নয় সেগুলিতে ছিল ভাষার অতুলনীয় সৌন্দর্য, অমিত ঝঙ্কার—সে ভাষার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি একমাত্র 'কাব্যের উপেক্ষিতার' ভাষা।

এ শাস্ত্র তিনি কখনো সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন কিনা জানিনে। হয়ত আমার ভুল, কিন্তু প্রথম অধ্যায়গুলো শুনেই আমার মনে হয়েছিল এ ছন্দে শেষরক্ষা করা সহজ কর্ম নয়। এর জন্য যতখানি পরিশ্রমের প্রয়োজন, দিনেন্দ্র-নাথের হয়ত ততখানি নেই।

আমি দিনেন্দ্রনাথের নিন্দে করছিনে। কিন্তু আমি জানি তিনি গান গাইতে, বাজনা বাজাতে, গানবাজনা শুনতে, সাহিত্যরস উপভোগ করতে, প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে, আড্ডা জমাতে, বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াতে, বিদেশীদের আদর-

আপ্যায়ন করাতে এত আনন্দ পেতেন যে কোনো প্রকারের কীর্তি নির্মাণ করাতে ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ, নিরঙ্কুশ বীতরাগ।

নাই বা হল সে শাস্ত্র সে কীর্তি গড়া! আজ যদি দিনেন্দ্র-শিষ্যেরা আপন আপন নৈবেদ্য তুলে ধরেন, তবে তার থেকেই নূতন শাস্ত্র গড়া যাবে॥

ভারতীয় নৃত্য

নৃত্য জীবনীশক্তির চরম বিকাশ। যে-সব কলা দ্বারা মানুষ তাহার সৌন্দর্যানুভূতি প্রকাশ করে, তাহাদের গভীরতম মূল নৃত্যরস হইতে প্রাণ-সঞ্চয় করে। অন্যান্য কলা সৃষ্ট হইবার বহু পূর্বে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত, আড়ম্বরহীন নৃত্য দ্বারা তাহার অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছে—অপরের হৃদয়ে সেই রস সঞ্চারিত করিবার জন্য এই সরল কলাই তখন তাহার একমাত্র আশ্রয় ছিল। আদিম মানবের বাদ্যযন্ত্র ছিল না, ধ্বনি বিশ্লেষণ করিয়া সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে সে তখনও শিখে নাই, প্রতিমা নির্মাণের যন্ত্রপাতি তাহার ছিল না, চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম তাহার কাছে তখনও অজানা। অনুভূতি প্রকাশ করিবার একমাত্র পন্থা ছিল তাহার নিজের দেহ; সেই দেহ সে সাবলীল ছন্দে তালে তালে আন্দোলিত করিয়া তাহার সুখ-দুঃখ, ভয়-ঘৃণা প্রকাশ করিত। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনুভূতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল—নৃত্যও তাহার সঙ্গে যোগ রাখিয়া সুকুমার কলায় পরিণত হইল; মানুষ নৃত্য দ্বারা তাহার সূক্ষ্মতম ও গভীরতম অনুভূতিকে রূপ দিতে শিখিল।

সলীল ছন্দে, তালমানযোগে দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আন্দোলন দ্বারা মানুষ যখন তাহার জীবনীশক্তির চরম সত্তাকে সপ্রকাশ করিয়া তুলে তখনই তাহা নৃত্যের রূপ ধারণ করে। নৃত্য তখন মানুষের নব নব সৌন্দর্যানুভূতি, সত্যের সঙ্গে তাহার অন্তরতম পরিচয় নব নব রূপে উন্মোচন করিয়া প্রকাশ করে। তাই শুদ্ধ, অকৃত্রিম নৃত্য সম্পূর্ণ বাধাবন্ধহীন। দেশ ও কালের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে তাহাকে রুদ্ধ করা, কুসংস্কার দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন করার অর্থ আর কিছুই নয়—তাহার অফুরন্ত জীবন উৎসকে রুদ্ধ করা, তাহার পঙ্গু করা। আমাদের দেশের হৃদয় একদিন স্বতঃস্ফূর্ত, বাধাবন্ধহীন নৃত্যচ্ছন্দে আন্দোলিত হইয়াছিল, আজ সেই ধারা বন্ধ হইয়া ব্যবসায়ী নটনটীদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্ধকূপের সৃষ্টি করিয়াছে। রোগজীর্ণ, বিষাক্ত, বিলাসব্যসনীদের উত্তেজনা দানেই আজ তাহার চরম আনন্দ, পরম লাভ। ক্ষুদ্র হৃদয়ের অবসর বিনোদন ও ক্ষণস্থায়ী চিত্তচাঞ্চল্যের প্রকাশ করাকেই এখন নৃত্যের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের সুস্থবুদ্ধি পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে; নৃত্যের বিকৃত বিকলাঙ্গ দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্জীবিত হইতেছে। ভারতীয় নৃত্যের নবজীবন সন্ধিক্ষণের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ভারতের উচ্চাঙ্গ ও জনপদ নৃত্যের বিভিন্ন ধারার সহিত পরিচিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি অনুন্নত জাতির ভিতরে যে-সব নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে রহিয়াছে ফসল কাটা, নবান্নের আনন্দ অথবা বৃষ্টিপাত, ঝঞ্ঝাবাত, ভূতপ্রেতের লীলাখেলা। বসুন্ধরার আদিম সন্তান নৃত্য-যোগে প্রয়োজনমত কখনো প্রকৃতির রুদ্র মূর্তিকে তুষ্ট করিতে চাহিয়াছে, কখনো তাহার দক্ষিণ মুখের কামনা করিয়াছে। ডমরু ঢোলের বৈচিত্র্যহীন তালের সঙ্গে সে তখন তাহার দেহের ছন্দ মিলাইয়া নাচিয়াছে। সে নৃত্য অমার্জিত, কিন্তু তবু কখনও কখনও তাহাতে হিল্লোলের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্ধবৃত্তাকারে তাহারা নাচে, গান গায় ও মধ্যস্থলে দুইজন পুরুষ মাদল বাজাইয়া তীক্ষ্ন চীৎকার ও উন্মত্ত নৃত্যে স্ত্রীলোকদিগকে দ্রুততর নৃত্যে উত্তেজিত করে। পুরুষেরাও কখনো মূল নর্তকরূপে অপ্রসন্ন দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য অথবা দর্শকের মনে বিচিত্র ভাব সঞ্চারের জন্য নৃত্য করিয়া থাকে। অসভ্য সমাজে ইহাদের প্রতিপত্তি অসীম; সমাজ তাহাদিগকে ভক্তিভরে পূজা করে।

আমাদের দেশের জনপদ নৃত্য বলিতে প্রধানত গুজরাতের গরবা, মালাবারের কৈকট্টকলি, উত্তর-ভারতের কাজরী ও মণিপুরের রাসলীলাই বুঝায়। ইহাদের মূলে ধর্মের অনুপ্রেরণা, অঙ্গভঙ্গিতে ইহারা সুমার্জিত ও আঙ্গিকের দিক দিয়া যে ইহাদের যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নৃত্যগুলি পুনরাবৃত্তি-বহুল বলিয়া দর্শকের মন সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তৎসত্ত্বেও ইহাদের মাধুর্য ও প্রাণশক্তি অস্বীকার করা যায় না। গুজরাতের গরবাতে যথেষ্ট লালিত্য ও প্রাণশক্তি আছে, কিন্তু পদভঙ্গির অভাব; মালাবারে কৈকট্টকলিতে সবল অঙ্গ সঞ্চালন ও বিচিত্র পদভঙ্গির প্রাচুর্য আছে, কিন্তু মাধুর্যের অভাব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে, একমাত্র গুজরাতের জনপদ নৃত্যেই স্ত্রী-পুরুষেরা যেমন পৃথক পৃথক মণ্ডলীতে নৃত্য করিয়া থাকে, সেইরূপ উভয়ে সম্মিলিত হইয়াও নৃত্য করিবার রীতি প্রচলিত আছে। নর্তকীরা বহু ছিদ্রবিশিষ্ট মৃৎপাত্রে জ্বলন্ত প্রদীপ রাখিয়া অথবা মস্তকে সুগঠিত পিত্তল কলসী ধারণ করিয়া মনোরম অঙ্গভঙ্গিতে চক্রাকারে নৃত্য করে; সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও রাসগীতি গায়, করতালি দিয়া তাল লয় রক্ষা করে। কখনও কখনও দুইটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দিয়া নাচিবার সময় তাল বাজায়; অজন্তা ও অন্যান্য প্রাচীন চিত্রে ঐ কাষ্ঠখণ্ডের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে সঙ্গীত সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; তখন কেবলমাত্র মাদলের তালে

শুদ্ধ স্বাধীন নৃত্যে আরম্ভ হয়; অঙ্গভঙ্গি তখন সবল হইয়া উঠে ও পদসঞ্চালন দ্রুততর গতিতে হইতে থাকে।

জনপদ নৃত্যের মধ্যে মণিপুরী রাসলীলাতেই সর্বাধিক সাধনা ও শিক্ষার প্রয়োজন হয়; আঙ্গিকের দিক দিয়াও উন্নত বলিয়া রাসলীলাকে উচ্চাঙ্গ নৃত্যরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। মণিপুরের রাসলীলা ভক্তিরসে পরিপূর্ণ—গোপ ও গোপিগণের আবেষ্টনীতে শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনী বর্ণনা করাই এই নৃত্যের উদ্দেশ্য। রাজবাড়িতে রাসলীলার নাচ শিখানো হয়, ও দেশের জনসাধারণ রসের দিক দিয়া ইহার বিচার করিয়া ইহার প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। রাসলীলায় তরুণীরা ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীতে গোপীরূপে নৃত্য করে ও রাধার ভূমিকায় বালককে নামানো হয়। তরুণীদের নৃত্য অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সরল; তরুণ ও বয়স্কদের নৃত্য সবল ও ছন্দ-বৈচিত্র্যবহুল। নাচের তাল রক্ষা হয় মৃদঙ্গের জ্ঞাতি, খোল সংযোগে।

উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যে প্রধান—উত্তর-ভারতের কথক, দক্ষিণ-ভারতের ভরত নাট্যম্ ও মালাবারের কথাকলি ও মোহিনী আট্যম। পরিতাপের বিষয় এই সবকয়টি নৃত্যই ব্যবসাদার নটনটীর কবলগ্রস্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল বিত্তশালীদের ঘৃণ্য লালসাগ্নি উদ্দীপ্ত ও চরিতার্থ করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেছে। যে দুষ্ট পরিবেষ্টনীর মধ্যে এইসব নৃত্যের চর্চা আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে এই মহৎকলার প্রাণবন্ত সৌন্দর্য ও পূর্ণাবয়ব আঙ্গিকের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। মুসলিম সভ্যতার প্রভাবে উত্তর-ভারতের উচ্চাঙ্গ নৃত্য কঠিন ও জটিল তাল-লয়ের সৃষ্টি করে, সে-তাল প্রকাশ করিলে তবলার বোল পদধ্বনিতে শোনা যায়। শুধু তাই নয়, হাবভাব, নিতম্ব ও কটিসঞ্চালন, কটাক্ষভঙ্গি, স্কন্ধান্দোলন, এক কথায় সর্ব অঙ্গের চালনা ও ভাবপ্রকাশ শুদ্ধমাত্র দর্শকের হৃদয়ে পাশবিক আনন্দদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এইসব নৃত্যে বিকাশপ্রাপ্ত আঙ্গিকের সন্ধান মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু বেশির ভাগই হীন ও অশ্লীল।

দক্ষিণে প্রচলিত ভারত নাট্যম্ শুদ্ধ হিন্দুকলা। ভরত নাট্যে যে-সব 'মুদ্রা' দ্বারা দেবদেবী, পশুপক্ষী ও বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ করা হয় সেইগুলি এই নৃত্যের মুখ্য বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। উত্তরের কথক নৃত্যের তুলনায় ভরত নৃত্যে পদসঞ্চালনের কারুকার্য নাই এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গসঞ্চালনও অপেক্ষাকৃত কর্তিত ও সংযত। মালাবারের মোহিনী আট্যম্ অনেকটা ভরত নাট্যের ন্যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নৃত্য মরণোন্মুখ—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণের সব কয়টি উচ্চাঙ্গ নৃত্যই কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরাই নাচিয়া থাকে—অতি অল্প বয়সেই বালিকারা পুরুষ পেশাদারের কাছে শিক্ষা আরম্ভ করে ও বহু বৎসরব্যাপী কঠিন নিয়ম রীতিমত পালন করিয়া নৃত্যকলায় পারদর্শিনী হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব নৃত্যে আজকাল কেবলমাত্র

শুষ্ক আঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায়, শুদ্ধ কলার চিহ্নমাত্র নাই। যে-নৃত্য সৃষ্টি করে না, কেবলমাত্র পূর্বানুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়, তাহার যে এই গতি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি!

আজকাল কথাকলি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে ও এ-সম্বন্ধে প্রচুর বাক্যবিন্যাস করা হইয়াছে বলিয়া এই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বলার প্রয়োজন। এদেশের সর্বত্রই নর্তক-নর্তকী, গায়ক-গায়িকা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান অভিনয় করিয়া থাকে; বিভিন্ন প্রদেশে ইহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। মালাবারে ইহারা কথাকলি নামে পরিচিত—'কথা' অর্থ 'গল্প' ও 'কলি' অর্থ 'নাট্য'। কথাকলির অভিনেতারা অন্যান্য প্রদেশের নট-নটীর ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করে না; তাহারা মূক অভিনয় করে, তবলা ও মন্দিরা সহযোগে নাচে ও তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দুইজন গায়ক গল্পগুলি গান গাহিয়া শুনায়। মুক্ত আকাশের নীচে অভিনয় হয় ও সূর্যোদয় পর্যন্ত আনন্দোৎসব চলে। অভিনেতারা বৃহৎ চুনটদার জামাকাপড় পরে ও বিচিত্র প্রসাধনের দ্বারা এক প্রকার অভিনব মুখোস নির্মাণ করে। কথাকলি নৃত্যের কটাক্ষ, মুখের মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণ, নানাপ্রকার 'মুদ্রার' ব্যবহার ও বিশেষত পদদ্বয়ের সম্প্রসারণ দ্বারা নৃত্যকে প্রাণদান প্রভৃতি আঙ্গিক অত্যন্ত দুরূহ ও বহু বৎসরব্যাপী কঠিন সাধনা ব্যতীত এই কলায় দক্ষতা লাভ অসম্ভব। নয় দশ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই বালিকাকে নৃত্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে হয় ও পূর্ণ যৌবন লাভ না করা পর্যন্ত নর্তকীকে কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া জীবনযাপন করিতে হয়।

কথাকলি ঠিক নৃত্য নয়, নৃত্যনাট্যও নয়। বরঞ্চ মুখোসপরা তামাসা-নাচের সঙ্গেই ইহার সাদৃশ্য অধিক; নৃত্যকলা ইহাতে স্ফুরিত হয় না। নৃত্যের প্রারম্ভেই যবনিকান্তরালে দুই একটি আবাহন নৃত্য করা হয় ও তারপর প্রত্যেক শ্লোক বা গান গাওয়া শেষ হইতেই অভিনেতারা চক্রাকারে 'কলসম' নৃত্য করে। তারপর স্ত্রী চরিত্রের 'সরি' নৃত্য ও রাজহংস বা ময়ূরের পক্ষীনৃত্য করা হয়।

কথাকলি নৃত্য শক্তি ও তেজঃপ্রধান, কিন্তু অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যে পদ-সঞ্চালনের যে কারুকার্য ও গতিচ্ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় ইহাতে তাহার অত্যন্ত অভাব। অভিনেত্রীদিগকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অঙ্গভঙ্গি শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও যে কেন তাহাদের নৃত্য এত রূঢ় ও অপক্করূপে প্রকাশ পায়, তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা যায় না। কথাকলি গণ্ডিবদ্ধ বলিয়া পূর্বানুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট ও মাঝে মাঝে তাহার বস্তুতান্ত্রিকতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। শুধু আঙ্গিকের দিক দিয়াই আজ কথাকলি আমাদের কৌতূহল ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সুকুমার কলা হিসাবে এই নৃত্য ভারতবর্ষের অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যের ন্যায় আজ মৃত।

মাত্র কুড়ি বাইশ বৎসর হইল এদেশে নৃত্যকে বিষাক্ত পরিবেষ্টনী হইতে

মুক্ত করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনে স্থান দিবার চেষ্টা করা হইতেছে ও সংগীত চিত্রাঙ্কণের ন্যায় নৃত্যও সুকুমার কলা হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। তাই আজকাল সংগীতের মজলিসে, স্কুলকলেজের আমোদ-অনুষ্ঠানে, পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব আনন্দে নৃত্য চর্চা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কণ্ঠসংগীতের সংগে মিলাইয়া কেবলমাত্র তাল-সংযুক্ত পদ সঞ্চালন থাকিলেই তাহা পূর্বের ন্যায় এখনও নৃত্য নামে নন্দিত হয়। সেই নৃত্যকলা এখন 'ফ্যাশান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কোনো রকম শিক্ষা-দীক্ষা না লইয়াই চ্যারিটি-রিলীফ ফণ্ডের অজুহাতে যত্রতত্র নৃত্য করা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এখনও কি এই সরল তত্ত্বটি বুঝিবার সময় হয় নাই যে, নৃত্য অর্থহীন অংগপ্রত্যংগ বিক্ষেপের মূল্যহীন সমষ্টিমাত্র নহে! এখনও কি দেশবাসী বুঝিবে না যে, নৃত্য অন্যান্য সুকুমার কলার ন্যায় একনিষ্ঠ ও আজীবন সাধনা সাপেক্ষ কলা বিশেষ? অতি অল্প সংখ্যক নর্তকনর্তকীই এ যাবত অর্থহীন অংগসঞ্চালন ত্যাগ করিয়া প্রকৃত নৃত্যরসে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। এবং ইঁহাদের ভিতরেই বা কয়জন সত্যসত্য হৃদয়ংগম করিয়াছেন যে নৃত্যের ন্যায় উচ্চাংগের সুকুমার কলায় পারদর্শী হইতে হইলে তাহার প্রতি কী অবিচল নিষ্ঠা ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়? বেশীর ভাগই তো দেখিতে পাই দুই একদিনের ছন্ন-ছাড়া শিক্ষায় দুই একটি নৃত্যেই সন্তুষ্ট। তাহাতে তো শুধু লোক ভুলোনো চলে—সে তো কলা নহে। তাই সামান্য যে কয়জন প্রকৃত নৃত্য কলা হিসাবে গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতেছেন তাঁহারা সত্যই প্রশংসনীয়। সমাজের বাধাবন্ধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সাহসের ভরে লোক-চক্ষুর সম্মুখে নৃত্যকলা দেখাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারাও সেই প্রাচীন ঐতিহ্যাগত নৃত্য দেখাইয়াই সন্তুষ্ট। তাঁহাদের নৃত্যে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ নাই। পেশাদার নর্তকেরা যে দৈন্য বহু সাধনালব্ধ আঙ্গিকের দ্বারা লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তাঁহাদের নৃত্যে তাহা বারবার ধরা পড়ে। ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা যে কাহারও নাই এমন নহে, কিন্তু আছে অতি অল্পসংখ্যক গুণীর ভিতরে। তাঁহারা যে শুধু গভীর সাধনার দ্বারা নৃত্য আয়ত্ত করিয়াছেন এমন নহে, তাহারা যে শুধু প্রাচীন ঐতিহ্যাগত নৃত্য সর্বাংগসুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও নহে, তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, বর্তমান যুগের রুচি-অনুযায়ী তাঁহারা নৃত্যের প্রাচীন বিষয়বস্তুকে নূতন রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত গুণীর চরম লক্ষ্য ত ইহাও হইতে পারে না; তিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁহাকে নব নব বিষয়ের কল্পনা করিতে হইবে, নব নব রূপে সেগুলিকে প্রকাশ করিতে হইবে—জরাজীর্ণ বৃদ্ধাকে নবীনবেশে সজ্জিত করিয়া তিনি কেন বিড়ম্বিত হইবেন? জীবনীশক্তির যে দ্রুত, অবিশ্রান্ত স্পন্দন আমরা আমাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি সুকুমার কলা সেই জীবনের, সেই জীবনীশক্তির বাণীই তো প্রকাশ করে। অতি সনাতন ভাবনা

কামনা একদিন যে রূপ, যে বর্ণ নিয়া প্রকাশিত হইত তাহার সঙ্গে আমাদের অদ্যকার সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ সংগ্রাম, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের কোথায় যোগসূত্র? সুকুমার কলা কি কখনো মৃতদগ্ধ চিন্তা ও অনুভূতির অন্ধকূপে প্রাণধারণ করিতে পারে? নৃত্য ত শুধু তাল লয় যোগে অঙ্গসঞ্চালন নয়, নৃত্য ত সুচারু পদক্ষেপের নামান্তরও নয়; আঙ্গিকের উৎকর্ষ নৃত্য নয়, অঙ্গবিন্যাস দ্বারা সুদর্শন আলিম্পন সৃষ্টি করাও নৃত্য নয়। প্রকৃত নৃত্যের চরম আদর্শ আমাদের জীবনের দ্বন্দ্বানুভূত প্রকাশ করা, সত্য ও সুন্দরকে উন্মোচন করিয়া আমাদের চক্ষুর গোচর করা। জিজ্ঞাসা করি, রাধা-কৃষ্ণ, শিব-পার্বতী নৃত্য কি যথেষ্ট নাচা হয় নাই, প্রচুর দেখা হয় নাই? এখনও কি ধর্মের আচ্ছাদনে আবৃত কুসংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করিবার সময় হয় নাই? এ যুগের মানবের কি নিজস্ব কোনোও অনুভূতি, কোনো দ্বন্দ্ব, কোনো আশা, কোনো আদর্শ নাই? তাহাদের কি কিছুই বক্তব্য নাই—মানবসংসারের চিরন্তন দীপান্বিতায় প্রজ্জ্বলিত করিবার কোনো প্রদীপ নাই? বাহির হইয়া আসুক এ দেশের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী মোহমুক্ত হইয়া, প্রকাশ করুক তাহাদের আশা-অনুভূতি আপন সবল কণ্ঠে, শুধু কর্মে নয়,—সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে ও নৃত্যে॥—(শ্রীমতী ঠাকুরের গুজরাতি লিখন হইতে অনূদিত)।*

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নির্বাসিতের আত্মকথা

কোনো কোনো বই পড়ে লেখকেরা আপন আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় নিরাশ হন। যাদের সত্যকার শক্তি আছে, তাদের কথা হচ্ছে না, আমি ভাবছি আমার আর আমার মত আর পাঁচজন কমজোর লেখকের কথা।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পর পুনরায় 'নির্বাসিতের আত্মকথা' পুস্তিকাখানি আদ্যন্ত পড়লুম। পাঠকমাত্রই জানেন, ছেলেবেলার পড়া বই পরিণত বয়সে পড়ে মানুষ সাধারণত হতাশ হয়। 'নির্বাসিতের' বেলা আমার হল বিপরীত অনুভূতি। বুঝতে পারলুম, কত সূক্ষ্ম অনুভূতি, কত মধুর বাক্যভঙ্গি, কত উজ্জ্বল রসবাক্য, কত করুণ ঘটনার ব্যঞ্জনা তখন চোখে পড়ে নি। সাধুভাষার মাধ্যমে যে এত ঝকঝকে বর্ণনা করা যায়, সে ভাষাকে যে এতখানি চটুল গতি দিতে পারা যায়, 'নির্বাসিত' যাঁরা পড়েন নি, তাঁরা কল্পনামাত্র করতে পারবেন না।

কিন্তু প্রশ্ন, এ বই পড়ে আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হলুম কেন?

* 'দেশের' ভূতপূর্ব কর্মী স্বর্গীয় অদ্বৈত মল্লবর্মণের স্মরণে।—অনুবাদক

হায়, এ রকম একখানা মণির খনির মত বইয়ের চারিটি সংস্করণ হল ত্রিশ বৎসরে! তাহলে আর আমাদের ভরসা রইল কোথায়?

১৯২১ (দু-চার বছর এদিক-ওদিক হতে পারে) ইংরেজিতে একদিন শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে দেখি এক গাদা বই গুরুদেবের কাছ থেকে লাইব্রেরিতে ভর্তি হতে এসেছে। গুরুদেব প্রতি মেলে বহু ভাষায় বিস্তর পুস্তক পেতেন। তাঁর পড়া হয়ে গেলে তার অধিকাংশ বিশ্বভারতী পুস্তকাগারে স্থান পেত। সেই গাদার ভিতর দেখি, 'নির্বাসিতের আত্মকথা'।

বয়স অল্প ছিল, তাই উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জানা ছিল না। বইখানা ঘরে নিয়ে এসে এক নিশ্বাসে শেষ করলুম। কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলছিনে, এ বই সত্যসত্যই আহার-নিদ্রা ভোলাতে পারে। 'পৃথিবীর সব ভাষাতেই এ রকম বই বিরল; বাঙলাতে তো বটেই।'

পরদিন সকালবেলা গুরুদেবের ক্লাশে গিয়েছি। বই খোলার পূর্বে তিনি শুধালেন 'উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' কেউ পড়েছ?' বইখানা প্রকাশিত হওয়ামাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছে; তিনি সেখানা পড়ে লাইব্রেরিতে পাঠান, সেখান থেকে আমি সেটাকে কব্জা করে এনেছি, অন্যেরা পড়বার সুযোগ পাবেন কি করে? বয়স তখন অল্প, ভারী গর্ব অনুভব করলুম।

বললুম, 'পড়েছি।'

শুধালেন, 'কি রকম লাগল।'

আমি বললুম, 'খুব ভালো বই।'

রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আশ্চর্য বই হয়েছে। এ রকম বই বাঙলাতে কম পড়েছি।'

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে বলে আজ আর হুবহু মনে নেই রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি প্রকারে তাঁর প্রশংসা ব্যক্ত করেছিলেন। আমার খাতাতে টোকা ছিল এবং সে খাতা কাবুল-বিদ্রোহের সময় লোপ পায়। তবে একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে যে, রবীন্দ্রনাথ বইখানার অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

বিখ্যাত লেখককে দেখার সাধ সকলেরই হয়। আমি যে সে কারণে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম তা নয়। আমার ইচ্ছা ছিল দেখবার যে বারো বৎসর নরক-যন্ত্রণার পর তিনি যে তাঁর নিদারুণ অভিজ্ঞতাটাকে হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করলেন তার কতখানি সত্যই তার চরিত্রবলের দরুণ এই বিশেষ রূপ নিল আর কতখানি নিছক সাহিত্য-শৈলী মাত্র। অর্থাৎ

তিনি কি সত্যই এখনো সুরসিক ব্যক্তি, না অদৃষ্টের নিপীড়নে তিক্ত-স্বভাব হয়ে গিয়েছেন।

গিয়ে দেখি পিতা-পুত্র বসে আছেন।*

বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা (পরবর্তী যুগে তিনি রোগা হয়ে গিয়েছিলেন), হাসিভরা মুখ আর আমার মত একটা আড়াই ফোঁটা ছোকরাকে যে আদর করে কাছে বসালেন, তার থেকে তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলুম যে, তাঁর ভিতর মানুষকে কাছে টেনে আনবার কোন আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল, যার জন্য বাঙলা দেশের তরুণ সম্প্রদায় তাঁর চতুর্দিকে জড় হয়েছিল।

ছেলেটিকেও বড় ভালো লাগলো। বড্ড লাজুক আর যে সামান্য দু'একটি কথা বলল, তার থেকে বুঝলুম, বাপকে যে শুধু সে ভক্তি-শ্রদ্ধাই করে তা নয়, গভীরভাবে ভালোও বাসে।

অটোগ্রাফ-শিকারের ব্যসন তখনো বাঙলা দেশে চালু হয় নি। তবে সামান্য যে দু'একজন তখনকার দিনে এ ব্যসনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা শুধু স্বাক্ষরেই সন্তুষ্ট হতেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কুটেসশ বা আপন বক্তব্য লিখিয়ে নিতেন। আমার অটোগ্রাফে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল রায়, লেভি, এ্যাণ্ড্রুজ ইত্যাদির লেখা তো ছিলই, তার উপর গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, কারপেলেজের ছবিও ছিল।

উপেনবাবুকে বইখানা এগিয়ে দিলুম।

এর পিছনে আবার একটুখানি ইতিহাস আছে।

বাজে-শিবপুরে শরৎচন্দ্রকে যখন তাঁর স্বাক্ষর এবং কিছু একটা লেখার জন্য চেপে ধরেছিলুম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন বিশেষ করে তাঁর কাছেই এলুম কেন? আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম, 'আপনার লেখা পড়ে আপনার কাছে না আসাটাই তো আশ্চর্য!'

শরৎবাবু একটুখানি ভেবে লিখে দিলেন, 'দেশের কাজই যেন আমার সকল কাজের বড় হয়।'

আমি জানি শরৎচন্দ্র কেন ঐ কথাটি লিখেছিলেন। তখন তিনি কংগ্রেস নিয়ে মেতেছিলেন।

তারপর সেই বই যখন রবীন্দ্রনাথকে দিলুম, তখন তিনি শরৎচন্দ্রের বচন পড়ে লিখে দিলেন,—

'আমার দেশ যেন উপলব্ধি করে যে, সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ দ্বারাই তার সার্থকতা।'

এর ইতিহাস বাঙালীকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমৈত্রী নিয়ে তখন রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের তর্ক আলোচনা হচ্ছিল।

* নির্বাসিতের আত্মকথা—চতুর্থ সংস্করণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স—পৃঃ ৭০ এবং ১৭২।

উপেনবাবুকে অটোগ্রাফ দিতে তিনি দুটি লেখা পড়ে লিখে দিলেন,—

'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

ছেলেবেলায় বইখানা পড়েছিলুম এক নিঃশ্বাসে কিন্তু আবার যখন সেদিন বইখানা কিনে এনে পড়তে গেলুম তখন বহুবার বইখানা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকতে হল। বয়স হয়েছে, এখন অল্পেতেই চোখে জল আসে আর এ বইয়েতে বেদনার কাহিনী 'অল্পের' উপর দিয়ে শেষ হয়নি। সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব বোধহয় বইখানির সেখানেই। উপেন্দ্রনাথ যদি দস্তয়েফ্‌স্কির মত পুঙ্খানুপুঙ্খ করে তাঁর কারাবাস আর আন্দামানজীবন (জীবন না বলে 'মৃত্যু' বলাই ঠিক) বর্ণনা করতেন তবে আমাদের মনে কোন জাতীয় অনুভূতির সৃষ্টি হত বলা সুকঠিন কিন্তু এই যে তিনি নির্বাসিতদের নিদারুণ দুঃখ দুর্দৈবের বহুতর কাহিনী প্রতিবারেই সংক্ষিপ্ততম বর্ণনায় শেষ করে দিয়েছেন এতে করেই আমাদের কল্পনা তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে কত হৃদয়বিদারক ছবি এঁকে আমাদের হৃদয়কে মথিত করেছে কত বেশি। এই হল প্রকৃত শক্তিশালী লেখকের লক্ষণ। যেটুকু ব্যঞ্জনার পাখা প্রয়োজন উপেন্দ্রনাথ সেইটুকু মাত্র দিয়েই আমাদের উড়িয়ে দিলেন। উপেন্দ্রনাথ স্বয়ং যে উদ্ধৃতি আপন পুস্তকে ব্যবহার করেছেন আমি সেইটে দিয়ে তাঁর এ অলৌকিক ক্ষমতার প্রশস্তি গাই;

"ধন্য ধন্য পিতা দশমেস গুরু
যিন চিড়িয়াঁসে বাজ তোড়ায়ে"

"ধন্য ধন্য পিতঃ, হে দশম গুরু! চটক দিয়া তুমি বাজ শিকার করাইয়াছিলে; তুমি ধন্য!"*

উপেন্দ্রনাথ দস্তয়েফ্‌স্কির মত শক্তিশালী লেখক নন; দস্তয়েফ্‌স্কির মত বহুমুখী প্রতিভা তাঁর ছিল না কিন্তু এ-কথা বারবার বলব দস্তয়েফ্‌স্কির সাইবেরিয়া কারাবাস উপেন্দ্রনাথের আত্মকথার কাছে অতি নিশ্চয় হার মানে।

সবচেয়ে মামুলী জিনিস নিয়েই উপেন্দ্রনাথের শক্তির পরিচয় দিই। ভাষার দখল অনেক লোকেরই আছে কিন্তু একই ভাষার ভিতর এত রকমের ভাষা লিখতে পারে ক'জন? এক শ' সত্তর পাতার বইয়ে ফলাও করে বর্ণনা দেবার স্থান নেই অথচ তার মাঝখানেই দেখুন, সামান্য কয়টি ছত্রে কি অপরূপ গুরুগম্ভীর বর্ণনা;—

"গানটা শুনিতে শুনিতে মানস-চক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিতাম যে, হিমাচল-

* নির্বাসিতের আত্মকথা, পৃঃ ১৬৭।

ব্যাপী ভাবোন্মত্ত জনসঙ্ঘ বরাভয়করার স্পর্শে সিংহগর্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে; মায়ের রক্তচরণ বেড়িয়া বেড়িয়া গগনস্পর্শী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে; দ্যুলোক ভুলোক সমস্তই উন্মত্ত রণবাদ্যে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইত যেন আমরা সর্ববন্ধনমুক্ত—দীনতা, ভয়, মৃত্যু আমাদের কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না।"১

পড়ে মনে হয় যেন বিবেকানন্দের কালীরূপ বর্ণনা শুনছি;—

"নিঃশেষে নিবিছে তারার দল
মেঘ আসি আবরিছে মেঘ
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার
গরজিছে ঘূর্ণ বায়ুবেগ
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত পরাণ
বহির্গত বন্দীশালা হতে
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি
ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে"২

উপরের গম্ভীর গদ্য পড়ার পর যখন দেখি অত্যন্ত দিশী ভাষায়ও তিনি নিজকে প্রকাশ করতে পারেন ঠিক তেমনি জোর দিয়ে তখন আর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। শুধু যে সংস্কৃত শব্দের ওজস্ এবং প্রসার সম্বন্ধে তিনি সচেতন তাই নয়, কলকাতা অঞ্চলের পুরো-পাক্কা তেতো-কড়া ভাষাতেও তার তেমনি কায়েমি দখল।

'বারীন বলিল—"এতদিন স্যাঙ্গাতেরা পট্টি মেরে আসছিলেন যে, তাঁরা সবাই প্রস্তুত; শুধু বাঙলাদেশের খাতিরে তাঁরা বসে আছেন। গিয়ে দেখি না, সব ঢুঃ ঢুঃ। কোথাও কিছু নেই; শুধু কর্তারা চেয়ারে বসে বসে মোড়লি কচ্ছেন। খুব কসে ব্যাটাদের শুনিয়ে দিয়ে এসেছি"।'৩

এ-ভাষা হুতোমের ভাষা; এর ব্যবহার অতি অল্প লেখকেই করেছেন।

এককালে পশ্চিম-বাঙলার লোকও আরবী-ফার্সী শব্দের প্রসাদগুণ জানতেন ও কায়দামাফিক সেগুলো ব্যবহার করে ভাষার জৌলুশ বাড়াতে কসুর করতেন না। ক্রমে ক্রমে এ ঐতিহ্য পশ্চিমবঙ্গে লোপ পায় অথচ পূববাঙলার লেখকদের মেকদারবোধ কম ছিল বলে তাঁরা এ বাবদে অনেক জায়গায় লাভের বদলে লোকসানই করেছেন বেশী। উপেন্দ্রনাথ তাগমাফিক আরবী-ফার্সীও 'এস্তেমাল' করতে জানতেন।

"কোনরূপে হিন্দুকে মুসলমান ভাণ্ডারীর খানা খাওয়াইয়া তাহার গোঁফ ছাটিয়া দিয়া একবার কলমা পড়াইয়া লইতে পারিলে বেহস্তে যে খোদাতাল্লা

(১) আত্মকথা, পৃঃ ৬৬। (২) সত্যেন দত্তের অনুবাদ। (৩) আত্মকথা, পৃঃ ৩৩।

তাহাদের জন্য বিশেষ আরামের ব্যবস্থা করিবেন, এ বিশ্বাস প্রায় সকল মোল্লারই আছে।"৪

কিন্তু উপেন্দ্রনাথ ছিলেন একদম নসিকে বাঙালী। তাই,

"আমরা হিন্দু মুসলমান সকলকার হাত হইতে নির্বিচারে রুটি খাই দেখিয়া মুসলমানেরা প্রথম প্রথম আমাদের পরকালের সদ্গতির আশায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; শেষে বেগতিক দেখিয়া উভয় দলই স্থির করিল যে, আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই—আমরা বাঙালী।"৫

বাঙালীর এরকম নেতিবাচক রমণীয় সংজ্ঞা আমি আর কোথাও শুনিনি।

কিন্তু এসব তাবৎ বস্তু বাহ্য।

না সংস্কৃত, না আরবী-ফার্সী, না কলকাত্তাই সব কিছু ছাড়িয়ে তিনি যে খাঁটি মেটে বাঙলা লিখতে পারতেন তার কাছে দাঁড়াতে পারেন আজকের দিনের ক'জন লেখক?

"শচীনের পিতা একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। জেলে কিরকম খাদ্য খাইতে হয় জিজ্ঞাসা করায় শচীন লপসীর নাম করিল। পাছে লপসীর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া পিতার মনে কষ্ট হয় সেই ভয়ে শচীন লপসীর গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে করিতে বলিল, 'লপসী খুব পুষ্টিকর জিনিস।' পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তিনি জেলার বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—'বাড়িতে ছেলে আমার পোলাওএর বাটি টান মেরে ফেলে দিত; আর আজ লপসী তার কাছে পুষ্টিকর জিনিস।' ছেলের এ অবস্থা দেখিয়া বাপের মনে যে কি হয় তাহা তখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই, তবে তাহার ক্ষীণ আভাস যে একেবারে পাই নাই তাহাও নয়। একদিন আমার আত্মীয়-স্বজনেরা আমার ছেলেকে আমার সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র; কথা কহিতে পারে না। হয়ত এ জন্মে তাহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া তাহাকে কোলে লইবার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝের লোহার রেলিংগুলা আমার সে সাধ মিটাইতে দেয় নাই। কারাগারের প্রকৃত মূর্তি সেইদিন আমার চোখে ফুটিয়াছিল।"৬

স্থাপত্যের বেলা ব্যাপারটা চট করে বোঝা যায়, কিন্তু সাহিত্যে অতটা সোজা নয়। তাজমহলকে পাঁচগুণ বড় করে দিলে তার লালিত্য সম্পূর্ণ লোপ পেত, যদিও ঐ বিরাট বস্তু তখন আমাদের মনকে বিস্ময় বিমূঢ় করে দিত, আর আমরা স্তম্ভিত হয়ে বলতুম, 'এ কী এলাহি ব্যাপার!' ফলে শাহ্‌জাহান যে প্রিয়ার বিরহে কাতর হয়ে ইমারতখানা তৈরী করেছিলেন, সেকথা বেবাক ভুলে যেতুম।

আর তাজমহলকে ছোট করে দিলে কি হয়, তা তো নিত্যি নিত্যি স্পষ্ট

(৪) পৃঃ ১১৯। (৫) পৃঃ ১২১। (৬) পৃঃ ৬৯, ৭০।

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। শ্বেতপাথরের ক্ষুদে তাজমহল মেলা লোক ড্রইং-রুমে সাজিয়ে রাখেন। পাঁচজন তার দিকে ভালো করে না তাকিয়েই গৃহস্বামীকে জিজ্ঞেস করেন তিনি আগ্রায় গিয়েছিলেন কবে? ভদ্রলোকের আগ্রা গমন সফল হ'ল—ক্ষুদে তাজ যে কোণে সেই কোণেই পড়ে রইল।

সাহিত্যের বেলাও অনেক সময় প্রশ্ন জাগে, এ উপন্যাসখানা যেন বড্ড ফেনিয়ে লেখা হয়েছে কিংবা অন্য আরেকখানা এতটা ঊর্ধ্বশ্বাসে না লিখে আরো ধীরে-মন্থরে লিখলে ঠিক আয়তনে গিয়ে দাঁড়াত। 'যোগাযোগ' পড়ে মনে হয় না, এ বইখানাকে বড় কিম্বা ছোট করা যেত না, 'গোরা'র বেলা মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, হয়ত এ অনবদ্য পুস্তকখানা আরো ছোট করলে তার মূল্য বাড়ত।

আমার মনে হয় 'আত্মকথা' সংক্ষেপে লেখা বলে সেটি আমাদের মনে যে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে, দীর্ঘতর হলে হয়ত সে রকম অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারত না। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বইখানা লিরিক না করে এপিক করলেই হয়ত ভালো হ'ত। এ বই যদি 'ওয়ার অ্যান্ড পীসের' মত বিরাট ক্যানভাস নিয়ে চিত্রিত করা হ'ত, তবে বুঝি তার উপযোগী মূল্য দেওয়া হ'ত। কিন্তু এ বিষয়ে কারো মনে দ্বিধা উপস্থিত হবে না যে, লিরিক হিসেবে এ বই এর চেয়ে কি বড়, কি ছোট কিছুই করা যেত না।

বই আরম্ভ করতেই চোখে পড়ে প্রথম বিপ্লবী যুগের এই তরুণদের হৃদয়, কী অদ্ভুত সাহস, আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী অবিশ্বাস্য তাচ্ছিল্যে ভরা ছিল। পরবর্তী যুগে ইংরেজের জেলখানার স্বরূপ আমরা চিনেছিলুম এবং শেষের দিকে জেল-ভীতি সাধারণের মন থেকে তো একরকম প্রায় উঠেই গিয়েছিল, কিন্তু যে যুগে এঁরা হাসিমুখে কারাবারণ করেছিলেন, সে যুগের যুবকদের মেরুদণ্ড কতখানি দৃঢ় ছিল, আজ তো আমরা তার কল্পনাই করতে পারিনে। উল্লাস, কানাই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে হেসেছিল—যেন কাঁধ থেকে বেঁচে-থাকার একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল। আজ যখন বাঙলাদেশের দিকে তাকাই, তখন বারম্বার শিরে করাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করে, 'হে ভগবান, সে যুগে তুমি অকৃপণ হস্তে বাঙলা দেশকে এত দিয়েছিলে বলেই কি আজ তোমার ভাণ্ডার সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে গিয়েছে?'

অথচ রুদ্র মহাকাল এই তরুণদের হৃদয় এবং জীবনে যে তাণ্ডব নৃত্য করে গেলেন, যার প্রতি পদক্ষেপে বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ কুটির আন্দোলিত হল, বাঙালী হিন্দুর ইষ্টদেবী কালী করালী যখন বারম্বার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'মৈঁ ভুখা-হুঁ' তখন যে এই বঙ্গসন্তানগণ প্রতিবারে গম্ভীরতর হুঙ্কার দিয়ে বলল,—

"কালী তুই্ করালরূপিণী
আয় মাগো আয় মোর কাছে,"

যূপকাষ্ঠে স্বেচ্ছায় স্কন্ধ দিয়ে বলল, 'হানো, তোমার খড়্গ হানো,' তখনকার সেই বিচিত্র ছবি উপেন্দ্রনাথ কী দম্ভহীন অনাড়ম্বর অনাসক্তিতে চিত্রিত করে গেলেন।

দক্ষিণ-ভারতের মথুরা, মাদুরায় এক তামিল ব্রাহ্মণের বাড়িতে কয়েক মাস বাস করার সৌভাগ্য আমার একবার হয়েছিল। গৃহকর্ত্রী প্রতি প্রত্যূষে প্রহরাধিককাল পূর্বমুখী হয়ে রুদ্র-বীণা বাজাতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, 'আজ আপনি কি বাজালেন বলুন তো। আমার মনের সব দুশ্চিন্তা যেন লোপ পেল।' বললেন, 'এর নাম 'শঙ্করবরণম'—সন্ন্যাসী রাগও একে বলা হয় কারণ এ রাগে আদি, বীর, করুণ কোনোপ্রকারের রস নেই বলে একে শান্তরসও বলা হয়। কিন্তু শান্ত অবস্থাকে তো রসাবস্থা বলা চলে না, তাই এর নাম সন্ন্যাস রাগ।'

উপেন্দ্রনাথের মূল রাগ সন্ন্যাস রাগ।

অথচ এই পুস্তিকা হাস্যরসে সমুজ্জ্বল।

তাহলে তো পরস্পরবিরোধী কথা বলা হল। কিন্তু তা নয়। উপেন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মীদের জীবন তথা বাঙলাদেশের পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা নিরীক্ষণ করেছেন অনাত্মীয় বৈরাগ্যে—তাই তার মূল রাগ সন্ন্যাস—এবং তার প্রকাশ দিয়েছেন হাস্যরসের মাধ্যমে, দুঃখ-দুর্দৈবকে নিদারুণ তাচ্ছিল্যের ব্যঙ্গ দিয়ে। এ বড় কঠিন কর্ম—কঠোর সাধক এবং বিধিদত্ত সাহিত্যরস একাধারে না থাকলে এ ভানুমত

আমার প্রিয় চরিত্র ডন কুইক্‌সট্‌। উপন্দ্রেনাথ বিপরীত ডন্‌।

ডন এবং উপেন্দ্রনাথের সাহস অসীম; দুজনই পরের বিপদে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শাণিত তরবারি নিয়ে আক্রমণ করেন, অন্যায় অত্যাচারের সামনে দুজনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোহিতরঙে রঞ্জিত দেখেন।

পার্থক্য শুধু এইটুকু, উইন্ডমিলকে ডন মনে করেন দৈত্য, দাসীকে মনে করেন রাজনন্দিনী, ভেড়ার পালকে মনে করেন যাদুকরের মন্ত্র-সম্মোহিত পরীর দল।

আর উপেন্দ্রনাথ দেখেন বিপরীত। কারাগারকে ভাবেন রঙ্গালয়, কারা-রক্ষককে মনে করেন সার্কাসের সং, পুলিস বাহিনীকে মনে করেন ভেড়ার পাল।

এই নব ডন কুইক্‌সট্‌কে বার বার নমস্কার॥
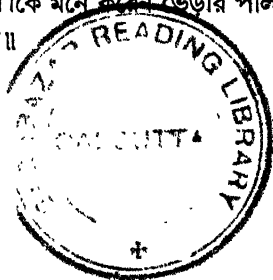
জয়হে ভারতভাগ্যবিধাতা

ম্যাট্রিক পাশের লিস্টে নাম দেখে যেমন 'ইয়া আল্লা' বলে ছেলে-ছোকরারা লম্ফ দিয়ে ওঠে আমাদের অখণ্ড স্বরাজলাভের আনন্দোল্লাস তার সঙ্গে তুলনীয়। এমন কি, ম্যাট্রিকেও যদি পাঠকের মন সন্তুষ্ট না হয় তাহলে বি, এ, এম, এ, পি-এইচ, ডি, ডি, লিট্ যা খুশী বলতে পারেন তাতেও কোনো আপত্তি নেই। শুধু তাই নয়—এ স্বাধীনতা পাশের আনন্দ অন্য সব পাশের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি। কারণ অন্য যে-কোনো পরীক্ষায় দু'এক জন ইয়ার-বক্সী ফেল মারেনই মারেন—নিতান্ত পরশ্রীকাতর এবং বিঘ্ন-সন্তোষী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কারোরই কোনো পরীক্ষা পাশ নিরঙ্কুশ আনন্দদায়ক হয় না—এ-পরীক্ষায় কিন্তু সবাই পাশ, সবাই রাজা। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী আজ স্বাধীন হলেন, আপনিও হলেন, আমিও হলুম।

কিন্তু প্রশ্ন ততঃ কিম? অবশ্য বলতে পারেন পরীক্ষা পাশ করে জ্ঞানার্জন হল এবং জ্ঞানার্জন স্বয়ং-সম্পূর্ণ, আপন মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠিত। এর পর কিছু না করলেও কোনো আপত্তি নেই। এটা একটা উত্তর বটে কিন্তু কোনো জিনিস একদম কোনো কাজে লাগলো না এ-কথাটা ভেবে কেমন যেন সুখ পাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে, 'ইট্ ইজ বেটার টু ব্রেক দি হার্ট ইন লভ্ দেন ডু নাথিং উইথ হিট্'—স্বাধীনতাটা কোনো কাজে লাগাবো না একথা ভেবে মন কেমন যেন সুখ পায় না; বাসনা হয়, দেখাই যাক্ না, রাজনৈতিক স্বরাজের মই চড়ে আরো পাঁচ রকমের স্বরাজ হস্তগত হয় কি না। এ-লোভ সকলেরই থাকবে সে-কথা হলপ করে বলা যায় না কিন্তু অন্ততঃপক্ষে এ-তত্ত্বটা স্বীকার করে নিতে হবে যে, পাশের পর লেখা-পড়া বন্ধ করে দিলে জ্ঞান যে রকম কর্পূরের মত বিনা কারণেই উবে যেতে থাকে, স্বাধীনতাটাকেও তেমনি চালু না রাখলে ক্রমে ক্রমে সেও তার রূপ বদলাতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পর মুহূর্তেই যদি বেধড়ক ধড়-পাকড় আরম্ভ করে দেন, মনে মনে ভাবেন পাঁচটা লোকের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেই পাঁচশ' লোকের স্বাধীনতার বাঁচাওতা হয়ে যাবে কিম্বা যদি ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কালাবাজারীদের ল্যাম্প-পোস্টে না ঝোলান তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বরাজলাভটা ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আগে-ভাগে হলপ করে কিছু বলা যায় না।

হিটলারের পূর্বেও জর্মনি স্বাধীন ছিল কিন্তু জর্মনিকে সর্বাঙ্গসুন্দর স্বাধীনতা দিলেন হিটলার। লেনিনের পূর্বে রাশার জনসাধারণ স্বাধীনতার স্বাদ পায় নি, লেনিন এক ধাক্কায় গোটা দেশটাকে অনেকখানি এগিয়ে দিলেন। এখন আবার স্তালিন দেশটাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন যে এর পর

কি হয় না হয় বলা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি ও হিটলারের গতি লাভ করবেন নাকি? \

কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, আমাদের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো উপায় নেই—কিছু একটা করতেই হবে। স্বাধীনতার ঘোড়া চড়ি আর নাই চড়ি সেটাকে অন্ততঃ বাঁচিয়ে রাখার জন্য দানা-পানির খর্চা হবেই হবে।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেকখানি বিলিতি ছিল বলে আমাদের স্বরাজলাভও অনেকখানি বিলিতি কায়দায় হয়েছে। এখনও আমাদের লাট-বেলাটরা বিলিতি কায়দায় লঞ্চ-ডিনার খাওয়ান, পরট দেখেন, সেলুট নেন, এডিসি ফেডিসি কত ঝামেলা, কত বখেড়া। তাই স্বাধীনতা নিয়ে কি করব কথাটা উঠলেই গুণীরা বলেন, 'ইয়োরোপ কি বলছে, কান পেতে শোনো তো; তার পর বিবেচনা করে ভালো মন্দ যা হয় একটা কিছু করবো।'

ইয়োরোপ কি বলছে সে বিষয়ে কারো মনে কোনো ধোঁকা নেই। ইয়োরোপ বলছে, 'হয় মার্কিন ইংরেজের ডিমোক্রেসি গ্রহণ করে তাদের দলে যোগ দাও, নয় লালরক্ত মেখে রুশের সঙ্গে এক হয়ে যাও। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।'

ক্ষীণকণ্ঠে কেউ কেউ বলেন, 'কেন? টিটো?'

উত্তরে শুনি অট্টহাস্য। টিটো ইংরেজে বন্দুক-কামান কেনা-বেচার সমঝাও-ওতাও নাকি হয়ে গিয়েছে কিম্বা হ'ব হ'ব করছে। টিটো মিয়ার 'তৃতীয়পন্থা' তিতু-মীরের বাঁশের কেল্লার মত তিন দিনও টিকলো না। তাঁকেও আস্তে আস্তে মার্কিন-ইংরেজের আস্তিন পাকড়ে এগোতে হচ্ছে।

এর পর আর কোন সাহসে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডের কথা তুলি?

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে ইয়োরোপীয় সাহিত্যিক, চিত্রকার, কবি, দার্শনিকদের নিরঙ্কুশ নৈরাশ্যবাদ। ইংরেজি, ফরাসি, জর্মন, ইতালি যে কোনো মাসিক খুললেই দেখতে পাবেন ইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিই মাথায় হাত দিয়ে বলছেন, 'কোনো পন্থাই তো দেখতে পাচ্ছি নে—মার্কিনের দেখানো পথ মনঃপূত হয় না, রুশের পথই বা ধরি কি প্রকারে? মার্কিন ইংরেজের 'ডিমোক্রেসি' এমনিতেই শোষণ-পন্থী তার উপর আমরা যদি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কম্যুনিজমকে নির্মূল করে দি তাহলে এখনো তারা রুশ জুজুর ভয়ে যে-টুকু সমঝে চলতো, চাষামজুরকে দুমুঠো অন্ন দিত তাও আর দেবে না। আর রুশের কলমা পড়ে যদি মার্কিন-ইংরেজকে সাবড়ে দিই তাহলে স্তালিনকে ঠেকাবে কে? যুগযুগসঞ্চিত ইয়োরোপের তাবৎ সভ্যতা তাবৎ সংস্কৃতিকে তো তিনি 'বুর্জোয়া' বলে নাকচ করে দিয়েছেন, এমন কি তার আপনজন ভার্গা, ভাভিলফ, কল্‌ৎসফ হয় 'পেন্সনে', নয় নির্বাসনে কিম্বা মাটির নীচে। স্তালিন যদি বিশ্বজয় করতে পারেন তবে এ-দুনিয়াতে বাইবেল-

কুরান, বেদ-পুরাণ তো থাকবেনই না, প্লাতো সেকসপীয়র থাকবেন কি না তাই নিয়ে অনায়াসে জল্পনা-কল্পনা করা যেতে পারে। আন্ডা-মাখনের ছয়লাপ হয়ত হবে, কিন্তু এই পৃথিবীর লোক প্লাতো সেকসপীয়র পড়তে পাবে না শুনে স্তালিনী কলমা পড়তে কিছুতেই মন মানে না।'

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে খৃস্টধর্মের প্রতি এদের নৈরাশ্যের অনুযোগ। একমাত্র পেশাদারী পাদ্রি-পুরোত ছাড়া ইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আজ আর এ-বিশ্বাস করেন না যে প্রভু যীশুর সাম্যের বাণী বিশ্ব-সমস্যার সমাধান করতে পারবে। একদিন সে-বাণী দাসকে মুক্তি দিয়েছিল, অত্যাচারীকে শান্ত করতে পেরেছিল, জড়লোক থেকে অধ্যাত্মলোকের অনির্বাণ দীপশিখার চিরন্তন দেয়ালির উৎসব প্রাঙ্গণে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ সে বাণী ভাটিকানের আপন দেশেই লুণ্ঠন অগ্নিবর্ষণ বন্ধ করতে পারছে না।

ইয়োরোপ মরা ঘোড়ার মত পড়ে আছে। ধর্মের চাবুকে সে আর খাড়া হবে না।

অতএব? অতএব কোনো দিকেই যখন আর কোনো ভরসা নেই তখন যা-খুশী একটা বেছে নাও। আর দয়া করে আমাদের শান্তিতে মরতে দাও, আর তাও যদি না করতে দাও তবে আত্মহত্যা করতে দাও। রুশিয়া এবং পশ্চিম-ইয়োরোপে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভিতরই আজ বেশি।

আমরা যদি হটেনটট্‌ হতুম তাহলে আমাদের কোনো দুর্ভাবনা থাকতো না। আত্মহত্যা ছাড়া—অসভ্যদের ভিতর আত্মহত্যার সংখ্যা অতি নগণ্যও বটে—অন্য যে-কোনো দুটো পন্থার ভিতরে একটা বেছে নিয়ে 'দুর্গা' বলে ঝুলে পড়তুম। তারপর যা-হবার হত। (কিছুটা যে হয়েছে সে-কথাও অস্বীকার করা যায় না। কম্যুনিস্টরা তো আছেনই, আরেক দল যে রুশের বিরুদ্ধে ঝটপট শত্রুতা জানিয়ে মার্কিন কল-কব্জা হাতিয়ে এ-দেশটা শোষণ করতে চান সে তত্ত্বটাও আমাদের অজানা নয়।)

'ধন্য সেই জাত, যার কোনো ইতিহাস নেই।' সে নির্ভয়ে যা-কিছু একটা বেছে নিতে পারে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলুন, আর সৌভাগ্যই বলুন আমাদের ঐতিহ্য রয়েছে। সে ঐতিহ্যে আমরা শ্রদ্ধা হারাই নি—হয়ত তার প্রধান কারণ এই যে, বিদেশী শাসনের ফলে আমরা সে ঐতিহ্য অনুযায়ী চলবার সুযোগ এ-যাবৎ পাইনি।

কিন্তু যতদিন সে-শ্রদ্ধা আমাদের মনে রয়েছে ততদিন তো আমরা বিগত-যৌবনা অরক্ষণীয়ার মত নিরাশ হয়ে গিয়ে মার্কিন কিম্বা রুশের গলায় মালা পরিয়ে দিতে পারিনে। স্বরাজের জন্য যারা জেল খাটলো, প্রাণ দিলো তাদের অনেকেই তো মনে মনে স্বপ্ন দেখেছিল ভারতবর্ষের লুপ্ত ঐতিহ্য উদ্ধার করে তারই আলোকে ভবিষ্যতের পথ বেছে নেবে, এমনকি গোপনে গোপনে হয়ত এ-দম্ভও পোষণ করেছিল যে বিশ্বজনকেও সেই 'আলোক-মাতাল স্বর্গ-সভার মহাঙ্গনে' নিমন্ত্রণ করতে পারবে। কৃষ্ণের দেশ, বুদ্ধের দেশ, চৈতন্যের দেশ আজ কপর্দকহীন, দেউলে, একথা মন তো সহজে মেনে নিতে চায় না।

কিন্তু সেখানে আরেক বিপদ। ঐতিহ্যের কথা তুললেই আরেক দল উল্লসিত হয়ে বলেন, 'ঠিক বলেছো, চলো, আমরা বেদ-উপনিষদের সত্যযুগে ফিরে যাই।'

কোনো বিশেষ 'সত্যযুগে' ফিরে যাওয়ার অর্থই মেনে নেওয়া যে, আমাদের ভবিষ্যৎ বলে কোনো জিনিস নেই, সেই যুগকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরার অর্থই হল এ-কথা মেনে নেওয়া যে আমরা যুগ যুগ ধরে শুধু অবনতির পথেই চলে আসছি এবং নূতন জীবন, নবীন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার মত কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই এঁরা তখন সেই বিশেষ 'সত্যযুগে'র আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কর্ম (এমনকি কুসংস্কার পর্যন্ত, কারণ আমরা বিশেষ কোনো সর্বাঙ্গ-সুন্দর 'সত্যযুগে' বিশ্বাস করিনে বলে সব যুগেই কিছু না কিছু কুসংস্কার মূঢ়তা ছিল বলে ধরে নিই) পদে পদে অনুসরণ অনুকরণ করতে লেগে যান। তখন জিগির ওঠে, 'ইয়োরোপীয় সব কিছু বর্জন করো, মার্কিন-রুশের গা ছুঁয়েছো কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ছড়াও চতুর্দিকে গোবরের জল, ঠেকাও তাই দিয়ে শুদ্ধ 'ভারতীয়-সংস্কৃতি'কে 'অস্পৃশ্যের পাপ-স্পর্শ থেকে'।'

এঁরা গড়ে তুলতে চান আবার সেই 'অচলায়তন' যার অন্ধ-প্রাচীর ভেঙে ফেলবার জন্য কবিগুরু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন নবযুগের প্রতীক নূতন 'ডাকঘর' যার ভিতর দিয়ে রুগ্ন অমলকে বাণী পাঠাবেন প্রাচীন রাজা, যিনি জনগণমন-অধিনায়ক, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।

মার্কিন না, রুশ না, এমনকি ভারতীয় কোনো বিশেষ 'সত্যযুগ'ও না—এসব এড়িয়ে বাঁচিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের চলিষ্ণু সদাজাগ্রত শাশ্বত সত্যধর্মের পথে আমাদের চালাবেন কে? সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব, আদর্শে আদর্শে সংঘাত, ঐতিহ্যে ঐতিহ্যে সংগ্রাম, এর মাঝখানে শান্তসমাহিত হয়ে ধ্রুব সত্যের সন্ধান দেবেন কে?

তিনি এলে আমরা তাঁকে চিনতে পারবো তো? আমার মনে হয় পারবো। কারণ তিনি কোন্ ভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করবেন তার কিছুটা সন্ধান আমরা

পেয়ে গিয়েছি—তিনি স্বীকার করে নেবেন প্রথমেই জনগণমন-অধিনায়ক ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে, তাঁর উদার বাণীতেও অহরহ প্রচারিত থাকবে সেই আহ্বান যে আহ্বানে সাড়া দেবে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খৃস্টান, তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাবো সেই চির-সারথির রথচক্রঘর্ঘর, যিনি পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থার উপর দিয়ে দিয়ে এসেছেন আমাদিগকে এই নবযুগের অরুণোদয়ের সামনে।

শত মূঢ়তার মাঝখানে যে আমরা আজ কোটিকণ্ঠে ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে স্বীকার করে নিলুম—জাতীয়-সংগীত নির্বাচনে পথভ্রান্ত হইনি—এ বড় কম আশার কথা নয়॥

ইন্দ্রলুপ্ত

(আবু সঈদ আইয়ুবকে)

ঘরের দাওয়ায়, তেঁতুলের ছাওয়ায়, মাঠের হাওয়ায়
খাওয়া-দাওয়ায়
শান্তি নেই, গরমেরও ক্লান্তি নেই।
সবুজ ঘাস হ'ল হলদে, তারপর ফিকে।
দস্যি কাল-বোশেখি বাঁশের বনে ত্রিবিক্রমের বিক্রমে
তাদের কোমর ভেঙে নামল মাঠে।
লাথি মেরে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল তার শুকনো শেকড়
বেরিয়ে পড়ল শুভ্র, উষ্ণ, নগ্ন মৃত্তিকা
মাঠের টাক—
আমার টাকের মত।

কলনের ঘন বনে
নিদাঘের তপ্ত কাফে কোণে
তুমি বসে আনমনে।
—আমার চুলের ঘুঙুর তোমার নাচালো নয়ন নীল
কালোতে নীলেতে নাৎসি হারাতে পেল কি গোপন মিল?-
রাইনের ওয়াইনের মৃদু গন্ধ,
অন্ধ ভিখারীর ছবি দেয়ালেতে ডাইনে,
এক চোখা রেডিয়োটা করে কট্‌মট্‌
ভয়ে ভয়ে বল্লাম, 'ফ্রলান, Gruess Gott!

বেতারের সুরটা টাঙো না ফক্‌স্‌-ট্রট?'
চট করে চটে যাও পাছে।
তুমি রূপসিনী বন্দিনী
নরাদিশী নন্দিনী।

তোমার প্রেম এল যে
শ্রাবণের বর্ষণের ধারা নিয়ে
চারিদিকে টেনে দিয়ে
ঘনকৃষ্ণ সজল যামিনী যবনিকা।
সে বিরাট বিলুপ্তির বিস্মরণে
শুধু আমার চেতনার ছয় ঋতু
আর তোমার চেতনার চার ঋতুর বিজড়িত নিবিড় স্পর্শ;—।

লাল ঠোঁট দিয়া বঁধুয়া আমার
পড়িল মন্ত্র কাল
দেহলি রুধিয়া হিয়ারে বান্ধিল
পাতিয়া দেহার জাল।
মুখে মুখ দিয়া হিয়ায় হিয়ায়
পরশে পরশ রাখি
বাহু বাহু পাশে ঘন ঘন শ্বাসে
দেহে দেহ দিল ঢাকি।
হঠাৎ দামিনী ধমকালো
বিদ্যুৎ চমকালো
দেখি, নীল চোখ
কাতরে শুধাই একি
তোমার নয়নে দেখি,
আমার দেশের নীলাভ আকাশ
মায়া রচিছে কি?
তোমার বক্ষতলে
আমার দেশের শ্বেতপদ্ম কি
ফুটিল লক্ষ দলে?

রাত পোহাল। বর্ষণ থেমেছে।
কিন্তু কোথায় শরতের শান্তি, হেমন্তের পূর্ণতা?

ঋতুচক্র গেল উলটে—
যমুনার জলও এক দিন উজান বয়েছিল।
কোন্ ঝড় তোমাকে নিয়ে গেল ছিনিয়ে
কোন্ ঝড় আমাকে নিয়ে গেল ঝেঁটিয়ে?
বেরিয়ে এল মাঠের টাক,
আমার টাক।
আমার জীবনে ইন্দু লুপ্ত
আমার কপালে ইন্দ্রলুপ্ত॥

১৯৩৯

নয়রাট

দেশ ভ্রমণের সময় যারা ছন্নের মত ছুটোছুটি করে—অর্থাৎ সকালে মিউজিয়ম, দুপুরে চিত্রশালা, বিকেলে গির্জেদর্শন, সন্ধ্যায় অপেরা, রাত-দুপুরে কাবারে আমি তাদের দলে নেই। দেশে ফেরার পর কোনো পাক্কা টুরিস্ট যদি আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'সে কি হে? তুমি প্রাগে তিনদিন কাটালে অথচ বলছ রাজা কার্লের বর্মাভরণ-অস্ত্রশস্ত্রের মিউজিয়ম দেখনি—এতো অবিশ্বাস্য', আমি তাহলে তা নিয়ে তর্কাতর্কি করিনে কারণ মনে মনে জানি আমি প্রত্যেকটি কড়ির পুরো দাম তোলার জন্য দেশ ভ্রমণে বেরইনি। ছ' পয়সার টিকিট আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত নিয়ে যায়—আমি নামব হেদোয়—তাই আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত গিয়ে সেখানে নেমে, পায়ে হেঁটে ঘণ্টাতে ঘণ্টাতে হেদোয় এসে বেঞ্চিতে বসে ধুঁকতে হবে নাকি? আট নম্বরের জুতো ছ' টাকায় দিচ্ছে বলে আমার ছ' নম্বরী পা'কে আট নম্বরী পরাতে যাব নাকি?

তাই আমার উপদেশ ও কর্মটি করতে যাবেন না। খাওয়ার যে রকম সীমা আছে, ভালো জিনিস দেখারও একটা সীমা আছে। ক্লান্তি বোধ হলেই দেখা ক্ষান্ত দিয়ে একটা কাফেতে বসে যাবেন কিম্বা যদি বাগানে বসবার মত আবহাওয়া হয় তবে বাগানে বসে কফি, চা, বিয়ার কিছু একটার অর্ডার দিয়ে, সিগারেটটি ধরিয়ে আরামসে গা এলিয়ে দেবেন।

এই হল জাবর-কাটার মোকা। এ ক'দিনে যা কিছু দেখেছেন তার মধ্যে যে ক'টি মনে ঢেউ তুলেছিল সেই ঢেউগুলো গুণবেন। কিম্বা বলব আপনার মনের ফিল্ম যে ছবিগুলো তুলেছিল তার গুটিকয়েক ডিভালাপ প্রিণ্টিং করবেন, চোখ বন্ধ করে এক-একটা দেখবেন আর মনের ঘাড় নাড়িয়ে বলবেন, উত্তম হয়েছে, খাসা হয়েছে।

আমার পাশের টেবিলে দুই পাঁড় দাবাখেলনেওলা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে দাবা খেলছিলেন। দু'কাপ কফি হিম হয়ে গিয়েছে—উপরে কফির ঘন সর পড়েছে। জামবাটি সাইজ এ্যাশ-ট্রে পোড়া সিগারেটে ভর্তি। আরো জনতিনেক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে, কিন্তু কারো মুখে কথা নেই, এ দৃশ্য বাঙালীকে রঙ ফলিয়ে দেখাতে হবে না। কৈলাস খুড়োর যে ছবি শরচ্চন্দ্র এ'কে গিয়েছেন তার দোহার গাইবার প্রয়োজন বাঙলা দেশে বহুকাল ধরে হবে না।

খেলোয়াড়দের একজন দেখলুম ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে আসছেন। আধ ঘণ্টাতেই কাবু হয়ে গেলেন। গজের কিস্তিতে যখন মাত হবুহবু, তখন ঘাড়গর্দানে 'শ্রাগ' করে বললেন, 'স্পাঞ্জ ফেলে দিলুম', অর্থাৎ আমার খেলা গয়াগঙ্গাগদাধরহরি।

দর্শকদের একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন, 'কেন? ঐ বড়েটা একঘর ঠেলে দিলে হয় না?'

খাসা চাল তো! ওদিকে কারো নজরই যায়নি। এ চালে আরো খানিকক্ষণ লড়াই দেওয়া যেতে পারে।

খেলোয়াড়টি উঠে দাঁড়িয়ে সেই দর্শককে বললেন, 'আপনি তাহলে বসুন।' দর্শক তখন খেলোয়াড়রূপে বসে প্রথম সামলালেন আপন ঘর, তার পর দিতে আরম্ভ করলেন ধীরে ধীরে চাপ। পষ্ট বোঝা গেল ইনি উচ্চাঙ্গের লেঠেল। এবার অন্য পক্ষের প্রাণ যায় আর কি। শেষটায় তাই হল। পয়লা বারের কসাই এবারে বকরি হয়ে বললেন,—যা বললেন—তার অর্থ 'হরিবোল বল হরি'!

আমরা লক্ষ্য করিনি—কে-ই বা এরূপ স্থলে করে—আরো জনতিনেক দর্শক তখন বেড়ে গিয়েছেন। তাঁদেরই একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন, 'কেন, গজটা পেছিয়ে নিলে হয় না?'

এ চালের অর্থটা আমার কাছে ধরা পড়ল না। কিন্তু কসাই দেখলুম ধরতে পেরেছেন। শুধু বললেন 'হুঁ।' তখন পয়লা বারের কসাই, দুসরা বারের বকরি উঠে বললেন, 'আপনি তা হ'লে বসুন।'

অর্থাৎ খোল-নালচে দুইই তখন বদলে গিয়েছে।

এবারে সত্যি সত্যি লাগল মোষের লড়াই।

শেষটায় খেলা চাল-মাত হল।

ফিরে এসে আপন চেয়ারে বসলুম।

খেলোয়াড়দের একজন তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এক চণ্ডু-খানায় যখন এতক্ষণ এক সঙ্গে আফিং খেয়েছি তখন খানিকটে পরিচয় হয়ে গিয়েছে বই

কি—একটা ছোটো নড্‌ করলুম। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বললেন, 'সুপ্রভাত।' আমি বললুম 'বসুন', 'বসুন'।

ঝুপ করে বসে পড়ে বললেন, 'বসুন', হুঃ, 'বসুন'! ওদিকে আমার প্রাণ যায় আর কি?'

আমি শুধালুম, 'কেন, কি হয়েছে?' বুঝলুম লোকটি দিলখোলা।

বললেন, 'জবাই করবে, মশাই, জবাই করবে আমাকে—বউ। বলেছিলুম, এই এলুম বলে। কি করে জানব বলুন, দাবার চক্করে পড়ে যাব। বলতে পারেন, মশাই, এই বিদঘুটে খেলা বের করেছিল কে? হাঁ, হাঁ, ভারতবর্ষেই তো এর জন্মভূমি। কিন্তু এদেশে এল কি করে?'

'শুনেছি পারসিকরা আমাদের কাছ থেকে শেখে, আরবরা তাদের কাছ থেকে, তারপর ক্রুসেডের লড়াইয়ে বন্দী ইয়োরোপীয়রা শেখে আরবদের কাছ থেকে, তারা দেশে ফিরে—'

'আমাদের মজালে। কিন্তু এখন আমার উপায় কি? আপনারা এ অবস্থায় দেশে কি করেন?'

'চাঁদ-পানা মুখ করে গাল সই।'

'ব্যস! ব্যামোটা বানিয়ে বসে আছেন ঠিক; ওষুধটা বের করতে পারেননি। কিন্তু আমি পেরেছি। চলুন, আমার সঙ্গে, লঞ্চ খাবেন।'

'আর গালও খাব? না?'

'না, না, আপনাকে বকবে কেন? আমি বলব, এঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে কি করে যে বেলা বয়ে গেল ঠাহর করতে পারিনি। চলুন, চলুন, আর দেরী করা নয়।'

চললুম।

ভদ্রলোকের বয়স—এই ধরুন ৪৫-৪৬। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, পরনে উত্তম রুচির কোট-পাতলুন-টাই। সব কিছু পরিপাটি; তাই অনুমান করলুম তাঁর অর্ধাঙ্গিনী তাঁকে বকুন-ঝকুন আর যা-ই করুন না কেন, গৃহিণী হিসেবে তিনি ভালোই।

বললেন, 'যা খুশী তাই বউকে বলে যাবেন, কিচ্ছু ভয় করবেন না। তাঁকে যদি ভুলিয়ে-ভালিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বানিয়ে সিংহলে পাঠিয়ে দিতে পারেন, তাতেও আমি কোনো আপত্তি করব না কিন্তু, স্যর, দয়া করে ঐ দাবা খেলার কথাটি চেপে যাবেন।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই।'

দরজা খুলে দিলেন স্বয়ং স্ত্রী। কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার পূর্বেই ভদ্রলোক আলাপ করিয়ে দিলেন, 'ইনি আমার স্ত্রী, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা—ফ্রানৎ-সিস্‌কা নয়রাট্‌।' আমি বললুম, 'আমার নাম আলী।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার বয়স ৩৫-৩৬ হবে। সুইটজারল্যাণ্ডে এই বয়সে মেয়েদের পূর্ণ যুবতী বলে ধরা হয়। এ-যৌবনে কুমারীর রূপের নেশা আর মাতৃত্বের মাধুরী মিশে গিয়ে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তার রস মানুষ নির্ভয়ে উপভোগ করতে পারে—স্বামী সন্দেহের চোখে দেখে না, রমণী আপনার চোখে চটক লাগাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে না। মেয়েদের আচরণ এ সময় সত্যই বড় মধুর হয়; কখনো তারা তরুণীর মত ভাবে বিহ্বল আত্মহারা হয়ে অকারণ বেদনার কাহিনী বলে যায়, কখনো আবার মাতৃত্বের গর্ব নিয়ে আপনাকে নানা সদুপদেশ দেয়;বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার পাতবার জন্য স্নিগ্ধচোখে অনুনয়বিনয় করে।

স্ত্রীকে কিছু বলতে না দিয়েই হ্যার নয়রাট্‌ বকে যেতে লাগলেন, 'বুঝলে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা, আমি ঠিক সময়েই ফিরে আসতুম কিন্তু এই হ্যার আলীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ইনি ভারতবর্ষের লোক—শুনেছ তো ভারতবর্ষের লোক কি রকম গুণী-জ্ঞানী হয়। ইনি তাঁদেরই একজন। তার প্রমাণও আমি হাতে-নাতে পেয়ে গিয়েছি। রাস্তায় আসতে আসতে তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেলুম, সাত দিন ধরে এসেছেন জিনীভায়, এখনো লীগ অব নেশনসের 'চিড়িয়া-খানা' দেখতে যাননি, শামুনিক্‌স্‌ চড়েন নি, অপেরা-থিয়েটার কিছুই দেখেন নি। আর সব টুরিস্টদের মত সুইটজারল্যাণ্ডের প্রত্যেক দ্রষ্টব্যবস্তুকে পিঁপড়ে নিঙড়ে ঘি বের করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন নি। আমার তো মনে হয়, এ-দেশের উচিত এঁকে এঁর খর্চার পয়সা কিছু ফেরৎ দেওয়া। কি বল?'

পাছে ভদ্রমহিলার অভিমানে ঘা লাগে, আমি তাঁর দেশের কুতুব তাজ ভারতীয় দম্ভের নেশায় তাচ্ছিল্য করছি তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'আমি বড় দুর্বল, বেশি ঘোরাঘুরি করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আস্তে আস্তে সব-কিছুই দেখে নেব।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'সেই ভালো। শামুনিক্‌স্‌ পাহাড় তো আর বসন্তের বরফ নয় যে দু' দিনে গলে যাবে; সুইটজারল্যাণ্ড ভ্রমণ তো আর দাবা-খেলা নয় যে সুযোগ পেয়েও দু'টি কিস্তি না দিলে—'

বাকিটা আমি আর শুনতে পাইনি। আমি তখন ওয়াল-পেপার হয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যাবার জন্য আস্তে আস্তে পিছুপা হতে আরম্ভ করেছি।

শুনি, হ্যার নয়রাট্‌ ব্যথা-ভরা-সুরে বলছেন, 'গিন্নী, ছিঃ।'

আমার অবস্থা তখন এক মাতাল আরেক স্যাঙাৎ মাতালকে সাফাই গাইবার জন্য নিয়ে এসে ধরা পড়লে যা হয়।

নাঃ। ভুল করেছি। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার কামড়ানোর চেয়ে ঘেউ ঘেউটাই বেশী। বললেন, 'আঃ, আপনারাও যেমন। মেয়েছেলে এরকম দু একটা কথা সব সময়েই কয়ে থাকে—ওসব কি গায়ে মাখতে আছে? তুমি দাবা-খেলায়

দু' একটা আজে-বাজে চাল মাঝে মাঝে দাওনা—দুশমন কি করে তাই দেখবার জন্য?'

আবার দাবা! খেয়েছে।

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা স্বামীকে বললেন, 'আজ তো লাঞ্চের ব্যবস্থা বড় মামুলি। সুপ, ফিশ্‌ আ লা র‍্যুস (রাশান কায়দায়) আর এ্যাপল টার্ট উইথ হুইপ্‌ট্‌ ক্রীম। তার চেয়ে বরঞ্চ চল রেস্তোরাঁয়—জিনীভা লেকের মাছ সুইস কায়দায় রান্না—ভালোমন্দ এটা-সেটা।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে শুধালেন,

'আপনি কি খেতে ভালোবাসেন।'

আমি নির্ভয়ে বললুম, 'সুপ্‌, ফিশ্‌ আ লা র‍্যুস, এ্যাপল টার্ট উইথ হুইপ্‌ট্‌ ক্রীম।'

হ্যার নয়রাট্‌ তো আনন্দে গদগদ। বললেন, 'দেখলে, গিন্নী, কি রকম অদ্ভুত আদব-কায়দা! তুমি যদি বলতে আজ রেঁধেছ, স্ট্রিকনিন-সুপ, পটাসিয়ামসায়োনাইড-ফ্রাইড, আর্সেনিক-পুডিং আর কোবরা-রসের কফি তা হলে উনি বলতেন, "দী আইডিয়া, আমি দু' বেলা ঐ জিনিসই খাই"।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'দেখো, পেটার, বিশ্বসংসারের লোককে তুমি আপন মাপকাঠি দিয়ে মেপো না। তোমার মত ওঁর পেট অজুহাতের মানওয়ারী জাহাজ নয়।'

পেটার বললেন, 'সব দাবা-খেলোয়াড়কেই অজুহাত-বিদ্যে আয়ত্ত করতে হয়। বিয়ের পরেই যে রকম হনীমুন, দাবা-খেলার পরেই সেই রকম অজুহাত অন্বেষণ!'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমি তো দাবা খেলিনে।'

কথা শুনে দু'জনাই খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষটায় পেটার বললেন, 'দেখলে গিন্নী, অজুহাতের রাজা কারে কয়? একদম কবুল জবাব, উনি দাবা খেলেন না! বাপ্‌স্‌! মারি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার। অজুহাত যদি দিতেই হয় তবে এমন একখানা ঝাড়ব যে মানুষ রা কাড়বার ফাঁকটি পাবে না। পাক্কা আড়াই ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে দেখলেন আমাদের খেলা, আর এখন অম্লান বদনে বলছেন উনি দাবা খেলেন না।'

আমি সবিনয়ে শুধালুম, 'আপনি কনসার্ট শুনতে যান? আচ্ছা, সেখানে তো পাকি সাড়ে তিন ঘণ্টা বাজনা শোনেন; তাই বলে কি আপনি পিয়ানো, ব্যালা, চেল্লো কত্তাল বাজান?'

ওদিকে দেখি, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আমাদের তর্কাতর্কিতে কান দিচ্ছেন না; শুধু বললেন, 'তাই বলো, দাবা খেলা হচ্ছিল।'

চাণক্য বান্ধবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে যে সঙ্গ দেয় সে বান্ধব।' আমার বিশ্বাস চাণক্য কখনো বিয়ে করেন নি। তা না হলে তিনি 'রাজদ্বারে' না বলে 'জায়াদ্বারে' বলতেন।

জানি, অতিশয় অভদ্রতা হল—তবু বললুম,

'আমার ক্ষিদে পেয়েছে।'

বন্ধুর ফাঁসিটাকে মুলতুবী করাতে পারলুম—এই বা কি কম সান্ত্বনা!

আমরা বাড়িতে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে যেরকম হাপুস-হুপুস শব্দ করে আহারাদি সমাপন করি, নেমন্তন্ন খেতে গিয়েও প্রায় সেই রকমই করে থাকি। তফাৎ মাত্র এইটুকু যে, বাড়িতে চিৎকার করে বলি, 'আরো দুখানা মাছ-ভাজা দাও', নেমন্তন্ন বাড়িতে বলি, 'চৌধুরী মশাইকে আরো দুখানা মাছ-ভাজা দাও'।

সায়েব-সুবোদের কিন্তু বাড়ির খাওয়াতে রেস্তোঁরায় আহারে এবং নেমন্তন্নের ভোজনে ভিন্ন ভিন্ন কায়দা-কেতায় খাওয়া-দাওয়া করতে হয়। সায়েবরা বাড়িতে খেতে বসে গোগ্রাসে গোস্ত গেলে আর পোষাকি ডিনারে কিংবা ব্যানকুয়েটে একরম না খেয়েই বাড়ি ফেরে। ব্যানকুয়েটে আপনাকে সুপ দেওয়া হবে আড়াই চামচ, তার থেকে আপনি খাবেন দেড় চামচ। ডিনারে সুপ খেয়ে ন্যাপকিন দিয়ে মোলায়েম কায়দায় ঠোঁট ব্লট করবেন, কিন্তু ড্যুক অব উইণ্ডসরের সঙ্গে ব্যানকুয়েট খেতে বসলে ঠোঁট ব্লট করাও নিষিদ্ধ, অর্থাৎ তখন ধরে নেওয়া হয়, আপনি এতই কম সুপ খেয়েছেন যে, আপনার ঠোঁট পর্যন্ত ভেজেনি। তারপর পদের পদ উত্তম উত্তম খাদ্য আসবে—আপনি আপন প্লেটে তুলে নেবেন কখনো আড়াই আউন্স, কখনো দু আউন্স এবং খাবেন তার থেকে এক আউন্স কিংবা তার চেয়েও কম। মুর্গীর হাড্ডি থেকে যে ছুরি দিয়ে মাংস চাঁচবেন, তার উপায় নেই এবং গ্রেভিটুকুর মোহ করেছেন কি মরেছেন। সাইড প্লেটে যে এক স্লাইস টোস্ট দিয়েছিল তার এক-দশমাংশের বেশি খেলে পাঁচজনে ভাববে, আপনি রায়লসীমার দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত 'পারিয়া' কিংবা মধ্য-আফ্রিকার মিশনারি-খেকো হটেনটট্।

বিশ্বাস করবেন না, এক খানদানি ক্লাবে আমি দুই পক্ষকে পাকি দু ঘণ্টা ধরে তর্কাতর্কি করতে শুনলুম, সসেজ কি করে খেতে হয়। সমস্যাটা এইরূপঃ—(ক) সসেজ থেকে ছুরি দিয়ে চাক্তি কেটে নিয়ে তার উপর মাস্টার্ড মাখাবে কিংবা (খ) প্রথম সসেজের ডগায় মাস্টার্ড মাখিয়ে নিয়ে পরে সসেজ থেকে চাক্তি কেটে তুলবে? আমি প্রথম পক্ষের হয়ে লড়াই করেছিলুম এবং শেষটায় আমরা ভোটে হেরে গেলুম। এর থেকেই বুঝতে পারছেন, আমি খানদানি খানা খেতে শিখিনি—ব্যানকুয়েটে আমার নাভিশ্বাস ওঠে।

বিশ্বাস করবেন না, মাসখানেক হল এক সুইস খবরের কাগজে দেখি, এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন, প্লেটে যে গ্রেভি পড়ে থাকে, তার উপর রুটি

টুকরো টুকরো করে ফেলে সেই গ্রেভি চেটেপুটে নেওয়া (জর্মন শব্দ tunken) ব্যাকরণসম্মত—অর্থাৎ কায়দাদুরুস্ত—কি না?

উত্তরে এক 'খানদানি মনিষ্যি' বলেছেন, কিছুকাল পূর্বেও এ-অভ্যাস কি বাড়িতে, কি রেস্তোঁরায়, কি ব্যানকুয়েটে সর্বত্রই অতিশয় নিন্দনীয় বলে গণ্য করা হত, কিন্তু আজকের বিশ্বময় খাদ্যাভাবের দিনে বাড়িতে—আপন ডাইনিং রুমে—কর্মটি ক্ষমার্হ।

মুর্গীর ঠ্যাংটি হাতে তুলে নিয়ে 'কড়কড়ায়তে, মড়মড়ায়তে' বাড়িতে বেশির ভাগ ইয়োরোপীয়ই করে, কিন্তু বাইরে নৈব নৈব চ। তবে কোন কোন জর্মন এবং সুইচ রেস্তোঁরায় রোস্ট সার্ভ করবার সময় মুর্গীর ঠ্যাংগুলো উপরের দিকে সাজিয়ে রাখে এবং ঠ্যাংগুলোর ডগায় বাটার পেপারের ক্যাপ পরিয়ে দেয়, যাতে করে আপনি হাত নোংরা না করে ঠ্যাংটা চিবুতে পারেন। এ ব্যবস্থা দেখে ইংরেজের জিভে জল আসে, কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে বলে, 'জর্মনরা বর্বর!'

অপিচ এসপেরেগাস এবং আর্টিচোক ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাওয়া গো-হত্যার ন্যায় মহাপাপ—খেতে হয় হাত দিয়ে।

ইংরেজ যদিস্যাৎ কখনো রাইস-কারি কিংবা ইটালিয়ান রিসোট্টো (এক রকমের কিমা-পোলাও) খায়, তবে টেবিল কিংবা ডেসার্ট স্পুন দিয়ে সে-খাদ্য মুখে তোলে। তাই দেখে ফরাসি-ইতালি আঁৎকে ওঠে—বলে, কী বর্বরতা! একটা আস্ত চামচ মুখে পুরছে—বাপ্‌স্‌। তারা রাইস-কারি খায় ডান হাতে কাঁটা নিয়ে—বিন ছুরিতে। তাই দেখে চীনা ভদ্রসন্তান আবার ভিরমি যায়। বলে, একটা আস্ত ফর্ক মুখে ঢোকাচ্ছে—কী বর্বরতা! তার চেয়ে চপস্টিক কত পরিষ্কার, কত পরিপাটি।

আর বঙ্গসন্তান আমি বলি, এ সবকটা পদ্ধতিই বর্বর না হোক, অন্তত নোংরা। ফর্ক, স্পুন, এমন কি, চপস্টিক পর্যন্ত আমার আপন আঙুলের চেয়ে ঢের নোংরা। সবচেয়ে বাঢ়ীয়া হোটেলের স্পুন নিয়ে আপনি আচ্ছাসে ন্যাপকিন দিয়ে ঘষুন—দেখতে পাবেন ন্যাপকিন কালো হয়ে গেল। অথচ আপনি হাত ধুয়ে যে খেতে বসেন, তখন কাপড়ে আঙুল ঘষলে কাপড় ময়লা হয় না।

কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি টেবিলে বসে খাওয়াতে। টেবিল ক্লথ বাঁচিয়ে, ছুরি-কাঁটা না বাজিয়ে, জল খাওয়ার সময় গ্লাসে ঠোঁটের দাগ না লাগিয়ে, টেবিলের তলায় পাশের কিংবা সামনের লোকের পায়ে গুত্তা না মেরে, আপন গেলাস আর পরের গেলাসে খিচুড়ি না পাকিয়ে, আঁত্রের ফর্ক আর জয়েণ্টের ফর্কে গোলমাল না বাঁধিয়ে, প্লেট শেষ হওয়ার পূর্বে ছুরি-কাঁটা পাশাপাশি না রেখে, ডাইনে-বাঁয়ে সব কিছু রদ্দিবরবাদ না করে, এবং আহারান্তে ঘোৎ

ঘোৎ করে ঢেকুর না তুলে আহার করা আমার পক্ষে কঠিন, সুকঠিন। বিলিতি ডিনার খেতে পারেন মাত্র ম্যাজিশিয়ানরাই, যাঁদের হাত-সাফাই আছে, যাঁরা চিরতনের টেক্কাকে বেমালুম হরতনের নয়লা বানিয়ে দিতে পারেন।

এবং সবচেয়ে গর্ভ-যন্ত্রণা, খাওয়ার দিকে আপনি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবেন না। এর সঙ্গে ওর সঙ্গে আপনাকে মধুর মধুর বাক্যালাপ করতে হবে। আবহাওয়া থেকে আরম্ভ করে আপনাকে রিলেটিভিটি পর্যন্ত কপচাতে হবে। আবার শুধু গল্প করলে চলবে না—সঙ্গে সঙ্গে খেতে হবে। এর পরিমাণ ঠিক রাখা সে-ও এক কঠিন কর্ম। আপনি যদি প্রধান অতিথি হন, তবে আপনাকে বকর বকর করতে হবে বেশি, যদি আমার মত ব্যাক-বেঞ্চার হন, তবে চুপ করে সবকিছু শুনে যেতে হবে—তা সে যতই নিরস নিরানন্দ হোক না কেন?

বলুন তো মশাই, ভোজনের নেমন্তন্ন কি এগজামিনেশন হল?

নয়রাট লোকটি খুশ গল্প করে ঘরবাড়ি জমজমাট করে রাখতে চান সে কথাটা দু' মিনিটেই বুঝে গেলুম, আর গৃহিনীর ভাবসাব দেখে অনুমান করলুম ইনিও সাধাসিধে লোক, লৌকিকতার বড় ধার ধারে না। খানা-টেবিলের পাশে পেঁছেই বললেন, 'এ বাড়িতে পোলিশ গভর্নমেণ্ট, (পোলাণ্ডের ইতিহাসে এত ঘন ঘন অরাজকতা আর বিদ্রোহ হয়েছে যে, জর্মন ভাষায় 'পোলিশ গভর্নমেণ্ট' বলতে 'এলো-মেলো' 'ছন্নছাড়া' বোঝায়) যে যেখানে খুশী বসতে পারেন।'

নয়রাট বাধা দিয়ে বললেন, 'সে কি করে হয়? আমি বসব আমার পশ্চাদ্দেশের উপর, তুমি বসবে—।'

ফ্রান্ৎসিসকা রাগ করে বললেন, 'ছিঃ, পেটার, ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে এই আজ সকালে; আর এর-ই ভিতর তুমি আরম্ভ করে দিয়েছ যত সব অশ্লীল কথা। তার উপর উনি আবার বিদেশী।'

নয়রাট বললেন, 'দেখো, প্রিয়া, তুমি অনেকগুলো ভুল করছ। প্রথমত তুমি বিলক্ষণ জানো, আমি দিশি-বিদেশীতে কোনো ফারাক দেখতে পাইনে। যার সঙ্গে আমার মনের মিল, রুচির মিল হয় সে-ই আমার আত্মজন। কি বলেন, আলীসাহেব?'

আমি বললুম, 'অতি খাঁটি কথা। তবে ভারতীয় ঋষি বলেছেন, 'আমি' 'তুমি'তে পার্থক্য করে লঘুচিত্তের লোক, যাঁর চরিত্র উদার তাঁর কাছে সর্ব বসুধা আত্মজন।'

নয়রাট গুম্ মেরে শুনলেন। অনেকক্ষণ ধরে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়িয়ে

শেষটায় বললেন, 'এটা হজম করতে আমার একটু সময় লাগবে—ফ্রন্‌ৎসিস্‌কার রান্নার মত।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা ভয়ঙ্কর চটে যাওয়ার ভান করে (আমার তাই মনে হল) বললেন, 'দেখো, পেটার, তুমি খাওয়া বন্ধ করে এখ্‌খুনি রেস্তোরাঁ যাও; না হলে এই ডিশ্‌ ছুঁড়ে তোমার মাথা ফাটাব।'

পেটার অতি ধীরে ধীরে আরেক চামচ টমাটো সুপ গিলে নিয়ে প্রথম গিন্নীকে শুধালেন, আরো সুপ আছে কি না, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সবাইকে আত্মজন করা কি কখনো সম্ভবে? এই দেখুন না, সেদিন ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললে, একজোড়া ফেন্সি নূতন জুতো কিনবে—দাম চল্লিশ ফ্রাঁ (৩৮৲)—আমি বললুম আমার অত টাকা নেই, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললে, সে আমার কাছ থেকে টাকা চায় না, তার মা আসছেন দু'দিন পরে, তিনি টাকাটা দেবেন। কি আর করি বলুন তো? তদ্দণ্ডেই টাকাটা ঝেড়ে দিলুম। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার মা! বাপরে বাপ্‌। আপনি কখনো ম্যান-ইটার বাঘের মুখোমুখি হয়েছেন?'

আমি কিছু বলবার পূর্বেই ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আমাকে বললেন, 'দোহাই মা-মেরির! এই পেটারটা যে কী মিথ্যেবাদী আপনাকে কি করে বোঝাই? (পেটারের আপত্তি শোনা গেল, 'ডার্লিং, অশ্লীল গল্পের চেয়ে গাল-গালাজ অনেক বেশি খারাপ') আমার মা যাতে বড়দিন একা-একা না কাটান তার জন্য নিজে—আমাকে না বলে—লুৎসের্ন গিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে এল। তারপর বছরের শেষ রাত্রে তাঁর সঙ্গে ধেই ধেই করে নাচলে ভোর চারটে অবধি—ওর সঙ্গে নাচলে অন্তত পঁচিশটা নাচ, আমার সঙ্গে দুটো, জোর তিনটে। বুড়ীকে শ্যাম্পেন খাইয়ে খাইয়ে টং করিয়ে দিয়ে, যত সব অদ্ভুত পুরনো রাশান আর পোলিশ নাচ। কখনো সে মাটিতে বসে উরু থাবড়ায়—মা তখন তার চতুর্দিকে পাঁই পাঁই করে চক্কর খাচ্ছে—কখনো বাঁদরের মত লম্ফ দিয়ে ছাতে মাথা ঠোকে—মা তখন ১৫ ডিগ্রীতে কাৎ হয়ে স্কার্ট তুলেছেন হাঁটু অবধি। তারপর তাঁকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে বাঁই বাঁই করে ঘুরল ঝাড়া দশ মিনিট। বাদবাকি নাচনে-ওলা-নাচনে-ওলীরা ততক্ষণে ফ্লোর তাদের জন্য সাফ করে দিয়ে আপন আপন টেবিলে চলে গিয়েছে। অরকেস্ট্রাও বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছে, একটা নাচের জন্য ওরা বাজনা বাজায় দশ, জোর পনেরো মিনিট—ঐ মাৎসুর্কা না কি পাগলা নাচের জন্য ওরা বাজনা বাজালে পাকি এক ঘণ্টা। নাচের শেষে মা তো নেতিয়ে পড়ল চেয়ারে, ওদিকে কিন্তু চোখ বন্ধ করে বুড়ী মিটমিটিয়ে হাসছে—খুশীতে ডগোমগো!'

পেটার বললেন, 'ডার্লিং, কিন্তু সে রাত্রের সবচেয়ে সেরা নাচের জন্য কে প্রাইজ পেল সেটা তো বললে না।'

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মা পেলেন ফার্স্ট প্রাইজ, আমি সেকেণ্ড। তাইতো আমি শাশুড়ীদের বিলকুল পছন্দ করিনে।'

ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, 'আচ্ছা আহাম্মুখ তো। নাচের পয়লা প্রাইজ হামেশাই রমণী পায়। দুসরাটা পুরুষ। এটা হচ্ছে শিভাল্‌রি। তোমাকে কি করে পয়লা প্রাইজ দিত?'

পেটার আমার দিকে মুখ করে বললেন, 'গিন্নীর রাগ, আমি ওর সঙ্গে নাচলুম না কেন? আচ্ছা, মশায় বলুন তো, আপনি যদি কবিতা পড়ে শোনান, খোশগল্প করেন, বাজনা বাজান কিম্বা কালোয়াতি করেন তবে যে সমে সমে মাথা নাড়তে পারে তাকে আদর-কদর করবেন, না, আপন স্ত্রীকে? যেহেতু তিনি আপন স্ত্রী। রসের বাজারে আপন পর করা যায়?'

আমি উল্লসিত হয়ে বললুম, 'তাই তো আমি নিবেদন করলুম, 'যাঁর চরিত্র উদার—অর্থাৎ যিনি রসিক জন—তাঁর কাছে সর্ব বসুধা আত্মজন'।'

পেটার নয়রাট বললেন, 'গিন্নী অবশ্যি একটা কথা ঠিক বলেছেন, আমরা কেউই এটিকেটের ধার ধারিনে। এ বিষয়ে চমৎকার একটা 'ট্যুনিস,' 'শেলের' গল্প আছে। ট্যুনিশ-শেল'কে চেনেন?

আমি বললুম, 'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আগাগোড়া একটি 'প্রতিষ্ঠান' বলতে পারেন। 'ট্যুনিস্' কথাটা এসেছে লাতিন 'আন্তনিয়ুস' থেকে। আন্তনিয়ুস গাল-ভরা, গেরেমভারী, খানদানি ঐতিহাসিক নাম। আর ট্যুনিস্ অতিশয় প্লিবিয়ান অপভ্রংশ—নামটাতেই তাই একটুখানি রসের আমেজ লাগে।'

আমি বললুম, 'আমাদের 'পঞ্চানন' নামটাও গেরেমভারী কিন্তু তার গার্হস্থ্য সংস্করণ 'পাঁচু'টাতেও ঐরকম রস সৃষ্টি হয়।'

'তাই নাকি? আপনারাও তাহলে এ রসে বঞ্চিত নন? আর 'শেল' কথাটার মানে 'ট্যারা'। বুঝতেই পারছেন পিতৃদত্ত নাম নয়, পাড়াদত্ত। এবং নাম থেকেই বুঝতে পারছেন, এরা দুজন ড্যুক, ব্যারন নন—খাঁটি ওয়ার্কিং কেলাস। খায়দায়, ফুর্তিফার্তি করে, ফোকটে দু' পয়সা মারার তালে থাকে, কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ আর বিয়ার-খানায় আড্ডা জমাতে পারলে এরা আর কিছু চায় না।

'একদিন হয়েছে কি ট্যুনিস-শেল রাস্তায় একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে—তা ওরা হামেশাই ওরকমধারা রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়, না হলে গল্পই বা জমবে কি করে?

'ট্যুনিস বললে, 'চ, শেল; এই দিয়ে উত্তমরূপে আহারাদি করা যাক।' দুজনা ঢুকল গিয়ে এক রেস্তোরাঁয় আর অর্ডার দিলে দু'খানা কটলেটের।

'ওয়েটার এসে ছুরিকাঁটা আর দুখানা প্লেট সাজিয়ে দিয়ে আনলো একখানা বড় ডিশে করে দু'খানা কটলেট।'

নয়রাট বললেন, 'কটলেট তো আর অ্যারোপ্লেনের স্ক্রু নয় যে ফিতে দিয়ে দিয়ে মেপেজুকে কিম্বা ছাঁচে ঢেলে, ঠিক একই সাইজে বানানো হবে, কাজেই

একখানা কটলেট আরেকখানার চেয়ে সামান্য একটু বড় হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

'ট্যুনিস তাই ঝপ করে বড় কটলেটখানা আপন প্লেটে তুলে নিল। শেল চুপ করে দেখল। তারপর আস্তে আস্তে ছোট কটলেটখানা তুলে নিয়ে ট্যুনিসকে বললে, 'ট্যুনিস, তুই আদব-কায়দা একদম জানিসনে।' —যেন নিজে সে মহা খানদানি ঘরের ছেলে।

'ট্যুনিস শুধালে, 'কেন, কি হয়েছে?'

'শেল বললে, 'ভদ্রতা হচ্ছে, যে ডিশ থেকে প্রথম খাবার তুলবে, সে নেবে ছোট টুকরোটা।'

'ট্যুনিস বললে, 'অ। আচ্ছা, তুই যদি প্রথম নিতি তবে তুই কি করতি।'

'শেল দম্ভ করে বলল, 'নিশ্চয়ই ছোট কটলেটটা তুলতুম।'

'তখন ট্যুনিস বললে, 'সেইটেই তো পেয়েছিস, তবে ভ্যাচর ভ্যাচর করছিস কেন?'

নয়রাট গল্প শেষ করে খানাতে মন দিলেন।

বলতে পারব না, আমার পাঠকদের গল্পটা কি রকম লাগল—আমার কিন্তু উত্তম মনে হল, তাই প্রাণভরে খানিকক্ষণ হেসে নিলুম।

নয়রাট বললেন, 'তাই যখন কেউ এটিকেট নিয়ে বড্ড বেশি কপচাতে শুরু করে তখনই আমার এই গল্পটা মনে পড়ে আর হাসি পায়। আরে বাবা, সংসারে থাকবি মাত্র দু'দিন। তার ভিতর কত হাঙ্গামা, কত হুজ্জৎ। সেই সব সামলাতে গিয়েই প্রাণটা খাবি খায়। তার উপর যদি এটিকেটের নাগপাশ দিয়ে সর্বাঙ্গ আর নবদ্বার বেঁধে দাও (ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার আপত্তি শোনা গেল, 'পেটার, আবার অশ্লীল কথা') তবে দম ফেলব কি করে? হাঁচবার এটিকেট, কাশবার এটিকেট, থুথু ফেলার এটিকেট, গা চুলকাবার এটিকেট—প্রাণটা যায় আর কি?

আমি সায় দিলুম।

তখন নয়রাট শুধালেন, 'বলুন তো, কি সে জিনিস যা চাষা অনাদরে, তাচ্ছিল্যে, এমন কি বলতে পারেন, ঘেন্নাভরে রাস্তায় ফেলে দেয়, আর ভদ্রলোক সেটাকে ধোপদুরুস্ত দামী রুমালে ঢেকে, পকেটে পুরে, অতি সন্তর্পণে বাড়ি নিয়ে আসেন?'

আমি খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললুম, 'তা তো জানিনে।'

বললেন, 'সিকনি। চাষা ফাঁৎ করে রাস্তায় নাক ঝেড়ে ওদিকে আর তাকায় না; ভদ্রলোক রুমাল খুলে ছিক্‌ করে তারই উপর একটুখানি নাক ঝেড়ে, সেটিকে সযত্নে ভাঁজ করে, পকেটে পুরে বাড়ি ফেরেন।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা হঠাৎ বললেন, 'পেটার, তুমি তো বক বক করে এটিকেটের নিন্দাই করে যাচ্ছ, ওদিকে একদম ভুলে গিয়েছ, ভদ্রলোক প্রাচ্যদেশীয়, সেখানে

এটিকেটের অন্ত নেই। এদেশে তো প্রবাদই রয়েছে, 'ওরিয়েন্টাল্ কার্টসি।' যে আচার ওঁদের প্রিয় তুমি তাই নিয়ে মস্করার পর মস্করা করে যাচ্ছে।'

পেটার বললেন, 'আদপেই না। আমি তো ভদ্রতার (ম্যানার্স) নিন্দে করছিনে, আমি করছি এটিকেটের। দু'টো তো এক জিনিস নয়।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাদের দেশে ব্যবস্থাটা কি রকম?'

আমি বললুম, 'অনেকটা আপনাদের দেশেরই মত। অর্থাৎ, ভদ্রতারক্ষার চেষ্টা আমরাও করে থাকি তবে এটিকেটের বাড়াবাড়ি দেখলে তাই নিয়ে আপনার-ই মত টীকাটিপ্পনী কেটে থাকি। তবে কি না ভারতবর্ষ বিরাট দেশ—তার নানা প্রদেশে নানা রকমের এটিকেট। এই ধরুন লক্ষ্ণৌ। সেখানে কোনো খানদানি বাড়িতে নিমন্ত্রণে যেতে হলে বাড়িতে উত্তমরূপে আহারাদি সেরে যেতে হয়। কারণ, খানার মজলিসে গল্প উঠবে, কোন্ মৌলানা দিনে আড়াই তোলা খেতেন, কোন্ সাহেব-জাদা দুই তোলা, কোন পীর-জাদা এক তোলা আর কোন্ নওয়াব একদম খেতেনই না।

অথচ সংস্কৃত আপ্তবাক্য এ বিষয়ে যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা এ এটিকেট আদপেই মানতেন না।'

কর্তা-গিন্নী উভয়েই শুধালেন, 'আপ্ত-বাক্য কি?'

আমি বললুম,—

পরান্নং প্রাপ্য দুর্বুদ্ধে, মা প্রাণেষু দয়াং কুরু।
পরান্নং দুর্লভং লোকে প্রাণাঃ জন্মনি জন্মনি॥

অর্থাৎ,—

ওরে মূর্খ নেমন্তন্ন পেয়েছিস, ভালো করে খেয়ে নে। প্রাণের মায়া করিসনি, কারণ ভেবে দেখ, নেমন্তন্ন কেউ বড় একটা করে না। বেশি খেয়ে যদি মরে যাস তাতেই বা কি—প্রাণ তো ভগবান প্রতি জন্মে ফ্রি দেয়, তার জন্য তো আর খর্চা হয় না।

আমি বললুম, 'চমৎকার রান্না হয়েছে'—রান্না সত্যই মামুলি রান্নার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছিল, পোষাকি রান্না বললেও অত্যুক্তি হয় না। তারপর জিজ্ঞেস করলুম, রুশ কায়দায় মাছ কি করে রাঁধতে হয়।

ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, 'আপনার বুঝি রান্নায় শখ?'

আমি বললুম, 'না; তবে আমার মা খুব ভালো রাঁধতে পারেন আর নূতন নূতন দিশী-বিদেশী পদ শেখাতে তাঁর ভারি আগ্রহ। আমি প্রতিবার দেশ-

বিদেশ ঘুরে যখন বাড়ি ফিরি তখন বাড়ির সবাই আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নানারকম গল্প শোনে, মাও শোনেন, কিন্তু গল্প বলার প্রথম ধাক্কা কেটে যাওয়ার পর তিনি আমাকে একলা একলি শুধান, নূতন রান্না কি কি খেলুম। আমি ভালো ভালো পদগুলোর নাম করলে পর মা শুধাতেন ওগুলো কি করে রাঁধতে হয়। গোড়ার দিকে রন্ধনপদ্ধতি খেয়াল করে শিখে আসতুম না বলে মাকে কষ্ট করে এক্সপেরিমেণ্ট করে করে শেষটায় পদটা তৈরী করার পদ্ধতি বের করতে হত। এখন তাই মোটামুটি পদ্ধতিটা শিখে নিই; মাকে বলা মাত্রই দুই ট্রায়েলের পরই ঠিক জিনিস তৈরী করে দেন।'

ফ্রান্ৎসিস্কা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বলেন কি?'

বললুম, 'হ্যাঁ, আশ্চর্য হবারই কথা। আমিও একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তিনি কোনো পদ না দেখে না চেখে তৈরী করেন কি করে? মা বলেছিলেন,—এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে—'আরে বাপু, রান্না মানে তো, হয় সেদ্ধ করা, নয় তেলে ঘিয়ে ভাজা, কিম্বা শুকনো শুকনো ভাজা অথবা শিকে ঝলসে নেওয়া। এর-ই একটা, দুটো কিম্বা তিনটে কায়দা চালালেই পদ ঠিক উৎরে আসবে। আর তুইও তো বলেছিস আমাদের দেশের বাইরে এমন কোনো মশলা জন্মায় না যা এদেশে নেই। তা হলে তুই যা বিদেশে খেয়েছিস আমি তৈরী করতে পারব না কেন?'

তারপর বললুম, 'অবশ্য মা আমাকে কখনো এস্পেরেগাস্ কিম্বা আর্টিচোক খাওয়ান নি কারণ ওগুলো আমাদের দেশে গজায় না। তাই নিয়ে মায়েরও কোনো ক্ষেদ নেই—কারণ যে সব শাক-সব্জী আমাদের দেশে একদম হয় না সেগুলোর কথা আমি মায়ের সামনে একদম চেপে যেতুম।'

ফ্রানৎসিস্কা বুদ্ধিমতী মেয়ে, বললেন, 'ওঃ, পাছে তাঁর দুঃখ থেকে যায়, তিনি তাঁর ছেলের সব প্রিয় খাদ্য খাওয়াতে পারলেন না।'

আমি বললুম, 'হাঁ। কিন্তু তিনি যে তরো-বেতরো রান্না শেখার জন্য যে উঠেপড়ে লেগে যেতেন তার আরো একটা কারণ রয়েছে। রান্না হচ্ছে পুরোদস্তুর আর্ট। আর আমার মা—'

ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, 'থামলেন কেন?'

আমি লজ্জার সঙ্গে বললুম, 'নিজের মা'য়ের কথা সত্যি হলেও বলতে গেলে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকে। আপনারা হয়তো ভাববেন ফলিয়ে বলছি।'

নয়রাট এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন, এখন হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'ব্যস হয়েছে! আপনাকে আর এটিকেট দেখাতে হবে না। ফ্রান্ৎসিস্কা আপনাকে বলেনি, এবাড়িতে এটিকেট বারণ?'

ফ্রান্ৎসিস্কা তাড়াতাড়ি বললেন, 'ছিঃ, পেটার, তুমি ওরকম কড়া কথা কও কেন?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে বললুম, 'আদপেই না। ওর ধমক থেকে

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আপনারা সরল প্রকৃতির লোক, আপনাদের সামনে সব কিছু অনায়াসে খুলে বলা যায়। তা হলে শুনুন, যা বলছিলুম, রান্না হচ্ছে পুরোদস্তুর আর্ট বিশেষ আর আমার মা খাঁটি আর্টিস্ট। ঠিক 'আর্ট ফর আর্টস সেক' নয়, অর্থাৎ তিনি মনের আনন্দে খুদ-খুশীর জন্য রেঁধেই যাচ্ছেন, কেউ খাচ্ছে না, কিম্বা খেয়েও কেউ ভালোমন্দ কিছু বলছে না—তা নয়। তিনি রান্নার নূতন নূতন টেক্‌নিক শিখতে ভালোবাসতেন সত্যকার আর্টিস্ট যে রকম নূতন নূতন টেকনিক্ শিখতে ভালোবাসে। আপনি ভালো অয়েলপেণ্টিং করতে পারেন, কিন্তু ওয়ালপেণ্টিং দেখে কিম্বা তার কথা শুনে আপনারও কি ইচ্ছে হবে না সেই টেকনিক রপ্ত করার? কিম্বা আপনি উড্‌কাট করেন—যদি লাইন-এন্‌গ্রেভিং, এচিং, মেদজোটিণ্ট, আকওয়াটিণ্টের খবর পান, তবে সেগুলোও আয়ত্ত করার বাসনা আপনার হবে না?

'অথচ দেখুন খাঁটি আর্টিস্ট অজানা জিনিস আয়ত্ত করার জন্য যত উদ্‌গ্রীবই হোক না কেন, হাতের কাছের সামান্যতম মালমশলাও সে অবহেলা করে না—নানা রঙের মাটি, শাক-সব্জী থেকেও নূতন রঙ আহরণ করার চেষ্টা করে।

'ভারতবর্ষের যে প্রান্তে আমার দেশ, সেখানে সব সময় জাফরাণ পাওয়া যায় না। তাই মা তারই একটা 'এরজাৎস' সব সময়ে হাতের কাছে রাখেন। বুঝিয়ে বলছি—

'আমাদের দেশে এক রকম ফুল হয়, তার নাম শিউলি। শিউলির বোঁটা সুন্দর কমলা রঙের আর পাপড়ী শাদা। ফুল বাসি হয়ে গেলে মা সেই বোঁটাগুলো রোদ্দুরে শুকিয়ে বোতলে ভরে রাখেন। সেই শুকনো বোঁটা গরম জলে ছেড়ে দিলে চমৎকার সুগন্ধ আর কমলা রঙ বেরয়। মেয়েরা সাধারণত ঐ রঙ দিয়ে শাড়ি ছোপায়। মা খুব সরু চালের ভাত ঐ রঙে ছুপিয়ে নিয়ে চিনি, কিসমিস বাদাম দিয়ে ভারী সুন্দর 'মিঠাখুনা' তৈরি করেন।

'এটা মায়ের আবিষ্কার নয়। কিন্তু তবু যে বললুম, তার কারণ প্রকৃত গুণী কলাসৃষ্টির জন্য দেশী-বিদেশী কোনো উপকরণই অবহেলা করেন না।'

নয়রাটদের বাড়িতে এটিকেট বারণ, তবু আপন মায়ের কথা একসঙ্গে এতখানি বলে ফেলে কেমন যেন লজ্জা পেলুম।

রুশ কবি পুশ্‌কিনের রচিত একটি কবিতার সারমর্ম এই,—

'হে ভগবান, আমার প্রতিবেশীর যদি ধনজনের অন্ত না থাকে, তার গোলাঘর যদি বারো মাস ভর্তি থাকে, তার সদাশয় সচ্চরিত্র ছেলেমেয়ে যদি বাড়ি আলো করে রয়, তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি যদি দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তবু তাতে আমার কণামাত্র লোভ নেই; কিন্তু তার দাসীটি যদি সুন্দরী হয়

তবে—তবে, হে ভগবান, আমাকে মাপ করো, সে অবস্থায় আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য হয়।'

পুশ্‌কিন সুশিক্ষিত, সুপুরুষ এবং খানদানি ঘরের ছেলে ছিলেন; কাজেই তাঁর 'চিত্তদৌর্বল্য' কি প্রকারের হতে পারত সে কথা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। এইবারে সবাই চোখ বন্ধ করে ভেবে নিন কোন্‌ জিনিসের প্রতি কার দুর্বলতা আছে।

আমি নিজে বলতে পারি, সাততলা বাড়ি, ঢাউস মোটর গাড়ি, সাহিত্যিক প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এ সবের প্রতি আমার কণামাত্র লোভ নেই। আমার লোভ মাত্র একটি জিনিসের প্রতি—অবসর। যখনই দেখি, লোকটার দু' পয়সা আছে অর্থাৎ পেটের দায়ে তাকে দিনের বেশির ভাগ সময় এবং সর্বপ্রকারের শক্তি এবং ক্ষমতা বিক্রী করে দিতে হচ্ছে না, তখন তাকে আমি হিংসে করি। এখানে আমি বিলাসব্যসনের কথা ভাবছিনে, পেটের ভাত '—'র* কাপড় হলেই হল।

'অবসর' বলতে আমি কুঁড়েমির কথাও ভাবছিনে। আমার মনে হয়, প্রকৃত ভদ্রজন অবসর পেলে আপন শক্তির সত্য বিকাশ করার সুযোগ পায় এবং তাতে করে সমাজের কল্যাণলাভ হয়। এই ধরুন, আমার বন্ধু শ্রী'ক' দাশগুপ্ত। বদ্যির ছেলে—পেটে অসীম এলেম, তুখোড় ছোকরা, তালেবর ব্যক্তি। সদাগরী আপিসে কর্ম করে, বড় সায়েবকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়—মোটা তন্‌খা ভী পায়।

বয়স তার এখনো তিরিশ পেরোয়নি। পার্টিশেনের পর মারোয়াড়ী কারবারীরা যখন তার 'বস্‌'কে ঘায়েল করে তার ব্যবসা কেনবার জন্য উঠে পড়ে লাগল, তখন আমার এই বদ্যির ব্যাটা সায়েবকে এমন সব 'কৈশল' বাৎলালে যে উল্টে ওনুরা চোখের জলে নাকের জলে।

সায়েবও বড় নেমকহালাল† লোক। প্রায়ই 'হ্যালো, ড্যাস্‌-গুপ্‌টা', বলে বাড়িতে ঢোকেন, 'ল্যোচি (লুচি) খেয়ে যান, ড্যাস্‌-গুপ্‌টার ছেলেদের জন্য পুজোর-বাজারে দু'চারখানা 'ডৌটি' (ধুতি)ও রেখে যান। আমি রববার সকালটা দাশগুপ্তের বাড়িতে কাটাই, তাই সায়েবের সঙ্গে মাঝে মাঝে মোলাকাৎ হয়ে যায়। লোকটি এদেশে-আসা সাধারণ ইংরেজের মত গাড়ল নয়, ইংরিজী শোলোক খাসা কপচাতে পারে, অর্থাৎ মধুরকণ্ঠে উচ্চ-স্বরে শেলি-কীটস্‌ আবৃত্তি করতে পারে।

---

* শব্দটা গ্রাম্য; কিন্তু পূজনীয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিধানে শব্দটিকে অবহেলা করেননি বলে আমি ড্যাশ্‌ দিয়ে সারলুম। তিনি গুরুজন—তাঁর শাস্ত্রাধিকার আছে।

† 'নেমকহারাম' অর্থাৎ 'অকৃতজ্ঞ', সমাসটা বাঙলায় চলে। 'নেমকহালাল' ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ 'কৃতজ্ঞ'। 'নেমকহারাম', 'নেমকহালাল' কথাগুলো কিন্তু 'কৃতজ্ঞ, 'অকৃতজ্ঞের চেয়ে জোরদার। 'নেমক'='নুন'—তার 'অপমান' (হারাম) কিম্বা 'সম্মান' (হালাল)।

সায়েবের কথা উপস্থিত থাক। দাশগুপ্তের কথায় ফিরে যাই।

আমি জানি দাশগুপ্ত কোনো চেম্বার অব্ কমার্সের বড়কর্তা হবার জন্য লালায়িত নয়। দেড় হাজার টাকার মাইনেকেও সে থোড়াই কেয়ার করে।

আমি জানি, আজ যদি তাকে কেউ পাঁচশ টাকা প্রতি মাসে দেয়, তবে সে কলকাতা শহরের হেথা-হোথা সর্বত্র দশখানা নাইটস্কুল খুলবে। এখন সে আপিসে দিনে সাত ঘণ্টা কাটায়,—নাইট-স্কুল খোলবার মোকা পেলে সে পরমানন্দে দিনে চোদ্দ ঘণ্টা সেগুলোর তদারকিতে, ক্লাশ নেওয়াতে কাটাবে। বিশ্বাস করবেন না, সে তার উড়ে চাকরটাকে স্বাক্ষর করার জন্য উড়ে কায়দায় বর্ণমালা পর্যন্ত শিখিয়েছে—চোখ বন্ধ করে মাথা দুলিয়ে দিব্য বলে যায়,—

'ক' রে কমললোচন শ্রীহরি
'খ' রে খগ-আসনে খগপতি
'গ' রে গরুড়-আসনে মুরারি—
'ঘ' রে—ইত্যাদি ইত্যাদি

(আমার সহৃদয় উড়িষ্যাবাসী পাঠকবৃন্দ যেন কোনো অপরাধ না নেন—যদি নামতাতে কোনো ভুল থেকে যায়; আমি দাশগুপ্তের মুখে মাত্র দু'তিনবার শুনেছি; কেউ যদি আমাকে পুরো পাঠটা পাঠিয়ে দেন, তবে বড় উপকৃত হই)।

অর্থাৎ আজ যদি দাশগুপ্তকে পেটের ধান্দায় আপিস না যেতে হয়, তবে সে তার জীবন্মৃত্যুর চরম কাম্য কাজে ফলাতে পারবে। কে ক' লক্ষ মণ পাট কিনল, কে ধাপ্পা এবং ঘুষ দিয়ে ক'খানা ওয়াগন্ বাগালে তাতে দাশগুপ্তের কোনো প্রকারের চিত্তদৌর্বল্যও (হেথাকার ভাষায় 'দিল্‌চস্‌পী') নেই। দেড় হাজার টাকার মাইনে কমে গিয়ে পাঁচশ' হলে সে দুম্ করে মোটরখানা বিক্রী করে দিয়ে ট্রামে চড়ে ইস্কুলগুলোর তদারক করবে।

আপনি বিচক্ষণ লোক, আপনি শুধাবেন, এ পাগলামী কেন?

এটা পাগলামী নয়।

আসলে দাশগুপ্ত ইস্কুল-মেস্টার। তার বাবা টোলে আয়ুর্বেদ শেখাতেন, তার ঠাকুরদা'ও তাই, তাঁর বাপও তাই, তাঁর উপরের খবর জানিনে।

এবং আমার সুহৃদ যে কী অদ্ভুত ইস্কুল-মেস্টার সে কথা কি করে বোঝাই? চাকরির ঝামেলার মধ্যিখানেও সে একটা নাইট-ইস্কুল চালায়।

একদিন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দেখি, সে তার ইস্কুলে ইংরিজী পড়াচ্ছে। চেঁচিয়ে বলছে, 'আই গো,'

ছোড়ারা তীব্রকণ্ঠে ঐক্যস্বরে বলছে, 'আই গো'!

'উই গো!'

'উই গো!'

'ইউ গো!'
'ইউ গো!'
'হী গোজ!'
'হী গোজ!'
'রাম গোজ!'
'রাম গোজ!'
'শ্যাম গোজ!'
'শ্যাম গোজ!'

দাশগুপ্ত সদ্দার-পোড়োর মত বলে যাচ্ছে আর ছোঁড়ারা চীৎকার করে দোহার গাইছে।

সর্বশেষে দাশগুপ্ত লাফ দিয়ে উচ্চতম কণ্ঠে চেঁচালে 'রাম এ্যান্ড শ্যাম গো, গো, গো!'

দাশগুপ্তের স্বপ্ন কখনো বাস্তবে পরিণত হবে না। এমন দিন কখনো আসবে না যে, সে পেটের চিন্তার ফৈসালা করে নিয়ে তামাম শহর নাইট-স্কুলে নাইট-স্কুলে ছয়লাপ করে দিতে পারে।

দাশগুপ্তের কথা থাক। আমি তার উল্লেখ করলুম নয়রাট-জীবনীটা তুলনা দিয়ে খোলসা করার জন্য।

ইয়োরোপে এ জিনিসটা হামেশাই হচ্ছে।

নয়রাট মেট্রিক পাশ করেন ১৮ বছর বয়সে, সংসারে ঢোকেন ১৯ বছর বয়সে। তারপর ঝাড়া ছাব্বিশটি বছর ব্যবসা-বাণিজ্য করে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে দেখেন এতখানি পুঁজি জমেছে যে, বাকী জীবন তাঁকে আর সংসার-খরচের জন্য ভাবতে হবে না।

নয়রাটের ভাষাতেই বলি,

'টাকা জমানোর নেশা আমাকে কখনো পায় নি। আমি জানি এ দুনিয়ার বহু লোকই আমার ধারণা নিয়ে সংসারে ঢোকে কিন্তু বেশিরভাগই শেষ পর্যন্ত ধর্মচ্যুত হয়। জীবনে আমার কতকগুলো শখ ছিল—কিন্তু হিসেব করে দেখলুম, সেগুলো বাগে আনতে হলে পেটের একটা ফৈসালা পয়লাই করে নিতে হবে। তাই খাটলুম ছাব্বিশ বছর ধরে একটানা। আমার অসুখ-বিসুখ করে না, আমি একদিনের তরে কাজে কামাই করি নি—ঐ শুধু বিয়ের সময় যে সাতদিন হনিমুন কাটাই বাধ্য হয়ে তারই জন্য ছুটি নিতে হয়েছিল।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'তা ছুটি নিয়েছিলে কেন? আমি বলিনি, তোমার আপিসঘরে, কিম্বা সেখানে জায়গা না হলে তোমার গুদোম ঘরে পাদ্রী ডেকে মন্ত্র পড়লেই হবে।'

নয়রাট বললেন, 'অন্য মতলব ছিল, ডার্লিং, তোমাকে তো আর সব কিছু খুলে বলি নি।' ফ্রান্‌ৎসিসকা বললেন, 'বটে!'

নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে খুলে কই।

'বিয়ে করেই বউকে নিয়ে চলে গেলুম এক অজ পাড়াগাঁয়ে। সে গাঁটা খুঁজে বের করতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল এবং সে গাঁ থেকেও আধ মাইল দূরে একটি 'শালে' ভাড়া নিলুম সাতদিনের জন্য। সেখানে ইলেকটিরি আছে—ব্যস আর কিছু না। জলের কল না, খবরের কাগজ না, দুধওলা দুধ পর্যন্ত দিয়ে যায় না।

'রাত্তিরের ডিনার খেয়েই আমরা সে বাড়িতে গিয়ে উঠলুম।

'ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বাড়িতে ঢুকেই সোহাগ করে বললে—'

ফ্রানৎসিসকা বললেন, 'চোপ্।'

নয়রাট বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, চোপ।' তারপর আমাকে বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে কমিয়ে সমিয়ে বলছি—বাদ-বাকিটা পরে আপনাকে একলা-একলি বলব।

'ভোর তিনটের সময় আমি চুপসে খাট ছেড়ে উঠে পা টিপে টিপে নামলুম নিচের তলায়। পিছনের বাগানে গিয়ে সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে গেলুম রান্নাঘরে। সেখানে নাকে-মুখে বিস্তর ধুয়ো গিলে ধরালুম উনুন। তারপর আণ্ডা বেকন ফ্রাই করে, গরম কফি, টোস্ট ইত্যাদি বানিয়ে যাবতীয় বস্তু একখানা বিরাট খুঞ্চাতে সাজিয়ে গেলুম্ উপরের তলায় ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার বিছানার কাছে। আস্তে আস্তে জাগিয়ে বললুম, 'ব্রেকফাস্ট তৈরী।'

'ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে (আবার 'চোপ' এবং 'আচ্ছা, আচ্ছা, "চোপ" শোনা গেল) ডার্লিং তুমি আমাকে কত না ভালোবাসো—এই ভোরে এই শীতে আমাকে কিছু না বলে তুমি এত সব করেছ।'

'আমি বললুম, "ডার্লিং না কচু, ভালোবাসা না হাতী। আমি এসব তৈরী করে আনলুম শুধু তোমাকে দেখাবার জন্য যে, বাদ-বাকী জীবন তোমাকে এই রকম ধারা করতে হবে। আর আমি শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খাবো।"

আমি প্রাণ খুলে হাসলুম।

দেখি নয়রাটও মিটমিটিয়ে হাসছেন। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'আপনি এই তাড়ীখানার বেহুদা প্রলাপটা বিশ্বাস করলেন?'

আমি বললুম, 'কেন করব না? শাদীর পয়লা রাতে শুধু ইরানেই নয়, আরো মেলাদেশে মেলা বর বেড়াল মেরেছে, এ তো আর নূতন কথা কিছু নয়।* এবারে সুইস্ সংস্করণটি শেখা হল এই যা।'

দুজনেই জিজ্ঞেস করলেন, 'সে আবার কি?'

আমাকে বাধ্য হয়ে শাদীর পয়লা রাতে বেড়াল-মারার গল্পটা বলতে হল

* 'পঞ্চতন্ত্র' দ্রষ্টব্য।

কিন্তু নয়রাটের মত জমাতে পারলুম না—রসিয়ে গল্প বলা আমার আসে না, সে আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই জানেন।

দুজনেই স্বীকার করলেন, ইরানি গল্পটাই ভালো।

তখন ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, 'পেটারের বকুনিতে অনেকগুলো ভুল রয়েছে। প্রথমত আমরা হনিমুন যে বাড়িতে কাটাই, সেখানে গ্যাস ছিল, উনুন ধরাবার কথাই ওঠে না, দ্বিতীয়ত পেটার কক্খনো ব্রেকফাস্ট খায় না এবং সর্বশেষ বক্তব্য, যে-ব্রেকফাস্টের বর্ণনা সে দিল সেটা ইংলিশ ব্রেকফাস্ট। কোনো কন্টিনেণ্টাল শুয়ারের মত ব্রেকফাস্টের সময় এক গাদা বেকন আর আণ্ডা গেলে না। পেটার গল্পটা শুনেছে নিশ্চয়ই কোন ইংরেজের কাছ থেকে, আর সেটা পাচার করে দিলে আপনার উপর দিয়ে।'

পেটার বললেন, 'রেমব্রাণ্ট একবার এক ভদ্রলোকের মায়ের পর্ট্রেট এঁকেছিলেন। ভদ্রলোক ছবি দেখে বললেন, তাঁর মায়ের সঙ্গে মিলছে না। রেমব্রাণ্ট বললেন, 'একশ বছর পর আপনার মায়ের সঙ্গে কেউ এ ছবি মিলিয়ে দেখবে না—তারা দেখবে ছবিখানি উৎরেছে কি না।''

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গল্পটি ভালো কি না, সেইটেই হচ্ছে আসল কথা। ঘটেছিল কি না, সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর; আপনি কি বলেন?'

আমি বললুম, 'সুন্দর-ই সত্য—না ঘটলেও ঘটা উচিত ছিল।'

ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, 'বটে!'

নয়রাট বললেন, 'আমার শখ ছিল দাবা-খেলাতে এবং সে ব্যসনে মেতে আমার কত সময়-সামর্থ্য বরবাদ গিয়েছে তার হিসেব-নিকেশ আমি কখনো করিনি। দাবা-খেলা আমি আরম্ভ করি সাত বছর বয়সে। আমার বাবা কাকা দুজনেই পাঁড় দাবাড়ে ছিলেন আর কাকা রোজ রাত্তিরে বাবার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন। এক রাত্রে আসতে পারলেন না জোর বরফের ঝড় বইছিল ব'লে, আর ওদিকে বাবা তো মৌতাতের সময় হন্যে হয়ে উঠলেন। আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'তা আমার সঙ্গেই খেলো না কেন?' বাবা তো প্রথমটাই হেসেই উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু জানেন তো দাবার নেশা কী নিদারুণ জিনিস—বরঞ্চ মদের মাতাল খুনীর সঙ্গে এক টেবিলে মদ খেতে রাজী হবে না, দাবার মাতাল তার সঙ্গে খেলতে কণামাত্র আপত্তি জানাবে না। বাবা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে খেলতে বসলেন, প্রথম দু'বাজি জিতলেনও কিন্তু তৃতীয় বাজি হল চালমাৎ এবং তারপর তিনি আর কখনো জেতেন নি। তবে তাঁর হল বুড়ো হাড়, এখনো খুব শক্ত শক্ত চালের চমৎকার চমৎকার উত্তর বাৎলে দিতে পারেন।'

আমার আশ্চর্য লাগল, কারণ শরৎ চাটুজ্যেও কৈলাস খুড়োর বর্ণনাতেও ঐ কথাই বলেছেন; খুড়োও শেষ বয়সে আটপৌরে খেলা ভুলে গিয়েছিলেন

বটে, কিন্তু কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য খেলোয়াড়রা তাঁর কাছে যেত। সে কথাটা নয়রাটকে বলতে তিনি বল্লেন, 'অতিশয় হক্ কথা। পৃথিবীতে মেলা ধর্ম আছে—তাই ক্রীশ্চান, জু, এবং দাবাড়ে। দাবা খেলা ধর্মের পর্যায়ে পড়ে, আর যারাই এ ধর্ম মানে তারা সব-ভাই-সব-ব্রাদার। দাবাড়েদের 'পেন্‌ফ্রেণ্ড' পৃথিবীর সর্বত্র যে রকম ছড়ানো তার সঙ্গে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের তুলনা হয় না।'

তারপর বললেন, 'সেই যে বাবা দাবা ধরিয়ে দিলেন তারপর ওর হাত থেকে আমি আর রেহাই পাইনি। একবার এক পাঁড় মাতালকে বলতে শুনেছিলুম, সে নাকি জীবনে মাত্র একবার মদ খেয়েছে। আমরা সবাই আসমান থেকে পড়লুম, উল্লুকটা বলে কি—উদয়াস্ত যে লোকটা 'টানিসে'র উপর থাকে সে কি না, জীবনে কুল্লে একটিবার মদ খেয়েছে! বেহেড মাতাল এরেই কয়। তখন মাতাল বললে সে মদ খেয়েছে একবারই—তারপর থেকে এ অবধি সে শুধু তার খোঁয়ারিই ভাঙছে।'

আমি বললুম, 'ওমর খৈয়াম এ বাবদে যা নিবেদন করেছেন সেটা ঠিক হুবহু এর সঙ্গে খাপ যায় না, তবু অনেকটা এরই কাণ ঘেঁষে। খৈয়াম বলেছেন, 'রোজার পয়লা রাত্তিরে এ্যায়সা পীনা পীউংগা যে তারই নেশার বেহুঁশীতে কেটে যাবে রোজার ঝাড়া পুরো মাসটা। হুঁশ হবে ঈদের দিন। ঈদ মানে পরব (পরব Par excellence), পরব মানতে হয়, না হলে জাত যাবে, ধর্ম যাবে, তাই তখন ফের বসে যাব সুরাহী পেয়ালা প্রিয়া নিয়ে।' তারপর খৈয়াম কি করেছিলেন সে হদিস তাঁর রুবাইয়াতে মেলে না, তবে বিবেচনা করি, দুসরা রমজান তক্ তিনি তাঁর কায়দা-কানুনে কোনো রদ্‌বদল্ করেননি।'*

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা এতক্ষণ কোন কথা বলেননি। এখন বললেন, 'আমি তো এ রুবাই† ফিটজিরাল্ডে পাইনি। আপনি কি ফার্সীতে পড়েছেন?'

আমি বললুম, 'ফিটজিরাল্ডে তো তর্জমা করেছেন মাত্র বাহাত্তর না বিরাশীটি রুবাইয়াৎ। ওমরের নামে প্রচলিত আছে আট শ' না এক হাজার, আমি ঠিক জানিনে। তবে এ রুবাইটি আপনি নিশ্চয়ই হুইনসফিল্ড কিম্বা নিকোলার অনুবাদে পাবেন। এঁরা ওমরের প্রায় কোনো রুবাই-ই বাদ দেন নি।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'আপনি যে বললেন, 'ওমরের নামে প্রচলিত রুবাইয়াৎ' তার অর্থ কি? আপনি কি বলতে চান, এগুলো ওমরের রচনা নয়।'

আমি বললুম, 'গুণীদের মুখে শুনেছি, ওমরের বেশির ভাগ রুবাইয়াতের

* সূফীরা মদ্য 'ভগবদ-প্রেম' অর্থে ব্যাখ্যা করেন।
† 'রুবাই' একবচন, 'রুবাইয়াৎ' বহুবচন।

ম্ল বক্তব্য ছিল, 'এই বিরাট বিশ্বসংসার কোন্ নিয়মে চলে, কি করলে ঠিক কর্ম করা হয় এসব বোঝা তোমার আমার সাধ্যের বাহিরে। অতএব যে দুদিন এ সংসারে আছ সে দুদিন ফূর্তি করে নাও; মরার পর কে কোথায় যাবে, কি হবে, না হবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।' তারপর থেকে অন্য যে কোনো কবি এই মতবাদ প্রচার করে নূতন রুবাই লিখতেন তিনি তক্ষুণি সেটা ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন। তার কারণও সরল। ওমর রাজানুগ্রহ পেয়েছিলেন, প্রধান মন্ত্রী নিজাম-উল্-মুল্ক্ও ছিলেন তাঁর ক্লাসফ্রেন্ড। তাই তিনি নির্ভয়ে ইসলামবিরোধী এই চার্বাকী মতবাদ প্রচার করে যেতে পেরেছিলেন; কিন্তু পরের আমলে আর সব কবির সে সৌভাগ্য তো হয়নি—তাঁরা মোল্লাদের বিলক্ষণ ডরাতেন। তাই তাঁরা তাঁদের বিদ্রোহী মতবাদ ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপন প্রাণ বাঁচাতেন—ওদিকে যা বলবার তাও প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে যেতেন।

'তাই দেখতে পাবেন, হাফিজের (এবং অন্য আরও কয়েক কবির) দিওয়ানে (তথাকথিত 'কম্প্লীট ওয়ার্কসে') ওমরের কবিতা, আবার ওমরের দিওয়ানে হাফিজের কবিতা। এ জট ছাড়িয়ে ওমরের কোন্গুলো, হাফিজের কোন্-গুলো সে বের করা আজকের দিনে অসম্ভব।'

নয়রাট বললেন, 'আপনাদের ওমর কোনো কম্মের নয়। তার স্বর্গপুরীর বর্ণনাতে তিনি বলেছেন,

'সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে,
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি তার কাছেতে
গুঞ্জে তবে মঞ্জু সুর
সেই তো সখি, স্বর্গ আমার,
সেই বনানী স্বর্গপুর।'

অত সব বয়নাক্কার কী প্রয়োজন!
এক দাবাতেই যখন তাবৎ কিস্তি মাৎ হয়?'

ফ্রান্ৎসিস্কা শুধালেন, 'ওমর সম্বন্ধে নানারকমের আজগুবি গল্প শোনা যায়—আমার মন সেগুলো মানতে রাজী হয় না, কিন্তু সেগুলো মানা না-মানার চেয়েও বড় প্রশ্ন; খুদ্ সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে, ইসলামের মত কট্টর [illegible] দেশে তিনি তার বিদ্রোহ জাহির করলেন কোন সাহসে? বুঝলুম না হয়, রাজা আর প্রধানমন্ত্রী তাঁকে রক্ষা করছিলেন কিন্তু সেইটেই তো শেষ কথা নয়। সে যুগে দেশের পাঁচজন কি ভাবতো না ভাবতো তার

হয়ত খুব বেশি মূল্য ছিল না কিন্তু মোল্লা সম্প্রদায়? সে যুগের রাজারাও তো ওদের সমঝে চলতেন।' \

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, কিন্তু ভেবে দেখুন তো, রাজাতে পোপেতে যদি ঝগড়া লাগে তবে শেষ পর্যন্ত কি হয়? হুকুম চালাবার জন্য রাজা সৈন্যের উপর নির্ভর করেন। সৈন্যেরা যদি রাজার প্রতি সহানুভূতি রাখে তবে তারা হুকুম পাওয়ামাত্রই মোল্লাদের ঠ্যাঙাতে রাজী; পক্ষান্তরে তারা যদি মোল্লাদের মতবাদে বিশ্বাস রাখে তবে তারা বিদ্রোহ করে, অর্থাৎ রাজাকে ধরে ঠ্যাঙায়।

'এতো হল কমন-সেন্স। তাই এস্থলে প্রশ্ন ইরানের লোক সে আমলে কতখানি ইসলাম-অনুরাগী ছিল?

'ইতিহাস থেকে আমার যেটুকু জ্ঞান হয়েছে—কিন্তু থাক, এসব কচকচানি হয়ত হ্যার নয়রাট পছন্দ করছেন না—'

নয়রাট বললেন, 'ফের এটিকেট? আর এটিকেট হ'লই বা—আমি আপনার বক্তব্যটা শুনছি ইন টার্মস্ অব্ চেস্। আপনি এখন ওপ্নিং গেম্ আরম্ভ করেছেন, তারপর মিড্ গেম্ আসবে—আমি দেখছি আপনি ঘুঁটিগুলো কি কায়দায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—যা বলছিলেন বলে যান।'

আমি বললুম, 'ইরানের সভ্যতা সংস্কৃতি আরবদের চেয়ে বহু শত বৎসরে খানদানী। ইরান ইসলাম প্রচারের বহু পূর্বেই রাজ্য-বিস্তার করতে গিয়ে গ্রীসের সঙ্গে লড়েছে, ভারতের পশ্চিম-সীমান্ত দখল করেছে, মিশরীদের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে, রোমানদের বেকাবু করেছে, অর্থাৎ রাষ্ট্র হিসেবে ইরান বহু শত বৎসর ধরে পৃথিবীর পয়লা শক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে। পৃথিবীর সম্পদ ইরানে জড়ো হয়েছিল বলে ইরানীরা যে স্থাপত্য, যে ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিল তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত কলা নিদর্শন আজও পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। আর বিলাস-ব্যসনের কথা যদি তোলেন তবে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ়বিশ্বাস ইরানীরা যে রকম পঞ্চেন্দ্রিয়ের পূর্ণতম আনন্দ গ্রহণ করেছে সে রকম ধারা তাদের পূর্বে বা পরে কেউ কখনো করতে পারেনি।

'এই ধরুন না, আরব্য-উপন্যাস। অথচ বেশীর ভাগ গল্পে যে ছবি পাচ্ছেন সেগুলো আরবের নয়, ইরানের—আমার ব্যক্তিগত 'ফেন্সি' মত নয়, পণ্ডিতেরা এ কথাই বলেন।

'মনে পড়ছে সেই গল্প?—যেখানে এক সুন্দরী তরুণী এসে এক ঝাঁকা-মুটেকে নিয়ে চলল হরেক রকমের সওদা করতে। মাছমাংস, ফলমূল কেনার পর সে তরুণী যে সব সুগন্ধি দ্রব্য কিনল তার সব ক'টা জিনিসের অনুবাদ কি ইংরিজি, কি ফরাসি, কি বাঙলা কোনো ভাষাতেই সম্ভব হয়নি—কারণ, এসব জিনিসের বেশির ভাগই আমাদের অজানা। এমন কি আজকের দিনের আরবরা পর্যন্ত সে-সব বস্তু কি, বুঝিয়ে বলতে পারে না। তুলনা দিয়ে

বলছি, আজকের দিনে প্যারিসে যে পাঁচ শ' রকমের সেণ্ট বিক্রী হয় সেগুলোর বয়ান, ফিরিস্তি, অনুবাদ কি এস্কিমো ভাষায় সম্ভবে?

'ইরানের তুলনায় সে-যুগে আরবরা ছিল প্যারিসের তুলনায় অনুন্নত—অর্থাৎ সভ্যতা-সংস্কৃতির নিম্ন পর্যায়ে। সেই আরবরা যখন ধর্মের বাঁধনে এক-জোট হয়ে ইরানে হানা দিল তখন বিলাস-ব্যসনে ফূর্তি-ফার্তিতে বে-এক্তেয়ার ইরানীরা লড়াইয়ে হেরে গেল। আপনাদের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত দিতে গেলে গ্রীস-রোমের কাহিনী বলতে হয়, সে কাহিনী আমার বলার প্রয়োজন নেই। সেটা হবে 'সুইটজারল্যাণ্ডে ঘড়ি আনার মত'।

'ইরানীরা মুসলমান হয়ে গেল, কেন হল সে-কথা আরেকদিন হবে, যারা হতে চাইল না অথচ জানতো দেশে থাকলে অর্থনীতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে একদিন হতেই হবে তারা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল আমার দেশ ভারতবর্ষে—সে ইতিহাসও এ-স্থলে অবান্তর।

'আরবরা মরুভূমির সরল, প্রিমিটিভ মানুষ; তারা ইরানের বিলাস-ব্যাভিচার দেখে স্তম্ভিত—শক্‌ট্', 'আউট-রেজ্‌ড্'। আবার ইরানিরাও আরবদের বেদুইন ধরণ-ধারণ দেখে ততোধিক স্তম্ভিত এবং 'শক্‌ট্'।

'তদুপরি আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, আরবরা সেমিটি বংশের (ইহুদী গোত্রের সঙ্গে তাদের 'মেল'), আর ইরানিরা আর্য। জীবনাদর্শ ভিন্ন ভিন্ন; ধর্ম এক হলে কি হয়? প্যারিসের ক্রীশ্চান আর নীগ্রো ক্রীশ্চান কি একই ব্যক্তি?

'এইবারে মোদ্দা কথায় ফিরে যাই; ইরানীরা মুসলমান হ'লো বটে (এবং এদের অনেকেই খাঁটী মুসলিম) কিন্তু তাদের মজ্জাগত মদ্যাদি পঞ্চম'কার ছাড়তে পারলো না। তাই ইরানের জনসাধারণ ওমরের মদ্য-দর্শনবাদ খুশীসে বরদাস্ত করে নিল।

'দেশের লোক যখন গোপনে গোপনে মদ খায় তখন রাজার আর কি ভাবনা? মোল্লারা যা বলে বলুক, যা করে করুক—এবং একথাও রাজার অজানা ছিল না যে, বহু লোক আপন হারেমে বসে ঐতিহ্যগত মদ্যপানে কার্পণ্য করেন না।

'তাই ওমর বেঁচে গেলেন, রাজাও কোনো মুশকিলে পড়লেন না।'

নয়রাট বললেন, 'আপনাদের ওমর খৈয়াম যা আমার ট্যুনিস-শেল্‌ও তা।'
আমি ঠিক বুঝতে না পেরে শুধালুম, 'ট্যুনিস-শেল্ নিয়ে তো সব গল্প, আর খৈয়াম তো রচেছেন চতুষ্পদী।'

নয়রাট বললেন, 'মিলটা অন্য জায়গায়। আপনিই বললেন না, দুনিয়ার যত ঈশ্বর-বিদ্রোহী, মদ্যোৎসাহী চতুষ্পদী—তা সে ওমরের হোক, হাফিজের হোক, আত্তারের হোক, সব কটা এসে জুটেছে ওমরের চতুর্দিকে, ঠিক তেমনি রসিকতার গল্পে নায়ক যদি মাত্র দুজন হয়, আর তার একজন আরেক জনের উপর টেক্কা মারার চেষ্টা করে তবে শেষ পর্যন্ত সেগুলো ট্যুনিস-শেলের নামে চালু হবেই হবে। এগুলোকে তাই সাইক্‌ল্‌ (চক্র) বলা হয়। ওমর সাইক্‌ল্‌, ট্যুনিস-শেল সাইক্‌ল্‌ কিম্বা পলডি সাইক্‌ল্‌। ওমর যে-রকম ইরানের, ট্যুনিস-শেল তেমনি জর্মনির কলোন শহরের আবার পল্‌ডি সুইটজার-ল্যাণ্ডের। আপনাদের ভারতবর্ষে এরকম সাইক্‌ল্‌ আছে?

আমি বললুম, 'এন্তার! হর-পার্বতী সাইক্‌ল্‌, গোপাল ভাঁড় সাইক্‌ল্‌, শেখ চিল্লী সাইক্‌ল্‌ এবং আরো বিস্তর। কিন্তু পল্‌ডি সাইক্‌লের বিশেষত্ব কি?'

নয়রাট বললেন, 'পল্‌ডি হলেন অতিশয় খানদানী ঘরের ছেলে, উত্তম বেশভূষায় ছিমছাম না হয়ে বেরোন না, সকলের সঙ্গে অতিশয় ভদ্র ব্যবহার—এতো সব হল; কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, তিনি একটি পয়লা নম্বরের বক্কেশ্বর', আনাড়ির চূড়ামণি—বে-অকুফের শিরোমণি। দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'কিন্তু প্লীজ, অশ্লীলগুলো না।'

নয়রাট বেদনাতুরতার ভাণ করে বললেন, 'ফ্রান্‌ৎসিস্‌কাকে নিয়ে ঐ তো বিপদ। একশ' বার বোঝাবার চেষ্টা করেছি, শ্লীল-অশ্লীল—একেবারে স্বতঃ-সিদ্ধরূপে, অর্থাৎ per se—এ পৃথিবীতে নেই যেরকম নিজের থেকে 'ডার্ট' বা ময়লা বলে কোন জিনিস হয় না। অস্থানে পড়লেই জিনিস ডার্ট হয়। ডাস্টবিনের ভিতরকার ময়লা ময়লা নয়—একথা কেউ বলে না, 'ডাস্টবিন ময়লা হয়ে গিয়েছে, ওটা সাফ করো', বলে, 'ডাস্টবিন ভর্তি হয়ে গিয়েছে।' ঠিক তেমনি সুন্দরীর ঠোঁটের উপর লিপস্টিক ডার্ট নয়, কিন্তু যদি সেই লিপস্টিক আমার গালে লেগে যায়—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'পেটার! আবার!'

আমার মনে হল, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বাড়াবাড়ি করছেন, তাই নয়রাটকে সমর্থন করার জন্য গুণগুণ করলুম,

'অধরের তাম্বুল   বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি'

দুজনেই জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

আমি সালঙ্কার সবিস্তর নন্দকুমারের গণ্ডে চন্দ্রাবলীর তাম্বুলরাগের বর্ণনা দিলুম।

নয়রাটকে আর পায় কে?—চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'শুনলে, গিন্নী শুনলে? শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয়দের স্বয়ং ভগবান্, আমাদের যেরকম যীশু-খৃস্ট। তিনি যদি রাধা ভিন্ন অন্য রমণীকে দয়া দেখাতে পারেন, তবে আমার গালে কিম্বা ইভনিং শার্টে লিপস্টিক আবিষ্কার করলে তুমি মর্মাহত হও কেন?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বাধা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী ঢিড্ মিথ্যেবাদীরে, বাবা! আমি আর মা-বোন ভিন্ন অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হলে যে পুরুষ—হ্যাঁ পুরুষই বটে—শব্দের জন্য পকেট ডিক্সনারি বের করে তার গালে লিপস্টিক! ডু লিবার হ্যার গট ফন বেনটাইম (বাঙলায়—'হে পিঁড়দাদন খানের মা কালী!')'

আমি বললুম, 'কিন্তু হ্যার নয়রাট, একটা ভুল করবেন না। দেবতা যা করবার অধিকার রাখেন, সাধারণ মানুষের তা নেই। কিন্তু সে কথা থাক, শ্লীল-অশ্লীল সম্বন্ধে আপনি কি যেন বলছিলেন?'

নয়রাট বললেন, 'per se বাই ইটসেলফ যেরকম ডার্ট হয় না, ঠিক তেমনি স্ব-হক্কে কোন জিনিস অশ্লীল নয়। উদাহরণ দিয়ে বলি;—যেখানে বাইবেল পাঠ হচ্ছে, সেখানে হঠাৎ পেটের ব্যামো নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করা অশ্লীল এবং তার চেয়েও ভালো দৃষ্টান্ত, ডাক্তাররা যেখানে যৌন সম্পর্কের আলোচনা করছেন, সেখানে বেমক্কা বাইবেল পাঠ আরম্ভ করা তার চেয়েও বেশি অশ্লীল।

'অর্থাৎ বক্তব্যবস্তু প্রতীয়মান, জাজ্জ্বল্যমান করার যেন যে কোন দৃষ্টান্ত, যে কোন তথ্য, যে কোন গল্প শ্লীল—তা সে পঁচিশবার দান্তের বয়ানই হোক, গণিকা-জীবন কাহিনী হোক। পক্ষান্তরে ইর্‌রেলেভেন্ট আউট অব প্লেস (বেমক্কা) জিনিস, তা সে ধর্মসংগীতই হোক আর টমাস আকুনিয়াসের জীবনই হোক।'

আমার আশ্চর্য লাগল। কারণ দেশের ভটচায মশাই ('পাদটীকা' দ্রষ্টব্য) এবং কাবুলের মৌলানা মীর আসলম ('দেশে-বিদেশে' দ্রষ্টব্য) ঐ একই কথা বলেছিলেন।

আমি বললুম, 'খাঁটি কথা। কিন্তু এসব থাক না এখন। বরঞ্চ একটা পল্‌ডি গল্প বলুন।'

নয়রাট বললেন, 'সেই ভালো।'

'পিয়ন পলডিকে মণি-অর্ডারের টাকা দিলে। পল্‌ডি দিল জোর টিপস্। পাশে বসেছিলেন বন্ধু, তিনি বললেন, 'পল্‌ডি, অত বেশি টিপস্ দিলে কেন?' পল্‌ডি পরম সন্তোষ সহকারে মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে বললে, 'ঐ তো! কিসসু জানো না, কিসসু সমঝো না; জোর টিপস্ দিলে ঘন ঘন মণি-অর্ডার নিয়ে আসবে, না?'

আমার হাসি শেষ হবার পূর্বেই নয়রাট বললেন, 'কিম্বা ধরুন,

পলডির বুকে ব্যথা। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে বুক-পিঠ বাজিয়ে বললেন, 'ঠিক ডায়গ্‌নোজ করতে পারছিনে। তবে মনে হচ্ছে অত্যধিক মদ্যপানই কারণ।'

পল্‌ডি হেসে বললে, 'তাই নিয়ে বিচলিত হবেন না, ডাক্তার, আমি না-হয় আরেকদিন আসব, যেদিন আপনি অত্যধিক মদ্যপান করে মাতাল হয়ে যাননি।'

নয়রাট বললেন, 'পলডি রসিকাতে শুধু থাকে রস। ওগুলোর ভিতর দিয়ে পলডির দেশ, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর পাওয়া যায় না কিন্তু ট্যুনিস্‌-শেলের গল্পের ভিতর দিয়ে জর্মনি, কলোনের শ্রমিক শ্রেণী এবং তাদের জীবনধারণ সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায় এবং তাতে করে গল্পগুলো বেশ একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের রঙ ধরে। এই ধরুন পাদ্রী সম্প্রদায়কে নিয়ে আমরা প্রায়ই ব্যঙ্গ করে থাকি। তার-ই একটা ট্যুনিস-শেল সাইক্লে বেশ খানিকটে রসের সৃষ্টি করেছে।

'ট্যুনিস আর শেল একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে (কটলেটের গল্পে পূর্বেই বলেছি তারা হরদম রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়) এবং ঝগড়া লেগে গিয়েছে টাকাটার উপর কার হক্ক। ট্যুনিস বলে সে আগে দেখেছে; শেল্‌ বলে সে আগে কুড়িয়ে নিয়েছে এবং পজেশন ইজ থ্রি ফোর্থ অব ল'। তারপর এ বলে ও মিথ্যেবাদী ও বলে এ মিথ্যেবাদী। করতে করতে হঠাৎ ট্যুনিস বললে, 'তাই সই, মিথ্যেবাদী হওয়াটাও কিছু সোজা কর্ম নয়, আমি হচ্ছি পাঁড় মিথ্যেবাদী আর তুই হচ্ছিস পোঁচি (এমেচার) মিথ্যেবাদী।' শেল বললে, 'গাঁজা, ঠিক তার উল্টো।'

তখন স্থির হ'ল পাল্লা দিয়ে দুজনে মিথ্যে কথা বলবে, যে সব চেয়ে বেহুদা বেশরম মিথ্যে বলতে পারবে, টাকাটা পাবে সেই।

তখন ট্যুনিস বিস্‌মিল্লা বলে আরম্ভ করলে,

'পরশুদিন ঘরে মন টিকছিল না বলে বাইরে এসে এক লম্ফে চলে গেলুম আমেরিকায়। সেখানে পৌঁছলুম এক সমুদ্রপারের 'লিডো'তে। দেখি হাজার হাজার মেয়েমদ্দে সেখানে চান করছে, সাঁতার কাটছে। আর ছুঁড়ি-গুলো কী বেহায়া! আমার এই একটা নেক্‌টাইয়ের কাপড় দিয়ে তিনটে মেয়ের সুইমিং কস্টুম হয়ে যায় (ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললে, 'পেটার, আবার?' নয়রাট বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, টাপেটোপে বলছি'।) আমার ভয়ঙ্কর রাগ হল। করলুম কি, সব কটা হুনো-মেনিকে ধরে একটা ব্যাগে পুরে দিলুম আরেক লাফ। এবারে পৌঁছলুম, ফুজি-জামা পাহাড়ের কাছে। ব্যাগের ভিতর তিন হাজার বেড়াল ক্যাঁও ম্যাঁও করছে বলে আমার দারুণ বিরক্তি বোধ হল। তাই আস্ত ব্যাগটা গিলে ফেলে গোটা আড়াই ঢেকুর তুললুম, তারপর—'

শেল বাধা দিয়ে বললে, 'এতে আর মিথ্যে কোন্‌খানটায় হ'ল? আমি তো তোর সঙ্গেই ছিলুম, পষ্ট দেখলুম, তুই এসব করছিলি।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা গল্পটা আগে শোনেননি বলে হাসলেন। আমিও বললুম, 'এ গল্পটা ভারি নূতন ধরণের। শেলের উত্তরটা অত্যন্ত আচমকা একটা ধাক্কা দিলে।'

নয়রাট বললেন, 'গল্পটা এখনো শেষ হয়নি।'

আমরা বললুম, 'সে কি কথা?'

নয়রাট বললেন, 'গল্পটি যদিও খাস কলোন শহরের, তবু তার টেকনিকে একটু চীনা পদ্ধতি এসে গিয়েছে। এ গল্পে দুটো 'সারপ্রাইজ', কিম্বা বলতে পারেন দুটো কিক্‌ আছে। খুলে বলছি;—

'ট্যুনিস আর শেল যখন রাইন নদীর পাড়ের রেলিঙে ভর করে মিথ্যের জাহাজ ভাসাচ্ছিল, তখন এক পাদ্রী সাহেব পাশে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তসৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছিলেন। অনিচ্ছায় কিম্বা স্বেচ্ছায়ও হতে পারে, ট্যুনিস শেলের বিকট মিথ্যের বহর তাঁর কানে এসে পেঁৗচেছিল। থাকতে না পেরে বললেন, 'ছি, ছি, বাছারা; এরকম ডাহা মিথ্যে তোমরা মুখ দিয়ে বের করছো কি করে? জানো না, মিথ্যা কথন মহাপাপ? আমি জীবনে কখনো মিথ্যে বলিনি।'

ট্যুনিস পাদ্রীর কথা শুনে প্রথম হকচকিয়ে গেল, তারপর থ মেরে গেল। সম্বিতে ফিরে শেষটায় ক্ষীণকণ্ঠে, বাজি হারার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শেলকে বললে, 'ভাই শেল, নোটটা ওকেই দে, টাকাটা ওরই পাওনা। তুই এরকম পাঁড় মিথ্যে বলতে পারবিনে; আম্মো পারবো না।'

আমি বললুম, 'খাসা গল্প; এটা মনে রাখতে হবে।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'কিন্তু আমি জানি, পেটার ওখানে থাকলে প্রাইজটা সে-ই পেত।'

আমি নয়রাটকে বললুম, 'গল্পটি সুন্দর, কিন্তু এতে টিপিকাল কলোনের কি আছে? আমাদের মোল্লা-পুরুৎ সম্বন্ধেও তো এরকম বদনাম আছে।'

নয়রাট বললেন, 'আমি জানতুম না। তবে শুনুন আরেকটা—আর এর জবাব আপনি দিতে পারবেন না।

'ট্যুনিস-শেল আবার একখানা দশ টাকার নোট পেয়েছে (ট্যুনিস-শেল সাইক্লের ভিতরে এ হচ্ছে 'নোটের সাইকেল্‌')। এবারে ঝগড়া হয়নি। দুজনে সেই টাকা দিয়ে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে রাস্তায়। পুলিস তাদের পেঁৗছে দিয়েছে হাসপাতালে। সকাল বেলা তাদের ঘুম ভেঙেছে আর নেশা কেটেছে। দেখে চতুর্দিক ফিটফাট, ছিমছাম। ট্যুনিশ শুধালে,

'ওরে শেল, এ আবার এলুম কোথায়?' শেল বললে, 'আমিও তাই ভাবছি। দাঁড়া, দেখে আসছি।'

শেল গেল ঘরের বাইরে। পাঁচ সেকেণ্ডের ভিতর ছুটে এসে বললে, 'ওরে ট্যুনিস—আমরা ভারতবর্ষে পৌঁছে গিয়েছি—রাতারাতি আমাদের ভারতে পাচার করে দিয়েছে।'

ট্যুনিস তো তাজ্জব। শুধালে, 'কি করে জানলি?'

বললে, 'করিডরে মোটা হরপে লেখা আছে, "Die Toiletten befinden sich auf jenseits des *Ganges*".

নয়রাট বললেন, 'অর্থাৎ, 'করিডরের দুপাশে বাথরুমের ব্যবস্থা আছে'। এখন 'করিডর' শব্দ জর্মনে Gang আর Gang,-এর দুপাশে—অর্থাৎ ষষ্ঠিতৎপুরুষ Ganges. তার মানে বাথরুম গঙ্গা (নদীর) দুপারে।

তাই ট্যুনিস-শেল রাতারাতি ভারতে পৌঁছে গিয়েছে।'

নয়রাট বললেন, 'দেশভ্রমণের গল্পই যদি উঠল তবে সেই সাবসাইক্লই চলুক।'

আমি বললুম, 'উত্তম প্রস্তাব।'

নয়রাট বললেন, 'ট্যুনিস-শেল পেটের ধান্দায় হামবুর্গ গিয়ে জাহাজের খালাসির চাকরী নিয়ে পৌঁচেছে গিয়ে ইস্তাম্বুল শহরে, সেখানে—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'না, পেটার; ওটা চলবে না।'

নয়রাট ব্যথা-ভরা নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গল্পটা কিন্তু ছিল খাসা; তা আর কি করা যায়! তবে তাদের নিয়ে যাই নিউ ইয়র্কে।

'হয়েছে কি, ট্যুনিসের এক মামা নিউ ইয়র্কে দু'পয়সা রেখে মারা গিয়েছে। ট্যুনিস উকিলের চিঠি পেয়েছে তাকে সেখানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে নিজের সনাক্ত দিয়ে টাকাটা ছাড়িয়ে আনতে হবে। ওদিকে ট্যুনিস আবার ভয়ানক ভীতু ধরণের লোক। একা বিদেশ যেতে ডরায়—শেলকে বললে, 'ভাই, তুই চ।' শেল ভাবলে—আর আমিও তাই ভাবতুম,—মন্দ কি, ফোকটে মার্কিন-মুল্লুকটা দেখা হয়ে যাবে।

'তারা নিউ ইয়র্ক পৌঁছল ঠিক বড় দিনের দিন। তামাম মার্কিন দেশ ঝেঁটিয়ে এসে জড়ো হয়েছে নিউ ইয়র্কে পরব করার জন্য; সব হোটেল আগা-গোড়া ভর্তি, করিডরে পর্যন্ত ক্যাম্প্‌কট্‌ পেতে শোবার ব্যবস্থা ফালতো গেস্টদের জন্য করা হয়েছে।

মহা দুর্ভাবনায় পড়ল দুই ইয়ার। ডিসেম্বরের শীতে আশ্রয় না পেলে শীতেই অক্কা-লাভ। দুই বন্ধু কলোন গির্জের মা-মেরিকে স্মরণ করে এক ডজন মোমবাতি মানত করলে। আপনি তো মুসলমান, এসব মানেন না, কিন্তু'—

আমি বললুম, 'আলবৎ মানি, একশ'বার মানি। কলকাতার মৌলা

আলীর দর্গায় মোমবাতি মানত করলে বহু বাসনা পূর্ণ হয়। আর আমাদের দেশে এমন জায়গাও আছে যেখানে মানত করলে মোকদ্দমা পর্যন্ত জেতা যায়।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'ডাইভোর্স পাবার দরগা আছে?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ, তবে সেখানে স্বামী স্ত্রীকে একসঙ্গে গিয়ে কামনাটা জানাতে হয়।'

নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' তারপর গল্পের খেই তুলে নিয়ে বললেন, 'কলোনের মা-মেরি বড় জাগ্রত দেবতা। একটা হোটেলে শেষটায় একটা ডবল রুম জুটে গেল, কিন্তু ব্যবস্থাটা শুনে দুই ইয়ারই আঁৎকে উঠলেন।

'ঘর পঞ্চাশ তলায়, আর লিফট্‌ বিগড়ে গিয়েছে!

'দুইজনাই একসঙ্গে বললে, 'হে মা-মেরি, এতটা দয়াই যখন করলে, তখন লিফট্‌টা সারাতে পারলে না, মা?''

আমি বললুম, 'আমাদের গোপাল ভাঁড়ও তাই বলেছিল,—'এত দয়াই যদি করলি, মা কালী, তবে আরেকটু দয়া করে,

বনে আছে দেদার ফড়িং
খা না দু'টো ধরে'।'

নয়রাট বললেন, 'গল্পটা কি?'

আমি বললুম, 'আপনাকে একদিন সময়মত আমাদের 'গোপাল-ভাঁড়-সাইক্ল' শোনাব, তবে তার অনেকগুলো ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার সামনে বলা চলবে না।'

নয়রাট বললে, 'তবে নিয়ে চলুন আপনাদের ডিভোর্স-দর্গায়।'

সিগরেট ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা ভাঁড়ার ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি বললুম, 'অত তাড়া কিসের? ভারত যাবার জাহাজ আরো সপ্তাহখানেক পরে ছাড়ে।'

নয়রাট বললেন, 'তখন ট্যুনিস শেলকে বললে, 'ভাই, এ ছাড়া আর উপায় যখন নেই তখন চ, সিঁড়ি ভাঙ্গি আর কি?'

শেল বললে, 'একটা ব্যবস্থা করলে হয় না, প্রতি তলা উঠতে উঠতে তুই এক একটা করে গল্প বলবি আর তাতেই মশগুল হয়ে আমরা পঞ্চাশ তলা বেয়ে নেব। তুই তো মেলা গল্প জানিস।'

ট্যুনিস বললে, 'যা বলেছিস, সাধে কি আর তোকে সঙ্গে এনেছিলুম? তবে শোন', বলে আরম্ভ করলে সিঁড়ি ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গল্প-বলা।'

নয়রাট বললেন, 'সে কত বাহারে গল্প! আমি গল্প কলেক্‌ট্‌ করিনে, কিন্তু আমার এক বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গে আমি আপনাকে আলাপ করিয়ে দেব, তিনি সব কটা জানেন।

'তা সে কথা থাক।

'ট্যুনিস আর শেল এক এক তলার সিঁড়ি ভাঙে আর ট্যুনিস এক এক-খানা জান্—তর্-র্-র্ গল্প ছাড়ে। হেসেখেলে বিন্-মেহন্নত, বিন্-কসরতে তারা পঁচিশ তলা এক ঝটকায় মেরে দিলে।

'তখন ট্যুনিস বললে, 'ভাই শেল আমার সব গল্প খতম। আর কোনো গল্প মনে পড়ছে না।'

তখন শেল বললে, 'ঘাবড়াসনি। আমারো কিছু পুঁজি আছে।'

'বলে তখন শেল আরম্ভ করল গল্প বলতে। সেও কিছু কম বাহারে নয়, তবে ট্যুনিস তালেবর ব্যক্তি, তার সঙ্গে তুলনা হয় না।

করে করে তারা আরো চব্বিশ খানা সিঁড়ি ভাঙলে—গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে।

মাত্র এক তলা বাকি। শেল দুম্ করে মাটিতে বসে পড়ল। এক ঝটকায় হোক আর ঊনপঞ্চাশ ঝটকায়ই হোক পা-গুলো তো আর গল্প শুনতে পায় না। শেল ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ে বললে, 'ভাই, আমার গুদোমও খতম।'

তখন ট্যুনিস বললে, 'কুছ্ পরোয়া নদারদ। আমার একখানা খাসা গল্প মনে পড়েছে—একদম সত্যি গল্প।'

'আমরা ফ্লেটের চাবি সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছি।'

লঞ্চ খেতে এসে তখন প্রায় চায়ের সময় হয়ে গিয়েছে অথচ গাল-গল্পের কম্বলের ভিতরে এমনি ওম জমে গিয়েছে যে, সে কম্বল ফুটো করে বেরতে ইচ্ছে করে না। শীতের দেশ তো—উভয়ার্থে শীতের দেশ, ইয়োরোপীয়দের মনেও শীত; আড্ডা জমিয়ে সঙ্গ-সুখের আলিঙ্গনে সেটাকে গরম করতে জানে না—তাই এদের কুণ্ডুলিতে বহুদিন পরে যেন 'বসন্ত রেস্টুরেণ্টের' আনন্দ পেলুম।

শেষটায় একটা হাফ্-মোকা পেয়ে বললুম, 'আমি তা হলে উঠি।'

নয়রাট একটি কথা বললেন, 'কেন?'

আমি একটু অবাক হয়ে গেলুম। এরকম অবস্থায় সচরাচর বলা হয়, 'সে কি কথা? এখনই যাবেন কেন?' কিম্বা 'বড্ড কাজ পড়ে আছে বুঝি?' অথবা অন্য কিছু। আমার কোনো জবাব জোগালো না।

নয়রাট বললেন, 'দেখুন মশাই, আপনাকে বলিনি, কিন্তু আপনাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। গেল কয়েকদিন ধরে যখনই লেকের পাড় দিয়ে কাজকর্মে কোথাও যেতে হয়েছে, তখনই আপনাকে দেখেছি, ঐ একই বেঞ্চের উপর—তাও আবার একই পাশে—বসে আছেন। শুনেছি, ইংলণ্ডের পার্কে চেয়ারে বসলে তার জন্যে ট্যাক্স দিতে হয়—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'সেখানে দম ফেলতেও ট্যাক্স দিতে হয় এবং তারই ভয়ে কেউ যদি দম বন্ধ করে, তবে মরে গিয়ে তাকে ডেথ্‌-ট্যাক্স দিতে হয়।'

নয়রাট বললেন, 'তাহ'লে বিবেচনা করি সেখানে বিয়ের উপরও ট্যাক্স আছে। আহা, ইংলণ্ডে জন্মালে হ'ত।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'আহা, আমি যদি তিব্বতে জন্মাতুম। সেখানে প্রত্যেক রমণীর পাঁচটা করে স্বামী থাকে, আর সব কটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়।'

আমি বললুম, 'ষাট, ষাট, (ইংরিজিতে tut tut) ওরকম অলক্ষুণে কথা কইবেন না।'

সমস্বরে, 'কেন?'

আমি বললুম, 'তাহ'লে আসছে জন্মে, পেটারকে জন্মাতে হবে ইংলণ্ডে, আর মাদাম ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা (ব'লে তাঁর দিকে 'বাও' করে বললুম), আপনাকে জন্ম নিতে হবে তিব্বতে।'

দুজনাই কিচির-মিচির করে উঠলেন। তার থেকে যে প্রশ্ন ওৎরালো তার মোটামুটি জিজ্ঞাস্য, 'আসছে জন্মে' কথাটার মানে কি? আমরা তো মরে গিয়ে হয় স্বর্গে যাবো, কিম্বা নরকে, কিম্বা কর্পূর হয়ে যাব, কিন্তু 'আসছে জন্মে' তার অর্থ কি?'

আমি বললুম, 'এই যে পেটার শুধালেন, আমি বেঞ্চিতে সর্বসময় বসে থাকি কেন? তার অর্থ আমি চলাফেরা, হাঁটাহাঁটি করি না কেন? সুইটজারল্যাণ্ডে যদি ইংলিশ্‌ কায়দায় বেঞ্চিতে বসতে হত তাহ'লে ট্যাক্স দিয়ে দিয়ে আমি ফতুর হয়ে যেতুম সেকথা আমি খুব ভালো করেই জানি কিন্তু চলাফেরা করলে আমাকে খেসারতি দিতে হবে অনেক অনেক বেশি।'

নল কোন্‌ দিকে চলেছে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা যেন তার খানিকটা আভাস পেয়েছেন বলে মনে হল। পেটার কিন্তু রতি-ভর হদীস না পেয়ে শুধালেন, 'এর কোনো মানে হয় না, আপনি রাস্তায় হাঁটছেন, তার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে কেন? ইংলণ্ডের মত বর্বর দেশেও ও-রকম ট্যাক্স নেই।'

আমি বললুম, 'পর জন্মে মানুষ এ পৃথিবীতে আসে পূর্বজন্মের কামনা নিয়ে। আমি সমস্ত দিন যতদূর সম্ভব চুপচাপ বসে থাকি যাতে করে ভগবান পরজন্মে আমাকে এমন জায়গায় বসান যেখানে আমাকে কোন কিচ্ছু না করতে হয়। আমি যদি হাঁটাহাঁটি করি, তবে ভগবান ভাববেন, আমি ঐ কর্মই পছন্দ করি, আর আমাকে এ জগতে পাঠাবেন পোস্টম্যান করে। তখন মরি আর কি, জলঝড়ে, বিষ্টিতুফানে এর বাড়ি ওর বাড়ি চিঠি-পার্শেল বয়ে বয়ে।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছিনে কিন্তু কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছি। আপনি বলতে চান, মানুষ মরে গিয়ে এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। সে কি করে হয়?'

জ্ঞানী পাঠক! অপরাধ নেবেন না। আপনি সেস্থলে থাকলে আমার অনেক পূর্বেই বুঝে যেতেন, 'জন্মান্তরবাদ' এরা জানে না এবং আপনি সেইটি বুঝতে পেরে তক্‌খুনি তার শাস্ত্রসম্মত সদুত্তর দিয়ে দিতেন। কিন্তু আমি তো পণ্ডিত নই, দেশ আমাকে আদর করে না, দেশ আমাকে খেতে-পরতে দেয় না, তাইতো আমি লক্ষ্মীছাড়া গৃহহারা হয়ে গিয়েছি বিদেশ, আমি অতশত বুঝতে পারবো কি করে?

তদুপরি আরেক কথা আছে। আমি মুসলমানের ছেলে। ইসলাম জন্মান্তর-বাদ মানে না; যদিও প্রাগৈতিহাসিক যুগে মক্কাবাসীরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করতো। সেই যুগের একটি আরবী কবিতা এই সংবাদে মনে পড়ল।

কবিতাটির গীতিরস বাঙলাতে অনুবাদ করার মত বাঙলা-ভাষা-জ্ঞান আমার নেই কিন্তু কল্পনা-চতুর পাঠক হয়ত আমার অনুবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি পেরিয়ে গিয়ে ঠিক তত্ত্বটি সমঝে যাবেন। মরুভূমির আরব বেদুইন প্রিয়াকে, উদ্দেশ করে বলছে,

'প্রিয়ে,
আরবভূমি মরুভূমি, নিরস কর্কশ
তোমার আমার প্রেমের সুধাশ্যামলিম-রস
কেউ বুঝতে পারলো না।
তাই সর্বদেহমনহৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করি,
তুমি যেন এমন দেশে জন্মাও,—
—আসছে জন্মে—
কত শত শতাব্দীর পরে তা জানিনে,
যেখানে মানুষ জলে ডুবে আত্মহত্যা করার
আনন্দ অনায়াসে অনুভব করতে পারে।'

এর টীকা অনাবশ্যক। আরব দেশে হাঁটু-জলের বেশি গভীরতর কোনো প্রকার নদীপুকুর নেই। তাই কবি, জন্মান্তরে সেই দেশের কামনা করছেন যেখানে মানুষ জলে ডুবে চরম শান্তি পায়।

সে দেশ বাঙলা দেশ। চেরাপুঞ্জীর দেশ, যেখানে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। নদী নালা, পুকুর-হাওরে জলের থৈ থৈ।

আরব বেদুইন কবি এই দেশই মনে মনে কামনা করেছিল।

আমি বললুম, 'আসছে জন্মের কথা থাক। আপনি যে এ জন্মের কাহিনী আরম্ভ করেছিলেন সেইটে তো শেষ করলেন না। আপনি বলছিলেন, আপনার

গুটিকয়েক শখ পূরণ করার জন্য আপনি এক-টানা ছাব্বিশ বছর খেটে পয়সা জমিয়ে এখন দিব্য আরাম করতে পারছেন। আপনার শখগুলো কি?'

নয়রাট বললেন, 'এক নম্বর দাবা-খেলা আর দু' নম্বর—বলতে একটু বাধো-বাধো ঠেকছে।'

আমি বললুম, 'এইবার আপনারা 'ভদ্রতা' আরম্ভ করলেন।'

নয়রাট বললেন, 'ভদ্রতায় ঠেকছে না। ঠেকছে অন্য জায়গায়। তবু না হয় বলেই ফেলি। আমি যখন ইস্কুল যেতুম তখন একটি জারজ ছেলেকে আমার ক্লাসের ছেলেরা বড় ক্ষ্যাপাতো—ছেলেরা এ বিষয়ে যে কী রকম ক্রূর আর নিষ্ঠুর হতে পারে তার বর্ণনা আপনি নিশ্চয়ই মোপাসাঁয় পড়েছেন। আমি তখনো গল্পটি পড়িনি কিন্তু আজ মনে হয় ছেলেটির দুর্দৈব কাহিনী মপাসাঁ শতাংশের একাংশও বর্ণনা করতে পারেননি। আমার নিজের বিশ্বাস যৌনবোধ না জন্মানো পর্যন্ত মানুষের মনে স্নেহ করুণা ইত্যাদি কোনো প্রকারের সদ্‌গুণ দেখা দেয় না। তাই বালকেরা হয় সচরাচর অত্যন্ত নিষ্ঠুর —আমি ক্লাসের আর সকলের চেয়ে ছিলুম বয়সে একটু বড়, আমার তখন নিজের অজানাতেই যৌনবোধ আরম্ভ হয়েছে এবং তাই ঐ হতভাগ্য ছেলেটার জন্য আমার হৃদয়ে গভীর বেদনার উদ্রেক হত। কিন্তু বয়সে বড় হলে কি হয়, আমি ছিলুম একে রোগাপটকা, তার উপর মারামারি হাতাহাতির প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণা। তাই আমি তাকে কোনো প্রকারে সাহায্য না করতে পেরে মনে মনে বড় লজ্জা বোধ করতুম। তবে সুযোগ পেলেই, আর পাঁচটা ছেলের চোখের আড়ালে ওর হাতে একটা চকলেট গুঁজে দিতুম, রাস্তায় দেখা হলে একটা আইসক্রীম খাইয়ে দিতুম।

প্রথম যে-দিন তাকে চকলেট দিয়েছিলুম সেদিন সে আমার দিকে বদ্ধ ইডিয়টের মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল, তারপর দরদর করে তার দু' চোখ বেয়ে জল বেরিয়ে এসেছিল। ক্লাসের তিরিশটে কসাইয়ের ভিতরেও যে একটি ছেলে গোপনে গোপনে তার জন্য হৃদয়ে দরদ ধরে এর কল্পনাও সে কখনো তার মনের কোণে ঠাঁই দিতে পারেনি।'

তাকিয়ে দেখি ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার চোখ ছলছল করছে। অথচ তিনি নিশ্চয়ই এ কাহিনী আগে শুনে থাকবেন। মনে মনে বললুম, নয়রাট সত্যই 'সহধর্মিণী' পেয়েছেন। বাইরে বললুম, 'থামলেন কেন?'

বললেন, 'এখনো বাধো-বাধো ঠেকছে। তবু বলছি, কারণ এ বিষয়ে আমি মিশনারি।

'ছেলেটাকে ধমক দিয়ে বললুম, 'এই ফুল! চোখ মুছে ফেল। আর সবাই দেখে ফেললে তোকে জ্বালাবে আরো বেশি, আমাকেও রেহাই দেবে না।

'চোখের জলের সঙ্গে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতা মিশে গিয়ে তার চেহারা যে কি রকম বিকৃত হয়ে গিয়েছিল তার ছবি আমি আজো দেখতে পাই।

'আপনাকে কি বলবো, তার পর সেদিন ক্লাসে বসে যখনই আড় নয়নে তাকিয়েছি তখনি দেখেছি, সে চোখ বন্ধ করে আছে, আর ঠোঁটের দু কোণে গভীর প্রশস্তির মৃদু হাস্য, আর গালের আপেল দুটো খুশীতে উপরের দিকে উঠে চোখ দুটো যেন চেপে ধরেছে। আমি তো ভয়ে মরি, মূর্খটা আবার কি বলতে গিয়ে কি না বলে ফেলে।

'তার পর দিন থেকে আরম্ভ হল, আরেক আজব কেচ্ছা। ছেলেরা রুটিন মাফিক তাকে 'ব্যা—র্ড' বললে, চুলে ধরে টান দিলে, অন্যান্য প্রকরণেরও কোনো খাঁকতি হল না কিন্তু সেও রুটিন-মাফিক চিৎকার চেঁচামেচি গালাগাল দিলে না—সে দেখি, চোখ বন্ধ করে মিটমিটিয়ে হাসছে—আমি ভাবলুম, হয়েছে, ছোঁড়াটা বোধ করি ক্ষেপে গেছে।

'বহু পরে সে আমাকে একদিন বলেছিল, সে নাকি তখন খুশীতে ডগোমগো, তার নাকি ভারী আনন্দ, তার আর কি ভয়, এই ক্লাসেই তার একটি বন্ধু রয়েছে, সে তাকে চকলেট্ খাইয়েছে।'

আমি বললুম, 'অতিশয় হক্ কথা! ফার্সীতে প্রবাদ আছে,—

"দুশ্‌মন্ চি কুনদ্, আগর্ মেহেরবান্ বাশদ্ দোস্ত!"

"দুশ্‌মন্ কি করতে পারে, দোস্ত যদি মেহেরবান হয়!"

নয়রাট উল্লসিত হয়ে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কাকে বলেন, 'বউ, প্রবাদটা টুকে নাও তো, কাউকে দিয়ে ফার্সীতে লিখিয়ে নিয়ে জর্মনে গথিক হরফে তর্জমা লিখে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবো।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এত দিন ধরে আমি জুৎসই একটা প্রবাদের সন্ধানে ছিলুম—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

তারপর বললেন, 'ছোঁড়াটা অদ্ভুত। আমাকে বিপদে না ফেলার জন্য আমার কাছে এসে ন্যাওটামী করতো না। একলা-একলি দেখা হলে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি মুচকি হেসে চোখ বন্ধ করতো।

'তার কয়েকদিন পরে আমার জন্মদিন। ক্লাসের ছোঁড়াগুলোর প্রতি যদিও আমি ঐ ছোকরাটাকে জ্বালাতন করার জন্য বিরক্ত হতুম তবু অন্য বাবদে ওরাই তো আমার সঙ্গী; তাই তাদের নেমন্তন্ন করলুম, আর না করলে মা-ই বা কি ভাববে? তারা আমার জন্য উপহার আনলে, বই, পেন্সিল, ছুরি, কলের লাটিম এবং আর পাঁচটা জিনিস। আমরা কেক্ লেমনেড খাচ্ছি, জোর হৈ-হুল্লোড় চলছে, এমন সময় বাড়ির দাসী আমায় কানে কানে বললে, 'ছোট-বাবু, তোমার জন্য একটি ছেলে নিচের তলায় গেটে দাঁড়িয়ে। কিছুতেই উপরে আসতে চায় না; তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে'।

'আমার সব বন্ধুই তো গটগট করে উপরে আসে। এ আবার কে?

গিয়ে দেখি, সেই পাগলা। হাতে এক ঢাউস বাক্স। লজ্জায় লাল হয়ে বললে,—'তোর জন্মদিনে একটা প্রেজেণ্ট এনেছি। ছোট্ট একটা পাল-লাগানো 'ইয়ট'।'

'বলে কি? 'ইয়ট' তখন আমাদের স্বপ্নের বাইরে। পুরো বছরের জল-খাবারের পয়সা জমালেও আমাদের ক্লাসের ধনী ছোকরা আডল্‌ফ্‌ পর্যন্ত 'ইয়ট' কিনতে পারে না—তখনো জানতুম না, সে পয়সাওলা ছেলে।

'লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। বললুম, 'তুই উপরে চ, কেক্‌ খাবি।'

'বললে, 'না, ভাই, তুই যা, উপরে আরো অনেক সব রয়েছে'।

'আমি তাকে জোর করে উপরে টেনে নিয়ে এলুম। কোত্থেকে সাহস পেলুম আজো জানিনে। বোধহয় 'ইয়টের' কৃতজ্ঞতায়।'

আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'ছিঃ, ও জিনিস নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।'

নয়রাট বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। তারপর উপরে কি হ'ল ঠিক বলতে পারবো না। প্রথমটায় সবাই থ মেরে গেল। তারপর একে একে সক্কলেই পাগলার সঙ্গে শেক-হ্যান্ড করলে। তার চোখ দিয়ে আবার সেই পয়লা দিনের মত ঝরঝর করে জল নেমে এল।

'সেই দিনই আমি মনস্থির করলুম, বড় হলে আমি সর্বত্র এরকম ছেলেদের অন্যায় অত্যাচার থেকে বাঁচাবো। ভগবান আমাকে আজ দেখিয়ে দিয়েছেন, এ শক্তি আমার ভিতরে আছে।'

নয়রাট হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'এখ্‌খুনি আসছি; আমি একটা টেলিফোন করতে ভুলে গিয়েছিলুম।'

বুঝলুম, বিনয়ী লোক, লজ্জা ঢাকবার অবকাশ খুঁজছেন॥
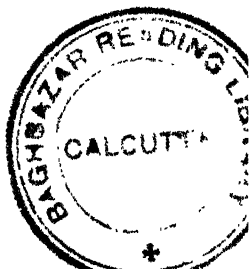
আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সমর-সংগীত

কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে জা
খুশীকে গীত্ গায়ে জা
ইয়েহ্ জিন্দগী হ্যায় কৌম কী
(তো) কৌম পৈ লুটায়ে জা॥

তূ শেরে হিন্দ্ আগে বঢ়্
মরণেসে ফিরভি তূ ন্ ডর
আসমান্ তক্ উঠায়ে সির
জোশে ওতন্ বাঢ়ায়ে জা॥

তেরে হিম্মৎ বঢ়তী রহে
খুদা তেরী সুন্তা রহে
জো সামনে তেরে চঢ়ে
(তো) খাক্মে মিলায়ে জায়॥

চলো দিল্লী পুকারকে
কৌমী নিশান্ সম্ভাল্কে
লাল কিল্লে গাঢ়কে
লহ্রায়ে জা লহ্রায়ে জা॥
কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে জা

এগিয়ে যা এগিয়ে যা
খুশীর গীত গাইতে যা।
দেশের তরে জীবন ধন
দেশের লাগি করবি নে পণ?

শেরে হিন্দ এগিয়ে যা
সামনে মরণ ফিরে না চা॥
আকাশ বিঁধে তুলবি শির
দেশের জোশ বাড়বে বীর।

বাড়ুক বাড়ুক সাহস তোর
খুদা তোরে দেবেন জোর।
সামনে বাধা পরোয়া না কর
ধুলায় তারা পাবে যে গোর॥

হুঙ্কারিয়া দিল্লী চল
কৌমী নিশান জাগিয়ে তোল
লালকেল্লায় ঝাণ্ডা খোল
এগিয়ে যা ফুর্তিতে চল॥
এগিয়ে যা, এগিয়ে যা।

সমাপ্ত

শেরে হিন্দ = হিন্দুস্থানের ব্যাঘ্র
জোশ্ = শক্তি
কৌমী নিশান = জাতীয় পতাকা